ডক্টর শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়

প্রীতিভাজনেষু

‘ন তজ্‌জ্ঞানং নতচ্ছিল্পং
　　ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎকর্ম
　　নাট্যেঽস্মিন্ যন্নদৃশ্যতে॥’

নিবেদন

প্রায় পঁচিশ বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল যাবৎ প্রথমতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্য অধ্যাপনার ফলস্বরূপ 'রবীন্দ্র-নাট্যধারা' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্বে আমি আমার 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে গিয়া একদিক দিয়া যেমন বুঝিয়াছিলাম যে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়া রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নহে, তেমনই আর একদিক দিয়া ইহাও বুঝিয়াছিলাম যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের আলোচনা করিবার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। কারণ, বাংলা নাটক রচনার ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকের কোন যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। সেইজন্য এই বিষয়ে স্বাধীনভাবে কোন গ্রন্থ রচনা ব্যতীত ইহার যথাযথ মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না। সেই সঙ্কল্পকে কার্যে রূপায়িত করিতে গিয়াই এই গ্রন্থখানি রচনার কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। এতদিন পর ইহার মুদ্রণ কার্য সম্পূর্ণ হইল।

ভূমিকাতে রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিবার পর বিষয় অনুযায়ী ইহাতে নাটকগুলির আলোচনা করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির রচনার কালানুক্রমিক একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একই নাটককে বার বার পরিবর্তিত করিয়া নূতন নূতন নামেও প্রকাশ করিয়াছেন; সেই সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত নাটক ব্যতীত অন্য কোন নাটকের নূতন করিয়া আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করি নাই। তবে যে সকল নাটক এইভাবে পরিবর্তনের ফলে অনেকখানি স্বাধীন রূপ লাভ করিয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে ইহাতে আলোচনা করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ বিশেষতঃ তাঁহার শেষ জীবনে তাঁহার কয়েকটি ছোট গল্পকে নাট্যরূপ দিয়াছেন। এই ক্ষেত্রেও তাঁহার ছোট গল্পের যে সকল নাট্যরূপ স্বাধীন নাটকের গৌরব লাভ করিয়াছে, তাহাদের আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু যে সকল নাট্যরূপ তাঁহার ছোট গল্পের গুণ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই, তাহাদের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। এ' কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনের অনুরোধে তাঁহার ছোট গল্পকে নাট্যরূপ দিয়াছিলেন,

শিল্পের প্রেরণায় তাহা করেন নাই ; সুতরাং ইহাদের নাট্যগুণ যে নিতান্ত গৌণ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেইজন্য তাহা বর্তমান আলোচনার অঙ্গীভূত করি নাই।

রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কিত এই আলোচনায় আমি আর একটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি, তাহা এই যে, রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-মহাভারত কিংবা বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে সকল রোমাণ্টিক-ধর্মী নাটক কিংবা নাট্যকবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটির মূলে (source)-র সঙ্গে তাঁহার রচনায় কোথায় কি পার্থক্য দেখা দিয়াছে, কোথায় ঐতিহ্যের অনুকরণ, কিংবা কোথায় স্বাধীন রোমাণ্টিক চেতনার অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নির্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। রামায়ণ-মহাভারত কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যে যে জীবন রূপায়িত হইয়াছে, তাহাদের আদর্শ এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ এক ছিল না, থাকিবার কথাও নহে ; তথাপি তিনি কি ভাবে যে তাহার মধ্য দিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এক নিত্য জীবনের সন্ধান দিয়াছেন, এই তুলনামূলক আলোচনায় তাহাই প্রকাশ পাইবে।

এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যেমন আদর্শবাদী, নাট্যকার হিসাবেও তিনি তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নহেন। নাটকের মধ্যে তিনি যেমন আদর্শমূলক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই অনেক বাস্তবধর্মী চরিত্রকেও তিনি আদর্শায়িত করিয়া লইয়াছেন। অনেক সময়ই রবীন্দ্রনাথের নাটক এক একটি ভাব বা আইডিয়ার বাহন মাত্র, এই বিষয়ে তাঁহার কবি-মানসের সঙ্গে ইহাদের সুনিবিড় যোগ আছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের বিস্তৃত পটভূমিকার উপরই রবীন্দ্রনাথের নাটকেরও বিচার করা আবশ্যক। বর্তমান গ্রন্থের আলোচনায় এই ধারাই অনুসরণ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটককে নাটক বলিয়া গ্রহণ করিতেও অনেক সমালোচকই নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়াছেন। এই কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের সরস ক্ষেত্র হইতেই তাঁহার নাটকের উৎসার হইয়াছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের সৃজনী প্রতিভার মধ্যে একটি অখণ্ডতা আছে, তাহা বিষয়ে বিষয়ে কিংবা বস্তুতে বস্তুতে বিচ্ছিন্ন নহে ; তাঁহার সমগ্র সৃষ্টি একটি অখণ্ড ঐকসূত্রে বাঁধা। সেই দিক দিয়া তাঁহার কাব্য, নাটক, ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সাহিত্য পরস্পর একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ।' তিনি জীবনের নূতন নূতন পর্বে উত্তীর্ণ হইয়া

তাঁহার কবি-মানসে যে নূতন নূতন ভাবের প্রেরণা অনুভব করিয়াছেন, তাহার মধ্যে রচিত তাঁহার কাব্য নাটক গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ সকল কিছুর মধ্য দিয়াই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার একই পর্বের বিভিন্ন শ্রেণীর রচনার মধ্যে একই অখণ্ড রাগিণী শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। সেইজন্য তাঁহার রচিত কাব্য যেমন তাঁহার রচিত নাটকের পরিপূরক, তেমনই নাটকও তাঁহার কাব্যের পরিপূরক হইয়া রহিয়াছে, পরস্পর পরস্পরের স্বাধীন নহে। এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়াই বর্তমান গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা তাঁহার নাট্যকারের সত্তা হইতে অভিন্ন বলিয়াই রবীন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনার শ্রেষ্ঠ কয়েকখানি গ্রন্থে কবি ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে এক সঙ্গেই বিচার করা হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে যদিও কবি রবীন্দ্রনাথের সম্যক্ আলোচনা নাই, তথাপি তাঁহার নাটকের আলোচনায় তাঁহার কবি-মানস উপেক্ষিত হয় নাই।

সাধারণ বস্তুধর্মী নাটক আমরা যেভাবে আলোচনা করিয়া থাকি, রবীন্দ্রনাথের নাটক সেভাবে আলোচনা করিয়া বুঝিবার উপায় নাই। ইহার কারণ সম্পর্কে ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের যে সব শ্রেষ্ঠ নাটকে তাঁর কবিত্বশক্তি ও নাট্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে, যে সব নাটকে চলমান জীবন-প্রবাহ বা ঘটমান জটিল পরিস্থিতিকে তিনি নাটকের শ্রেষ্ঠ উপাদান বলে স্বীকার করেন নি। সমসাময়িক কালকে অতিক্রম করিয়া তিনি অতীতের রাজ্যে ফিরে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে আত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ।'

অথচ 'চলমান জীবন-প্রবাহ বা ঘটমান জটিল পরিস্থিতি'র উপর করিয়াই সেক্সপীয়রেরও শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি রচিত হইয়াছে এবং বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই আদর্শই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। চলমান জীবন-প্রবাহ কিংবা ঘটমান জটিল পরিস্থিতি বাহির হইতে যেভাবে বিশ্লেষণ করিলে সহজেই বোধগম্য হইতে পারে, মানবাত্মার আকুতিকে সেই প্রণালীতে বাহির হইতে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া বলিবার উপায় নাই, তাহা প্রধানতঃ গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে হয়। একটি বুদ্ধিগম্য আর একটি অনুভূতিসাপেক্ষ। যাহা বুদ্ধিগম্য তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে বেগ পাইতে হয় না, কিন্তু যাহা অনুভূতিদ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা কিছুতেই বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকই বুদ্ধিগম্য নহে,

অনুভূতিসাপেক্ষ বলিয়া সাধারণ নাটক বিশ্লেষণের প্রণালী ইহাদের উপর আরোপ করা যায় না। তাঁহার নাটকের ভাব অনেক ক্ষেত্রেই অতীন্দ্রিয় এবং বিষয়বস্তু অবাস্তব বলিয়া তাহাদের মূল্যায়ন সহজসাধ্য নহে। বাংলা সাহিত্যে এক শত বৎসরের উর্ধ্বকাল ধরিয়া যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে তাহাদের ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের নাটক বাংলা নাট্য-সাহিত্যে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রচনা করিয়াছে। বাংলার নাটক রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া যে তাহার চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করিবার কিছুমাত্রও উপক্রম করিয়াছে, তাহা নহে এবং সেই প্রয়াস যে তাহার কোন দিন দেখা যাইবে, এমন মনে করিবারও কিছু লক্ষণ আজ পর্যন্ত দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটকগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশিষ্ট সৃষ্টি। ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সমাজ-জীবন এবং অধ্যাত্ম-দর্শনের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অনেকেই এই শ্রেণীর পাশ্চাত্ত্য নাটকের সঙ্গে তুলনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটকগুলির মূল্য বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভা মৌলিক প্রতিভা, ইহা অনুকরণের প্রতিভা নহে; কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার স্বাঙ্গীকরণেরও সার্থক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যেও রবীন্দ্র-প্রতিভার মৌলিকতার সন্ধান যতখানি প্রয়োজনীয়, বহির্মুখী উপকরণের অনুসন্ধান তত প্রয়োজনীয় নহে। সুতরাং ইহাদের আলোচনায় অযথা পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভারাক্রান্ত না করিয়া নিজের উপলব্ধি এবং বিশ্বাসের উপরই অধিক নির্ভর করিয়াছি।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহাদের নিকট আমি সুগভীর কৃতজ্ঞ, তাঁহাদের মধ্যে আমার পরলোকগত অধ্যাপক বিশিষ্ট কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রবীন্দ্র-নাটকের অধ্যাপনার মধ্যেই এই গ্রন্থ রচনার প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম। এই প্রেরণার বশেই আমার অধ্যাপক-জীবনের প্রথম হইতেই রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্য অধ্যাপনার সুকঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সাহসী হইয়াছিলাম। তবে এ' কথাও সত্য, সেই ধারায় অগ্রসর হইয়া দীর্ঘকাল অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার ভিতর দিয়া যে সকল নূতন নূতন চিন্তা আমার নিজের মনের মধ্যেও উদিত হইয়াছে, তাহাও আলোচনার মধ্যে সংযুক্ত করিয়াছি। আমার রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক 'রবি-রশ্মি' প্রণেতা স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ থাকিবার সুযোগে তাঁহার অনেক নাটক সম্পর্কেই

নানা তথ্য কবির নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবেই সংগ্রহ করিতেন। তাহা তিনি তাঁহার অধ্যাপনার কার্যে নিয়োগ করিয়া আমাদিগকে এই বিষয়ে পরম উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আজ বহুদিনের ব্যবধানেও ইঁহাদের প্রতি সুগভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব পালন করিবার এই সুযোগ গ্রহণ করিতেছি।

গ্রন্থ প্রকাশের কার্যে প্রীতিভাজন শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু মহাশয়ের উৎসাহ এবং মুদ্রণকার্যে ও শব্দসূচী রচনার দুরূহ কার্যে আমার ছাত্র কল্যাণভাজন অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্রের কর্মতৎপরতা বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। তাহাদিগকে আমার শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ জানাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

বিষয়-সূচী

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

রবীন্দ্র-নাট্যধারা

ভূমিকা

১

রবীন্দ্র-প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের যে সকল বিভাগ স্পর্শ করিয়াছে, নাটক তাহাদের অন্যতম। ইহার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য করিলে এ'কথা সহজেই মনে হইতে পারে যে, "রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র নাটক ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের যদি অন্য কোন বিভাগে হস্তক্ষেপ নাও করিতেন, তাহা হইলেও তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন"। কারণ, তাঁহার কয়েকখানি নাটক চিরন্তন মানব-জীবনের শাশ্বত ভাব অবলম্বন করিয়া রচিত, ভাষান্তরিত হইয়াও দেশ-দেশান্তরে ইহারা সমাদর লাভ করিয়াছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে আর কেহ এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই।

আধুনিক নাটকে জীবনের সকল প্রকার প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব সংঘাতই রূপ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু জীবনের যে সকল অনুভূতি কিংবা অভিজ্ঞতার কোন শাশ্বত মূল্য নাই, তাহাদিগকে নাটকের ভিতর দিয়া রূপদান করিতে গেলে, তাহা কতদূর সাহিত্য রসোত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা তর্কের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে আধুনিক নাটকের এখানেই একটি প্রধান পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ যুগের চিন্তাকেই তাঁহার নাটকের মধ্যে সর্বস্ব করিয়া লইতে পারেন নাই, যুগকে অতিক্রম করিয়া যুগাতীত মানুষের যে একটি সত্তা আছে, তাহাকেই তাঁহার নাটকের ভিতর দিয়া সন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদের দৃষ্টি যুগ-জীবনের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে নানা বাস্তব সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে, তাঁহারা যত সহজে সাধারণ দর্শকের আকর্ষণীয় হইতে পারেন, তাঁহাদের তুলনায় যাঁহারা যুগোত্তীর্ণ মানবের শাশ্বত আত্মার সন্ধানী, তাঁহারা তত সহজে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন না। কিন্তু একমাত্র ইহাদেরই সৃষ্টি সাহিত্যের চিরন্তন অধিকার-ভুক্ত হইতে পারে।

আধুনিক নাটকে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, সমাজে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠাই ইহার মূল কারণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রত্যেক নাটকেই ব্যক্তির সমান অধিকারের পরিবর্তে কোন কোন বিশেষ

চরিত্রে বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইহার কারণ, মানব প্রকৃতির বাহিরেও যে একটি অলৌকিক শক্তি রহিয়াছে এবং তাহাই অলক্ষ্যে থাকিয়া মানুষের ধ্যান-ধারণা ধর্মকর্ম সকলই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন। এই অলৌকিক শক্তিকেই তিনি নানাভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; কখনও কখনও তাহার একটি চরিত্র পরিকল্পনা করিয়াছেন, সেই চরিত্র কখনও কোনও রূপে কখনও অ-রূপে নাটকের মধ্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, ইহার ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; ব্যক্তি চরিত্রগুলির সকল স্বাধীন অধিকার তাহার ফলে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; আধুনিক নাটকের সর্বত্র যে গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ইহার ফলে রক্ষা পাইতে পারে নাই। এইখানেই রবীন্দ্রনাট্যের সঙ্গে আধুনিক নাটকের মৌলিক বিরোধ। কেবল মাত্র এই জন্যই আধুনিক যুগে আবির্ভূত হইয়াও রবীন্দ্রনাথ যে নাটক রচনা করিলেন, তাহা আধুনিক ধর্মের বিরোধী হইল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানবের চিরন্তন জীবন রহস্যের উদ্ঘাটনের প্রয়াসে ইহাদের শাশ্বত সাহিত্যিক আবেদন কোন ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—রোমান্টিক নাটক ও সামাজিক নাটক। রোমান্টিক নাটকগুলিকে আবার আরও কতকগুলি উপবিভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, গীতিনাট্য, নাট্যকাব্য, ঋতুনাট্য, নৃত্যনাট্য, রূপক নাট্য ও সাঙ্কেতিক নাট্য। সামাজিক নাটকগুলিও দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, রঙ্গনাট্য ও সমাজনাট্য। রবীন্দ্রনাথ গীতি-কবি; নাট্যরচনাকালেও তিনি তাঁহার গীতিকবিসুলভ মনোভাব কোনদিক হইতেই সঙ্কুচিত করিয়া লইতে পারেন নাই; যদিও ইহা মূল নাট্যরচনার আদর্শ-বিরোধী, তথাপি ইহাই রবীন্দ্রনাথের নাট্যধর্ম। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের রচনার আদর্শ দিয়াই বিচার করিতে হয়, সাধারণ নাট্যরচনার মাপকাঠিতে বিচার করিতে গেলে তাহা ভুল হয়। রোমান্টিক নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের আত্ম-সচেতনতা সর্বত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এই আত্মসচেতনতার পরিচয়টি গীতিকবির মানস-পরিচয়ে পরম রসোজ্জ্বল—নাটকের দিক দিয়া ইহার মূল্য যাহাই থাকুক না কেন, কাব্যের রসবিচারে ইহার সৃষ্টি সার্থক।

গীতিনাট্যগুলিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনা। ইহাদের প্রধান সুর প্রেম—শিথিলবদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া নরনারীর মনের প্রেমভাবটি ইহাদের

রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'নব-নাটক' অভিনীত হইবার পূর্বেই জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ নাটক' মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের অভিনয় হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' কৃষ্ণকুমারীর মাতা ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় সার্জনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। 'নব-নাটকে'র অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'নটী'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা উৎকৃষ্ট বাংলা নাটক রচনায় উৎসাহ দান করিবার উদ্দেশ্যে পুরস্কার ঘোষণা করিতেন। তাহার ফলেই রামনারায়ণ তর্করত্ন যেমন 'নব-নাটক' রচনা করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিপিনমোহন সেনগুপ্ত কর্তৃক 'হিন্দু মহিলা নাটক' রচিত হইয়া পুরস্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু জোড়াশালা নাট্যশালা অধিককাল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল না, ১৮৬৭ সনেই 'বিগত জীবন' হইল।

জোড়াশালা নাট্যশালা লুপ্ত হইয়া গেলেও ইহা দ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে কিশোর জীবনেই যে নাট্যবিষয়ে যে প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার ধারা তাঁহার পরিণত জীবনের ভিতর দিয়াও অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলা নাটক রচনায় ব্রতী হইলেন এবং ইহার মধ্যেই তাহার পরবর্তী জীবনের সমগ্র সাধনার লক্ষ্য স্থির করিয়া রাখিলেন। তাহার ফলে সে' যুগের বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিবিড়তম সান্নিধ্য লাভ করিবার ফলে তাহার মধ্যেও নাট্য-রচনার প্রতি সেই যুগেই সর্বাধিক কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছিল। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাট্য পাঠের ভূমিকা স্বরূপ তাহার বিষয়ও এখানে বিশেষ স্ম... .াগ্য।

বাংলা নাটক রচনার মধ্যযুগে বাস্তব জগৎ ও প্রত্যক্ষ জীবন পরিত্যাগ করিয়া ইহার মধ্যে যে আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার একজন প্রথম পূজারী। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারারই অনুবর্তক। তবে কোন মৌলিক প্রতিভার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি তাঁহার কোন সুগভীর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় না, কিংবা তাঁহার জীবন-বোধ ব্যক্তি অথবা সমাজ-জীবনের সুগভীর স্তরও স্পর্শ করিতে পারে নাই—অনুকরণ ও অনুবাদই তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ; এই দুইটি বৈশিষ্ট্যদ্বারাই তিনি বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আদিযুগের সঙ্গে মধ্যযুগের সেতু রচনা করিয়াছেন।

পরবর্তী যুগের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য ছিল, তাহা প্রথমেই এখানে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা প্রয়োজন ; কারণ, অনেকেই তাঁহাকে প্রথম যুগেরই প্রতিনিধি বলিয়া ভুল করিয়াছেন। এই ভুলের একটি প্রধান কারণ এই যে, তিনি বাংলা নাট্য-সাহিত্যের প্রথম যুগের অন্যতম প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন—তাহা অনুবাদ। পূর্বেই বলিয়াছি, মধ্যযুগের নাট্যসাহিত্যে অনুবাদের প্রবণতা বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়া গিয়াছিল, অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রায় ৩৩খানি নাটকের মধ্যে ২২খানিই অনুবাদ। ইহার সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, মধ্যযুগের প্রথমভাগে আবির্ভূত হইবার ফলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী যুগের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই ; বিশেষতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে মৌলিক প্রতিভার প্রেরণা ছিল না, সেইজন্য অনুবাদই তাঁহাকে একান্তভাবে আশ্রয় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের জীবন-বোধ ও সমাজ-চৈতন্যের একান্তই অভাব ছিল। রামনারায়ণ নিজেও কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ রচনা করিলেও তাঁহার সামাজিক প্রহসনগুলির ভিতর দিয়া তাঁহার যে সুগভীর জীবন-বোধ ও ব্যাপক সমাজ-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে তাহাদের একান্তই অভাব ছিল। ত্রিশখানির অধিক বাংলা নাটক রচনা করিলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলার সামাজিক জীবনের বৃহত্তর পটভূমিকায় একখানি নাটকও রচনা করেন নাই—তাঁহার প্রহসনগুলির সঙ্গেও বাংলার বাস্তব সমাজ-জীবনের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নাই। অথচ আদিযুগের রামনারায়ণ-মধুসূদন-দীনবন্ধু ইহাদের প্রত্যেকেরই সমাজ কিংবা জীবন সম্পর্কে এক একটি বিশিষ্ট চৈতন্য তাহাদের রচনার ভিতর দিয়া রসরূপ লাভ করিয়াছে। বাস্তব সমাজ ও প্রত্যক্ষ জীবন সম্পর্কে ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি বিশিষ্ট ও সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তাহা ছিল না। তাহার পরিবর্তে একটি আদর্শ স্বপ্নলোকই তিনি তাঁহার কল্পনার বিহারক্ষেত্র করিয়া লইয়াছিলেন—ইহাই মধ্যযুগের একটি বিশিষ্ট ধর্ম ছিল। এই যুগের নাট্যসাহিত্যে বাংলার প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবন গৌণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পরিবর্তে কতকগুলি আদর্শই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একান্তভাবে এই আদর্শবাদেরই সেবক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের মধ্যযুগেরই প্রতিনিধি বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁহার 'আনন্দ-মঠে'র ভিতর দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর এক

নিরক্ষর লুণ্ঠনকারী পশ্চিমা দস্যুদলের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর নবোদ্ভূত দেশাত্মবোধের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার পূর্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বিষয়ে আরও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অখণ্ড ভারত অবলম্বন করিয়া দেশাত্মবোধের যে নবজাগরণ বাংলা দেশে জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় প্রকাশ করিবার জন্য তিনি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন। একমাত্র আদর্শকেই জয়মাল্য দিয়া বরণ করিয়া লইবার আগ্রহে বাস্তবতার দায়িত্বকে যে কতদূর অস্বীকার করা যাইতে পারে, ইহা তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যকার-জীবনের সূত্রপাত হইবার মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত স্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান হয়। নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। এই সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহার জীবন-স্মৃতিতে উল্লেখ [illegible]রিয়াছেন, 'হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে [illegible]র প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশ-প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে [illegible]ষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে।' এই উদ্দেশ্যেই তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথম কয়েকখানি নাটক রচনা করিলেন। কিন্তু ইহাদের কতকগুলি ত্রুটিও অপরিহার্য হইয়া উঠিল কারণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নাট্যকারের সমসাময়িক একটি বিশিষ্ট ভাবের বাহন করিবার ফলে নাটকের ঐতিহাসিকত্ব যেমন [illegible]ষ্ট হইল, তেমনই ইহাদের মধ্যে একটি অখণ্ড ভাব-রস নিবিড় হইয়া উঠিতে পারিল না। কারণ, প্রাচীন গ্রীসের পান-পাত্রে আধুনিক সোডা-লিমোনেড্ রক্ষা করা যাইতে পারে না। আলেক্জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কালে উনবিংশ শতাব্দীর অখণ্ড ভারত সম্পর্কিত হিন্দু জাতীয়তাবোধের অস্তিত্ব ছিল না; সেইজন্য এই বিষয় অবলম্বন করিয়া নাটক রচিত হইলে ইহার চরিত্রসমূহ বিকৃত না করিয়া এই ভাব কিছুতেই প্রকাশ করা যাইতে পারে না। তদুপরি ঘটনাসমূহ ইতিহাসের পথে অগ্রসর হইতেও বাধা পায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এই শ্রেণীর নাটক ঐতিহাসিক নাটক হইতে পারে না; যাহা হয়, তাহাদিগকে রোমান্টিক নাটক বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা কীর্তন করিবার নামে এই প্রকার কয়েকখানি রোমান্টিক নাটক মাত্র রচনা করিয়াছেন।

কিন্তু আনুপূর্বিক রোমান্টিক নাটক ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই রোমান্টিক নাটকে পার্থক্য আছে। আনুপূর্বিক রোমান্টিক নাটকের মধ্যে নাট্যকার যে স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে পারেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার এই শ্রেণীর কয়েকখানি নাটকে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই; কারণ, ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিবার ফলে ঐতিহাসিক ঘটনার মূল ধারা তাঁহার পক্ষে পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। অতএব এক দিক দিয়া ইতিহাস ও অপর দিক দিয়া একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক চৈতন্য ইহাদের উভয়ের মধ্যে পড়িয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটকগুলির যথার্থ রসস্ফূর্তি সম্ভব হয় নাই। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি তাঁহার বিশিষ্ট মতবাদ বা ভাব-প্রকাশের বাহন হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য অনেক সময়ই ইহাদের পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই, তাহার ফলে চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যেও ত্রুটি দেখা দিয়াছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি হইতে উপরে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ দেশাত্মবোধের চৈতন্য প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—একটি বিশিষ্ট ভাব প্রকাশ করাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ইতিহাস কিংবা নাট্যশিল্পের মর্যাদা রক্ষা করা তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল না। তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি একটি আধুনিক ভাব-প্রকাশেরই বাহন হইয়াছে মাত্র, বস্তুনিষ্ঠা ও ঐতিহাসিক তথ্য-পরিবেষণের দিক দিয়া ইহাদের প্রায় কোন মূল্যই নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যরচনাকে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ঐতিহাসিক নাটক, গীতিনাটক, প্রহসন ও অনুবাদ। তিনি চারিখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন এবং ইহাদের মধ্যেই তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত; অতএব ইহাদিগকে ঐতিহাসিক নাটক না বলিয়া রোমান্টিক নাটক বলিয়া উল্লেখ করাই কর্তব্য। এই চারিখানি নাটকের মধ্যে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসোক্ত বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রায়ের বৃত্তান্ত পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। মধুসূদন প্রবর্তিত

ধারা অনুসরণ করিয়া রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বন করিয়াও তিনি দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। তাহার তিনখানি নাটকের মধ্যে দেশাত্মবোধ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু ও মুসলমান। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান একই দেশের সন্তান, সেইজন্য তাহাদের বিরোধের ভিতর দিয়া দেশাত্মবোধের পরিবর্তে অনেক সময় সাম্প্রদায়িক স্বার্থদ্বন্দ্বেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠার যুগে যে জাতীয়তাবাদ প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জাতীয়তবাদ; এই হিন্দু নবজাগৃতির ভাব উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙ্গালীর সমগ্র চিন্তার জগৎ আশ্রয় করিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটক কয়খানির ভিতর দিয়া ইহার সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ছিল, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। নবজাগ্রত এই হিন্দু জাতীয়তার ভাবটি অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করার কৌশল তাঁহার আয়ত্ত ছিল না বলিয়াই মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক বিরোধ অবলম্বন করিয়াই তিনি তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক নাটকগুলির পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গীতি-নাটক কয়খানির কথা উল্লেখ করিতে হয়। তিনি তিনখানি ক্ষুদ্রাকৃতি গীতিনাটিকা রচনা করেন; কিন্তু ইহাদের মধ্য দিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথম গীতি-নাটকখানি রচিত হইবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের গীতি-নাটক রচনার যুগের সূত্রপাত হয়। তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ইহাদের রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন সত্য, এবং ইহার গীতি-অংশ আনুপূর্বিক রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই ইহাদের মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে; কাহিনী-অংশেও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটকগুলির প্রভাব ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট। অতএব ইহাদের মধ্যে যাহার শিল্পকীর্তি সমুজ্জ্বল হইয়া আছে—তিনি রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নহেন। অতএব ইহাদের মধ্য হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোন পরিচয় পাইবার উপায় নাই।

একখানি প্রহসন রচনার ভিতর দিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যকার-জীবনের সূত্রপাত হইলেও, প্রহসন-রচনার প্রেরণাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক বা নিজস্ব ছিল না। পূর্ববর্তী যুগের প্রহসন রচনার ধারাটি অনুসরণ করিয়াই

তিনি তাঁহার যুগে প্রহসন রচনায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের প্রহসন-রচয়িতাদিগের জীবন-দৃষ্টি ও শিল্পবোধ তাঁহার ছিল না বলিয়াই তাঁহার রচিত প্রহসন কয়খানি নিতান্ত প্রাণহীন বলিয়া বোধ হইবে। বাংলার সামাজিক জীবনের যে একটি বৃহত্তর বাস্তব ক্ষেত্র আছে, তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট অপরিচিত ছিল; সেইজন্য তাঁহার কোন প্রহসনের মধ্যেই কোন সমাজ ও জীবন-জিজ্ঞাসা নাই। ইহারা তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসমান স্বল্পায়ু ফেনঃপুঞ্জের মত—তরঙ্গের উপরেই ইহাদের জন্ম, তরঙ্গের উপরেই ইহাদের লয়—সমুদ্রের সুগভীর তলদেশে যে অনন্ত রত্নসম্ভার আছে, ইহারা তাহার সন্ধান জানে না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন কয়খানি সমাজের সুগভীর তলদেশের কোন সন্ধান রাখে নাই, ইহারা উপরিভাগেই শুভ্রহাস্যের ফেনঃপুঞ্জ বিস্তার করে মাত্র।

বাংলার সমাজ-জীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না বলিয়া, তিনি যে কয়খানি মাত্র প্রহসন রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বৈচিত্র্য কিংবা মৌলিকতা কিছুই দেখাইতে পারে নাই. এমন কি, মাত্র দুইখানি মৌলিক প্রহসন রচনা করিবার পরই তাঁহাকে অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া আরও দুই তিনখানি প্রহসন রচনা করিতে হয়। এমন কি, তাঁহার মৌলিক রচনা দুইখানিও পূর্ববর্তী নাট্যকার দীনবন্ধুর অনুকরণে রচিত; কিন্তু দীনবন্ধুর অনুকরণ করিতে গিয়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার দোষটুকুই অনুসরণ করিয়াছেন, গুণটুকুর অনুকরণ করিতে পারেন নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুই-তৃতীয়াংশ রচনাই অনুবাদ। তিনি সংস্কৃতের প্রায় সকল নাটকই বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন, তদুপরি ফরাসী ভাষা হইতে কয়েকখানি প্রহসনেরও 'স্বাধীন' অনুবাদ করিয়াছেন। ইংরেজী নাটকও অনুবাদ করিয়াছেন; শেষ জীবনে তিনি কেবলমাত্র অনুবাদের কার্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার অনুবাদগুলিই তাহার অল্পসংখ্যক মৌলিক রচনা প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। একান্তভাবে প্রাচীন সংস্কৃত ও বৈদেশিক ভাষা হইতে অনুবাদ করিবার ফলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দৃষ্টি কোনদিনই বাংলার নিজস্ব জলবায়ুর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে নাই। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগে বাংলার নিজস্ব জলবায়ুর বাস্তব পরিবেশ উপেক্ষা করিবার যে প্রবণতা [illegible] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে তাহার প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিচয় [illegible] একান্তভাবে জাতির
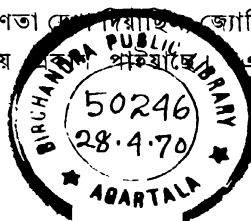
প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবন উপেক্ষা করিয়া কোন নাট্যকারই যে কোন দিক দিয়াই সাফল্য লাভ করিতে পারেন না, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহার প্রমাণ। তাঁহার নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানের বিষয় হইলেও সাধারণ পাঠকের নিকট মূল্যহীন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রুচি ও ভাষার দিক দিয়া পূর্ববর্তী যুগের নাট্যকার হইতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাও বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগেরই একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ঠাকুর-পরিবারের উন্নত রুচিবোধ তাহার নাটক ও প্রহসন কয়খানির রচনায় নিয়োজিত হইলেও তখনও দীনবন্ধুর প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে, তাঁহাকে অন্ততঃ তাঁহার প্রথম প্রহসনখানির মধ্যে তাহা কতকাংশে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল; কিন্তু পরে তিনি সহজেই সেই প্রভাব কাটাইতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ দীনবন্ধুর মত তাঁহার নাটকের বাঙ্গালীর বাস্তব বা গ্রাম্যজীবন ভিত্তি ছিল না বলিয়া, এই বিষয়ে তিনি সহজেই স্বাধীন আদর্শ অনুসরণ করিবারও সুযোগ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদিও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদই অধিক করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার ভাষা কদাচ সংস্কৃত-ঘেঁষা কিংবা পণ্ডিতী বাংলা ছিল না। তিনি যথাসম্ভব সহজ ও সরল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি 'আলালী ভাষা'র পক্ষপাতী ছিলেন না—কদাচ তিনি তাহা ব্যবহার করেন নাই। যদিও পূর্ববর্তী যুগে রামনারায়ণ-মাইকেল-দীনবন্ধু এক শ্রেণীর চরিত্রে 'আলালী' ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ করিয়াছেন, তথাপি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহাদের সে পথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাও বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগেরই একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এই যুগে নাটকে 'আলালী ভাষা'র প্রয়োগ অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'আলালী' ও 'পণ্ডিতী' বাংলার মধ্যগা যে ভাষা আদর্শ ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষা সেই ভাষা। সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলনের ফলে তিনি যে সংস্কৃত শব্দসম্পদের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অনুবাদ-রচনায় ব্যবহার করিয়া বাংলা ভাষাকে সেই যুগে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার সাধনার একটি বিশিষ্ট দান। কিন্তু তাঁহার ভাষার সহজাত প্রাণশক্তি ছিল না; রামনারায়ণ-দীনবন্ধু, এমন কি, মধুসূদন-মনোমোহনও তাঁহাদের রচনায় যে প্রবাদ-প্রবচন ও শব্দশৈলীর ব্যবহার করিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনায় তাহাদের একান্ত অভাব ছিল; সেইজন্য তাঁহার ভাষা নিষ্প্রাণ এবং

কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগে এই ভাষাই প্রায় সকলের আদর্শ হইয়াছিল।

যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিশোর রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও নাটক রচনায় তিনি অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহার 'সরোজিনী নাটক' সম্পর্কে তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে বলিয়াছেন, 'রাজপুত মহিলাদের চিতা প্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন, এখানে পদ্য রচনা ব্যতীত কিছুই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না—কারণ, প্রথম হইতে আমারও মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ! আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই "জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' পৃঃ ১৪৭)।' কোন বীরত্বব্যঞ্জক গদ্য সংলাপের ত্রুটি দূর করিতে গিয়া তাহার পরিবর্তে সঙ্গীত ব্যবহার করিবার মধ্যেই নাট্যকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্যের একটি ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে; রবীন্দ্র-মানস প্রথম জীবন হইতেই সঙ্গীত কিংবা গীতিসুরের প্রতি যে আকর্ষণ অনুভব করিত, ইহা তাহারই প্রমাণ। সমগ্র জীবনের নাট্যরচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রেরণা অনুভব করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য গানটি তদবধি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত 'সরোজিনী নাটকে'র অন্তর্ভুক্ত হইয়া আসিতেছে। সমগ্র গানটি সুদীর্ঘ, কিয়দংশমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

জ্বল জ্বল চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥

শোন্‌রে যবন শোনরে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥
ওই যে সবায় পশিল চিতায়,
একে একে একে অনল শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে ক'জন
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজি সঁপিব জীবন—
ওই যবনের শোন কোলাহল,
আয় লো চিতায় আয় লো সই!
জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিবে এ' প্রাণ।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে 'সরোজিনী নাটকে' রবীন্দ্রনাথের এই গানটি প্রকাশিত হইবার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইহার পূর্ববর্তী নাট্যরচনা 'পুরুবিক্রম' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের একটি গান নূতন সংযোজিত হইয়া ১৮৭৯ সনে প্রকাশিত হয়। তবে এই গানটি রবীন্দ্রনাথেরই কি না, সে বিষয়ে মতভেদ এখনও দূর হয় নাই।

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা বাঁধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।

তা হলে আসুক বাধা, বাঁধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে রবীন্দ্রনাথ রচিত আরও কয়েকটি সঙ্গীত গৃহীত হইয়া থাকিবে ; কিন্তু তাহাদের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানিতে পারা যায় না। উক্ত গানটি সম্পর্কে স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়ে' উল্লেখ করিয়াছেন, 'তবে গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের গোড়াকার নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের রচিত অনেক গান প্রচ্ছন্ন আছে, ইহার কোন কোনটি পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাবলীতে স্থান পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এমন গানও আছে, যাহা এখনও রবীন্দ্রনাথের রচনাভুক্ত হয় নাই (পৃঃ ২০-২১)।' জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের ভাবাদর্শ দ্বারা যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কৈশোরে বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, ইহা তাহারই প্রমাণ। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ নিজের পথের সন্ধান করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

৪

জোড়াসাঁকোতে নাট্যাভিনয়

কলিকাতার ঠাকুর পরিবারকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সকল প্রকার সংস্কৃতি-মূলক অনুষ্ঠানেরই অগ্রদূত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলিকাতায় যখন ইংরেজি রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বাঙ্গালী কর্তৃক সর্বপ্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়, তখন হইতেই ইহার সহিত ঠাকুর পরিবারেরও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নেতৃত্বে ইংরেজিশিক্ষিত নব্যবাঙ্গালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালার দ্বারোদ্ঘাটন হয়। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। কেবলমাত্র নাট্যাভিনয়েই নয়, নাট্য-রচনাতেও গিরীন্দ্রনাথের উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "মেজকাকা 'বাবুবিলাস' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, একবার তার অভিনয় হয়েছিল। তাঁহার মোসাহেবদের মধ্যে দীননাথ ঘোষাল বলে একটি চালাক চতুর লোক ছিল, সে-ই 'বাবু' সেজেছিল। অভিনয় কি রকম ওত্রাল বিশেষ কিছু বল্‌তে পারি না। আমরা ত আর সে মজ্‌লিসে আসন পাইনি, উঁকিঝুঁকি দিয়ে যা কিছু দেখা ('ভারতী'—আশ্বিন ১৩১৯, পৃঃ ৩৪৬)"। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখের 'দি ন্যাশানাল পেপার' নামক একটি ইংরেজি পত্রিকায় সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয় এ দেশের নাট্যশালার উৎপত্তি সম্পর্কে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

'The first project of the kind was contemplated by the late Hon'ble Baboo Prosanno Coomar Tagore. The next attempt of the kind was made by Baboo Nobin Chandra Bose, of Shambazar. The theatre got up by him was of a high order. The play of Bidya Shoondur was enacted in it. The third attempt of the kind was made by the late Baboo

Nagendra Nath Tagore. He was very successful in his attempt.

মনে হয়, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ কিংবা তাহার নিকটবর্তী কোন সময়ে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতায় কোন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই নাট্যশালার বিস্তৃত কোন পরিচয় পাওয়া না গেলেও মনে হয়, ইহা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই পিতার ন্যায় নাট্যাভিনয়ে উৎসাহশীল ছিলেন; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথও তখন নবীন যুবক, বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ছিলেন। ইহাদের সমবেত চেষ্টায় ঠাকুর-বাড়ীতে একটি ক্ষুদ্র নাট্যসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। বাহির হইতে যাঁহারা এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত প্রতিভাবান্ কয়েক জনকে লইয়া এই ক্ষুদ্র নাট্যসম্প্রদায়টি ক্রমে বৃহত্তর পরিকল্পনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অভিনয়ের আয়োজন, নাট্যনির্বাচন প্রভৃতি কার্যের জন্য পাঁচজনকে লইয়া একটি 'কমিটি অব্ ফাইভ' গঠিত হইল—এই পাঁচজন সদস্যের নাম, কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি অক্ষয় চৌধুরী এবং যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণবিহারী সেন কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা এবং যদুনাথ মুখোপাধ্যায় দেবেন্দ্রনাথের জামাতা। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণবিহারী সেন অভিনয়-শিক্ষক ছিলেন। এইভাবে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার ভিত্তি স্থাপিত হইল।

ঠাকুরবাড়ীতে যখন এই নাট্যশালার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হন। জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক সর্বপ্রথম অভিনীত হয়, ইহার কিছুদিন পরই মধুসূদনের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয় হয়। ঠাকুরবাড়ীতে যখন এই নাটক দুইটির অভিনয় হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত শিশু—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই দুই অভিনয়েই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর অভিনয়ে কৃষ্ণকুমারীর মাতা ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয়ে সার্জনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় এই দুইটি নাটক অভিনীত হইবার পর

উদ্যোক্তারা অভিনয়যোগ্য নূতন নাটকের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। অভিনয়ের ভিতর দিয়া লোকশিক্ষা প্রচার তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল; কিন্তু তাহার উপযোগী নাটক বাংলাভাষায় তখনও বিশেষ ছিল না। সেইজন্য নূতন নাটক রচনা করাইবার জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা ঠাকুরবাড়ীর গৃহশিক্ষক স্বর্গত ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীকে সামাজিক নাটক রচনার উপযোগী বিষয় নির্বাচন করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ওরিয়্যাণ্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি বিষয় নির্বাচন করিয়া দিলে ১৮৬৫ সালে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার উদ্যোক্তারা বহুবিবাহ-বিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য দুইশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া সংবাদপত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। অতঃপর বিজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করিয়া রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই বিষয়ক একখানি নাট্য-রচনার ভার দেওয়া হইল। ইতিপূর্বে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণের সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' প্রকাশিত হয়। তাহা দ্বারাই নাট্যকার হিসাবে তাঁহার খ্যাতি কলিকাতার সুধীসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেইজন্যই জোড়াসাঁকোর নাট্যসম্প্রদায় তাঁহাকেই এই কাযের ভার দিলেন।

রামনারায়ণের উপর বহুবিবাহ-বিষয়ক একখানি সামাজিক নাট্যরচনার ভার দিয়াও জোড়াসাঁকো নাট্যশালার উৎসাহী উদ্যোক্তারা আরও দুইখানি স্বতন্ত্র বিষয়ক সামাজিক নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে থাকেন। তাহাদের মধ্যে 'হিন্দুমহিলাগণের দুরবস্থা' বিষয়ক একটি নাটকের জন্য দুইশত টাকা ও 'পল্লীগ্রামের জমিদার' বিষয়ক আর একটি নাটকের জন্য একশত টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর যে নাটকখানি রচনার ভার দেওয়া হয়, তাহা অল্প দিনের মধ্যেই রচিত হয়। নাটকখানির নাম 'নব-নাটক'। 'নব-নাটক' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; এই নাটক রচনার জন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে এক বিশেষ সভার অনুষ্ঠান করিয়া ইহার নাট্যকার রামনারায়ণকে দুইশত টাকা পারিতোষিক প্রদান করা হয়। সুপরিচিত সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

জোড়াসাঁকোর নাট্যশালায় 'নব-নাটক' অভিনীত হইবার আয়োজন হইতে লাগিল। ঠাকুর পরিবারের মধ্যে যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ বা 'বড'র দল, তাঁহারাই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে

এই সম্পর্কে যাহা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।
…"বড়র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দোতালার হলের ঘরে স্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া 'সীন' (scene) আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ড্রপ-সীনে' রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবর-তটস্থ 'জগ-মন্দির' প্রাসাদ অঙ্কিত হইল। নাট্যোল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। আমি হইলাম নটী, আমার জ্যেঠতুত ভগিনীপতি নীলকমল মুখোপাধ্যায় সাজিলেন নট, আমার নিজের আর এক ভগিনীপতি ৺যতুনাথ মুখোপাধ্যায় চিত্ততোষ, আর এক ভগিনীপতি ৺সারদা-প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশবাবুর বড স্ত্রী। সুপ্রসিদ্ধ কমিক অক্ষয় মজুমদার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ। বাকী আমাদের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের জন্য নির্দিষ্ট হইল।" (পৃঃ ১০৪)

ছয়মাস কাল ব্যাপিয়া এই অভিনয়ের জন্য দিনে রিহার্সাল ও রাত্রে 'বিবিধ যন্ত্রসহকারে কন্সার্টের মহলা' চলিয়াছিল বলিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী অভিনয়ের দিন স্থির হয়। কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে লর্ড ল্যান্সডাউন ও তাঁহার পত্নীও উপস্থিত ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। নাট্যকার রামনারায়ণও অভিনয়েরও সময় উপস্থিত ছিলেন এবং স্বরচিত নাটকের অভিনয়ের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য উদ্যোক্তারা যত্নের কোন ত্রুটি করেন নাই। এই সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন,—

'তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগেব দ্বারা দৃশ্যগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। স্টেজও যতদূর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভান করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যকারের বনের মতই মনে হইত।'

নাটকের অভিনয়ও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সমসাময়িক সংবাদপত্রসমূহে এই অভিনয় সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। জোড়াসাঁকোর নাট্যশালায় উপর্যুপরি

নয় বার এই 'নব-নাটক'-এর অভিনয় হয়। প্রথমবারের অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর। এই অভিনয়ের কথা তাঁহার স্মরণ ছিল।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দেই জোড়াসাঁকোর নাট্যশালা 'বিগত জীবন' হয় বলিয়া জানিতে পারা যায় এবং এই সঙ্গেই ঠাকুরবাড়ীর নাট্যাভিনয়ের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথকে লইয়াই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর নাট্যাভিনয়ের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত হয়; ইহার দ্বিতীয় পর্বের ইতিহাস প্রথম পর্ব হইতে অনেক বিষয়েই স্বতন্ত্র। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রেরণা বাহির হইতে আসিয়াছিল, ইহার কৃতিত্ব ও সাফল্য বাহিরের উপকরণের উপরই অনেকখানি নির্ভর করিয়াছিল; সেইজন্যই ইহাকে অধিককাল রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই; কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের প্রথম ভিত্তিই ঠাকুরবাড়ীর নিজস্ব উপাদানের উপর স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার অস্তিত্বের জন্য তখন হইতে আর বাহিরের কোন উপকরণের উপর নির্ভর করিতে হয় নাই, সেইজন্য ইহা দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভ করিয়া এ দেশের নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে ইহার নিজের বৈশিষ্ট্য কার্যকর ভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বিতীয় পর্বের আনুপূর্বিক ইতিহাস ঠাকুর পরিবারের প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কৃষ্টিমূলক আদর্শ দ্বারা গঠিত হইয়াছিল।

জোড়াসাঁকোর নাট্যশালার প্রথম পর্বের ইতিহাসের আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত কি আবহাওয়ার মধ্য দিয়া বাল্যকাল হইতেই গড়িয়া উঠিতেছিলেন। কেবল নাট্যাভি-..র প্রতিই অনুরাগ নহে, সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগও ঠাকুর পরিবারের বিশিষ্ট কৌলিক ধর্ম ছিল। ইহাদের মধ্য দিয়াই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন অপরিণতবয়স্ক বালক, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ পূর্ণ যুবক, তাঁহার যুব-মন কাব্যের ভাব-বিলাসিতায় বিভোর। তখন তিনি 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্য রচনা করিতেছিলেন। তাঁহার ভাব-বিলাসিতা বালক রবীন্দ্রনাথের কবিমনকে স্পর্শ না করিয়া পারিল না। কাব্যের এই স্বপ্নবিলাসিতার পার্শ্বেই ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতের সুরপুরী গড়িয়া উঠিতেছিল। ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয়; সেইজন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে ঠাকুর পরিবারের তরুণ যুবকদিগের জন্য সঙ্গীত শিক্ষারও

যথোচিত ব্যবস্থা ছিল। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা প্রত্যেকেই সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথও অতি সহজেই তাঁহার গীতিমধুর কণ্ঠস্বর লইয়া সেদিকে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নাট্যরচনায় ভাব-বিলাসিতা ও গীতিপ্রবণতার ইহাই ইতিহাস।

কাব্যে হাতেখড়ির সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নামক নাটকখানি বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এখানেই পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে তাহার প্রথম পরিচয় স্থাপিত হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ১৩ বৎসর মাত্র; অবশ্য সেই নিতান্তই অপরিণত বয়সের পরিচয়ের ভিতর দিয়া সেক্সপীয়রের রসোপলব্ধি তাঁহার পক্ষে কতখানি সম্ভব হইয়াছিল, তাহা বিচার করিয়া কোন লাভ নাই, তাহার কোন উপায়ও নাই; তথাপি আজন্ম চোখের সামনে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে পরিচিত থাকিয়া এবং বাল্যকালীন শিক্ষার ভিতর দিয়া, উচ্চাঙ্গ নাট্যসাহিত্যের সঙ্গেও এইভাবে প্রত্যক্ষ পরিচয় স্থাপন করিয়া তাঁহার যে সাহিত্য-সংস্কার গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা যে নাট্যরচনায় প্রেরণা লাভের সকল দিক দিয়াই অনুকূল ছিল, তাহাই অনুমান করা যায়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর নাট্যশালাটি লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় কিছুকাল পর 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামে এক নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তাহাতে গীতিবাদ্য, আবৃত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিত এবং মধ্যে মধ্যে নাট্যাভিনয় হইত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিমধ্যেই নিজে কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সেই সব নাটকই প্রধানতঃ ইহাতে অভিনীত হইত। ইহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত 'এমন কর্ম আর করব না' নামক একটি প্রহসনের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অলীকবাবুর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম নাট্যাভিনয়। গীতবাদ্য ও নাট্যাভিনয়ের আবহাওয়ার মধ্য দিয়া কৈশোর ও বাল্য উত্তীর্ণ হইয়া রবীন্দ্রনাথ যৌবনে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমবার বিলাত যান। বিলাতে বাসকালীনই তিনি 'ভগ্নহৃদয়' নামক তাঁহার সর্বপ্রথম গীতি-নাট্যটি রচনার সূত্রপাত করেন। দুই বৎসর পরই তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন এবং 'ভগ্নহৃদয়' গীতিনাট্যখানির রচনা শেষ করেন। এই ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কয়েকটি পারিবারিক নাট্যানুষ্ঠানে ঘরোয়াভাবে যোগদান করেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। প্রথমতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মানময়ী' নাটকের অভিনয়ে তিনি মদনের

ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ইহার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া দিয়াছিলেন,—'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি'—ইত্যাদি। অনেকে মনে করেন, ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয়। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্র-কথা'য় উল্লেখিত হইয়াছে যে, ঠাকুর বাড়ীর ঘরোয়া নাট্যানুষ্ঠানে 'বিবাহ উৎসব' নামে এক গীতিনাট্যের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ একটি স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে আরও একটি তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে যে, এই সময়ের পারিবারিক নাটকের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফির সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী তাঁহার জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৮৭৯ স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত 'বসন্ত উৎসব' নামক নাটকে রবীন্দ্রনাথ একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া টিনের তলোয়ার লইয়া যুদ্ধের অভিনয় করেন।

প্রথমবার বিলাতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বিদেশী গানের সুর দ্বারা বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, দেশে ফিরিয়া দেশীয় সুরচর্চার সঙ্গে বিদেশী সুরেরও চর্চা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন, "এই দেশী ও বিদেশী সুরের চর্চার মধ্যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র জন্ম হয়"। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচিত হয়। ঠাকুরবাড়ীর 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামক যে সভার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার এক অধিবেশনে ইহা অভিনয় করিবার জন্য আয়োজন হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এই অভিনয়ের আয়োজন হইতে লাগিল; ঠাকুরবাড়ীর পূর্ববর্তী নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে ইহার সকল বিষয়েই পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হইল। রবীন্দ্রনাথ নিজে বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী (৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা) প্রতিভা দেবী সরস্বতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। ইহা যে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত নাটকের সর্বপ্রথম অভিনয় তাহাই নহে, এই অভিনয়ের মধ্যে স্ত্রীভূমিকায় নিজের পরিবারস্থ কুমারীদের ইহাই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য অভিনয়। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নাট্যাভিনয়ের এখানেই সূত্রপাত হয়। এই নাটকের অন্যান্য ভূমিকায় অক্ষয় চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অংশগ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহারা এই অভিনয়ে

উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয়ের শেষে এই কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন—

উঠেছে নবীন রবি নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয়-সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন পরই অনুরূপ আর একখানি গীতিনাট্য রচনা করেন, তাহার নাম 'কাল-মৃগয়া'—রামায়ণ হইতে সিন্ধুমনি-বধের বৃত্তান্তটি গ্রহণ করিয়া এই গীতিনাট্য রচিত হয়। এই নাটকখানিকেও অভিনয়ে রূপ দিবার জন্য অনুরূপ আয়োজন হইতে লাগিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ইহার অভিনয় হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর তেতলার ছাদে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজি 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় যে বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—

"A conversazione of Bengali authors was held at the house of Baboo Debendranath Tagore, at No. 6 Dwaraka nath Tagore's Street, Jorasanko, on Saturday evening last. There was a large gathering of Bengali authors, editors and other gentlemen. A short melodrama named Kalamrigaya or the "The Fatal Hunt" was written for the occassion by Baboo Rabindranath Tagore well known to the literary world. The drama was based upon a story from Ramayan. The dramatis personae were represented by the members of the Tagore family, both male and female. All the parts were well sustained."

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর নাট্যাভিনয়ের পালা একরকম এইখানেই শেষ হয়—রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ের পরবর্তী ইতিহাস শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত।

৫

শান্তিনিকেতনে নাট্যাভিনয়

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে টিকিট বিক্রয় করিয়া ষ্টার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পুনরায় অভিনয় করেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের ইহাই সর্ব প্রথম আত্মপ্রকাশ বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনের মন্দির স্থাপিত হয় এবং সেই উপলক্ষেই ৭ই পৌষের উৎসব ও মেলার প্রবর্তন হয়। এই মন্দিরটিকে কেন্দ্র করিয়াই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহকেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পীঠস্থান করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইবার পর তিনি শিলাইদহের বাস উঠাইয়া দিয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষকতার কার্য আরম্ভ করিলেন। এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। ১৩০৯ সাল ইংরেজি ১৯০২ ১লা বৈশাখ তারিখে এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শান্তিনিকেতনের প্রথম নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানগুলি প্রথমতঃ কেবলমাত্র মৌখিক বক্তৃতা ও ব্রহ্মোপাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, ক্রমে ইহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নূতন নূতন নাটক রচিত ও অভিনীত হইত। শান্তিনিকেতনের এই উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম নাট্য-রচনার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার 'শারদোৎসব' রচনায়। ১৩১৫ সালের শারদীয় অবকাশের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদিগের জন্য সময়োপযোগী নাট্যরচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাহার ফলেই 'শারদোৎসব' রচিত হয়। নাটকখানি রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহা পূজার ছুটির পূর্বে আশ্রমের বালক ও অধ্যাপকগণ দ্বারা অভিনীত করাইলেন। তৎকালীন আশ্রমবাসীর অভিনয়োপযোগী করিবার জন্যই ইহাকে স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত করিয়া রচনা করা হয়। 'শারদোৎসব' অভিনয়ের ভিতর দিয়াই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অভিনয় পরিকল্পনা সর্বপ্রথম রূপ পাইয়াছিল, ইহার সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে ইতিপূর্বে যে সকল নাট্যাভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহাদের যে কেবল দৃশ্যতই পার্থক্য ছিল, তাহাই নহে—অন্তরের দিক দিয়াও কোন সম্পর্ক ছিল না। 'শারদোৎসব'-এর অভিনয়াঙ্গিকের মধ্যেই

রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ নাটকসমূহের অভিনয়বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী কালে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, 'শারদোৎসব' অভিনয়ের মধ্য দিয়াই তাহার প্রথম সূচনা দেখা দিয়াছিল। শান্তিনিকেতনে 'শারদোৎসবে'র প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে তখনও কোন ভূমিকা গ্রহণ করিলেন না সত্য; কিন্তু অনতিকাল ব্যবধানেই তিনি নিজেও অভিনেতা রূপে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতে লাগিলেন।

'শারদোৎসবে'র পর বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমেব বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে 'বালক' পত্রে প্রকাশিত 'মুকুট' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি নাট্যীকৃত হইয়া একটি ক্ষুদ্র নাটিকা রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহারও নাম ছিল 'মুকুট'। ইতিমধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক আর একখানি নাটক রচনার পর রবীন্দ্রনাথ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রসিদ্ধ নাটক 'রাজা' রচনা করেন। পৌষ মাসে নাটকখানি রচিত হয় এবং পরবর্তী চৈত্রমাসেই গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে শান্তিনিকেতনে তাহা অভিনয় করিবার ব্যবস্থা হইতে থাকে। এই নাটকাখ্যানের মধ্যে বসন্তোৎসবের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা নাটকের অভিনয়কালের উপর লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

শান্তিনিকেতনে 'রাজা' নাটকের প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ ইহার ঠাকুরদার ভূমিকায় স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নবপর্যায়ে নূতন পরিকল্পনায় শান্তিনিকেতনের নাট্যাভিনয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই সর্বপ্রথম ভূমিকা গ্রহণের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরও 'রাজা' নাটক শান্তিনিকেতনে ও জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বহুবার' অভিনীত হইয়াছে, তিনিও তাহাতে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ঠাকুরদার ভূমিকাতেই তাঁহার প্রথম সূচনা। 'রাজা'র পর 'ডাকঘর' রচিত হয়। এই সময়ে কবির জীবনের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে তিনি তাঁহার 'ডাকঘর' নাটকখানি তাঁহার কলিকাতার গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধবদিগকে পাঠ করিয়া শোনান। 'ডাকঘরে'র অভিনয় অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ অধিকতর চিত্তাকর্ষক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

১৩২০ সালের চৈত্র মাসে গ্রীষ্মাবকাশের জন্য শান্তিনিকেতনের আশ্রম ও বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পুর্বে অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকটির অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আচার্যের

ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই অভিনয়ের আর একটি স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ইহাতে এণ্ড্রুজের সহকর্মী পিয়ার্সন সাহেব শোনপাংশুদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার এই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন—'তাঁহার সেই ভাঙা ভাঙা বাঙলায়—খেসারির ডাল যদি মুখ পর্যন্ত আসে, তবে তাকে আর একটু ঠেলে দিই'—সেই কথা কয়টির সুর এখনও কানে বাজিতেছে।'

পরের বৎসরই চৈত্র মাসে রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ নাটক 'ফাল্গুনী' প্রকাশিত হয়। নাটকখানি প্রকাশিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শান্তিনিকেতনে ইহার অভিনয়ের আয়োজন হয়। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাও স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত নাটক। শান্তিনিকেতনে ইহার প্রথম অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

পরের বৎসর মাঘ মাসে এই নাটকটির আরও কতক অংশ নূতন রচিত হইয়া বাঁকুড়ার 'নিরন্নদের জন্য অন্নভিক্ষা কল্পে' কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পুনরভিনয়ের আয়োজন হয়। এই অভিনয়ের একটু বিশেষ তাৎপর্য ছিল। এই যাবৎকাল রবীন্দ্রনাথের নূতন নাটক কেবলমাত্র শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইতেছিল। কেবলমাত্র শান্তিনিকেতনের অভিনয়ের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাট্যাভিনয়ের সঙ্গে বাংলা দেশের সাধারণ শিক্ষিত সমাজের কোনরূপ যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই; অতএব এ পর্যন্ত তাহার প্রভাবও কোথাও বিস্তৃত হইতে পারে নাই। এইবার কলিকাতায় 'ফাল্গুনী'র অভিনয়ের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম বৃহত্তর দর্শক সমাজের সম্মুখীন হইবার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। এই অভিনয়ের ভিতর দিয়াই রবীন্দ্রনাথের নিজের নূতন নাটক ও নিজস্ব অভিনয়-কৌশল কলিকাতার সুধীসমাজের সম্মুখে প্রথম প্রচার লাভ করিল।

'ফাল্গুনী'র 'বৈরাগ্য-সাধন' নামক অংশে রবীন্দ্রনাথ সেদিন কবিশেখরের ও মূল নাটকে পূর্ববৎ অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এই অভিনয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল রূপসজ্জা। মঞ্চসজ্জার গতানুগতিক রীতির সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র সৌন্দর্য শিল্পের দিক হইতে যে মঞ্চ পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ এই

মঞ্চসজ্জার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা বাংলা নাট্যাভিনয়ে একটা নূতন দিক নির্দেশ করিয়াছিল।

'ফাল্গুনী'র অভিনয়ে কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সকলের নিকটই যে ইহা সমান সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। অনেকে ইহার সম্বন্ধে অতি কঠোর বিরুদ্ধ মন্তব্যও সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেকে আবার ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করিয়াছিলেন। তবে একথা স্বীকার করিতেই হয় যে, দর্শকদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাট্যাভিনয় দর্শনে অনভ্যস্ততাও এই অশ্রদ্ধার একটি প্রধান কারণ। রবীন্দ্রনাথের নূতন নাট্যাভিনয় কলিকাতার সুধীসমাজ প্রথম যে ভাবেই গ্রহণ করুক, ইহার মধ্য দিয়াই বাংলা নাট্যাভিনয়ের গতানুগতিকতার সম্মুখে যে এক নূতন আদর্শ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

'ফাল্গুনী'র দুই বৎসর পর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'ডাকঘর' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'ডাকঘর' নাটকটি রচনা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কলিকাতার গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধবদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহা পাঠ করিয়া শুনান। এইবার 'ডাকঘর'-এর অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল এবং রবীন্দ্রনাথ ইহাতে ঠাকুরদার অংশ অভিনয় করিলেন। দুই দিন এই অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অভিনয়ে তৎকালীন প্রাদেশিক জাতীয় মহাসভার বিশিষ্ট কর্মী ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

ইহারও প্রায় দুই বৎসর পর ১৩২৬ সালে শারদীয় অবকাশের পূর্বে শান্তিনিকেতনে পুনরায় 'শারদোৎসব'-এর অভিনয় হয়। শান্তিনিকেতনে 'শারদোৎসব'-এর পূর্ববর্তী অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই, এইবার তিনি সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। ইতিমধ্যে 'শারদোৎসব' নাটকখানি সামান্য পরিবর্তিত আকারে 'ঋণ-শোধ' নামে প্রকাশিত হয়। ১৩২৮ সালে শান্তিনিকেতনের শারদীয় অবকাশের পূর্বে 'ঋণ-শোধে'র প্রথম অভিনয় হয়, রবীন্দ্রনাথ ইহাতে কবিশেখরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ের প্রথম পর্ব শেষ হয়।

৬

কলিকাতায় রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয়

যতদূর আলোচনা করা গেল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথ এই পর্যন্ত কেবলমাত্র জোড়াসাঁকোর নিজ বাড়ী ও শান্তিনিকেতনের নিজ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন নাই। জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতনের পরিচিতির পরিসর খুব বিস্তীর্ণ নহে। সে জন্য তখন পর্যন্তও অভিনেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কোনদিনই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে অভিনেতা কিংবা নাট্যকার হিসাবে কোন যোগ স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন নাই, তথাপি শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে তাঁহাকে পরবর্তী জীবনে কয়েকবার কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতে হইয়াছে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার আলফ্রেড্ রঙ্গমঞ্চ ও ম্যাডান রঙ্গমঞ্চে 'শারদোৎসব' অভিনয়ের ভিতর দিয়াই তাঁহার এই বিষয়ে প্রথম প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অবশ্য একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিলেও নিজস্ব মঞ্চ-বৈশিষ্ট্য ও দৃশ্যসজ্জা পরিকল্পনা তিনি কখনও বিসর্জন দেন নাই, অর্থ-সংগ্রহের অনুরোধে সাধারণ দর্শকের রুচিকর করিবার জন্য নিজের শিল্পবোধকে তিনি কখনও খর্ব করেন নাই। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপর এই প্রথম অভিনয়েও তিনি তাঁহার শান্তিনিকেতনের নিজস্ব সম্প্রদায়টি লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার পরের বৎসরই তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ নাটক 'বিসর্জন' লইয়া কলিকাতা এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে পুনরায় আবির্ভূত হন। এই নাটকে তিনি জয়সিংহের অংশে অভিনয় করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ের দ্বিতীয় পর্ব এইখানেই শেষ হইল।

তৃতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ নাট্যাভিনয়ের মধ্যে নৃত্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে তখনও নৃত্যের কোন স্থান ছিল না। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের নাট্যাভিনয়গুলির মধ্যেও নৃত্যের কোন স্থান দেখিতে পাওয়া যাইত না—সঙ্গীতকারী বালকদল ঘুরিয়া ফিরিয়া গান গাহিত—এই পর্যন্তই। তারপর ক্রমে অভিনয়ের মধ্যে নৃত্য সংযোগ করিবার

ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তাহাও একদিনে সম্ভব হয় নাই। শিক্ষিত মনের রুচি ও নীতির মূলে কোনরূপ আঘাত না করিয়া অতি সতর্কতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন। ১৩৩১ সালের ভাদ্রমাসে কলিকাতায় আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে 'অরূপ রতন' নাটকের মূকাভিনয়ে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নাটকটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া গিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতৃগণ অপরিস্ফুট নৃত্যের অনুরূপ ভঙ্গি দ্বারা ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ নৃত্যনাট্যের প্রথম সোপান রচিত হইল। ইহার পর হইতেই ছাত্র-ছাত্রীগণের মিলিত অভিনয়ের মধ্য দিয়া শান্তিনিকেতনের কলাভবন প্রবর্তিত নৃত্যানুষ্ঠান রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয়ের একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল।

রবীন্দ্রনাথের ৬৫তম জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে তাঁহার সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য 'নটীর পূজা' শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথের এই নূতন নাট্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার লিখিয়াছেন, 'কিছুদিন হইতে কেবল মেয়েদের দ্বারা অভিনয় হইতে পারে, এমন একটি নাটিকা প্রণয়নের জন্য তাঁহাকে আশ্রমের মেয়েরা তাগিদ করিতেছিল। সেই উদ্দেশ্যে লিখিতে আরম্ভ করেন। বহু গান সেই সঙ্গে রচিত হয়। তবে এই নাটিকাটি খ্যাতি লাভ করে ইহার নৃত্যের জন্য। শ্রীমতী গৌরী বসু নটীর ভূমিকা গ্রহণ করেন; তাঁহার নৃত্যে একটি অপরূপ অপার্থিব সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শান্তিনিকেতনে নৃত্য একটি নূতন রূপ লইল। 'অরূপ রতনে'র কলিকাতায় মূক অভিনয় হইয়াছিল। সাহসভরে নৃত্যের ছন্দে তখনও দেখাইবার মত হয় নাই। কিন্তু গৌরীর শ্রীমতীর ভূমিকা দেখিয়া কবির সন্দেহ থাকিল না যে বাহিরে শান্তিনিকেতনের কিছু দেখাইবার আছে। কিছুকাল পরে কলিকাতায় এই নাটিকার অভিনয় হয়; গৌরীর নৃত্য সত্যই নৃত্য কলায় যুগান্তর আনিল। বাঙ্গালা দেশের নৃত্যের ইতিহাস ১৩৩৩ সাল হইতে নূতন পথে চলিল।'

'নটীর পূজা'য় শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বাড়ীর অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ ভিক্ষু উপালির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে গৌরী বসুর কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি প্রসিদ্ধ শিল্পী নন্দলাল বসুর কন্যা। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'নটীর পূজা'র সর্বপ্রথম অভিনয় কলিকাতার সকল শ্রেণীর লোকেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। 'নটীর পূজা'র অভিনয়ের পর

হইতে নৃত্যানুষ্ঠান রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয়ের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। তখন হইতে রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনায় নাটকের কাহিনী অপেক্ষা ইহার সঙ্গীত ও নৃত্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইল। শান্তিনিকেতন কলাভবনের শিক্ষায় প্রাচ্য নৃত্যের যে নূতন আদর্শ গড়িয়া উঠে, তাহা অবলম্বন করিয়াই তখন রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গীতি-বহুল ঋতু-বিষয়ক নৃত্যনাট্য রচিত ও অভিনীত হয়, ইহাতে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরাই যোগদান করিত। বলা বাহুল্য, এই সকল নৃত্যাভিনয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ প্রযোজকের দায়িত্বই গ্রহণ করিতেন, কদাচিৎ অংশবিশেষ আবৃত্তি করিতেন মাত্র।

প্রায় সত্তর বৎসর বয়সের নিকটবর্তী হইয়া রবীন্দ্রনাথ আর একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে দীর্ঘ এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা 'তপতী'। ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'রাজা ও রাণী'র পরিবর্তিত গদ্য নাট্যরূপ 'তপতী'র প্রথম অভিনয় হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ৬৮ বৎসর। রবীন্দ্রনাথ সেই বয়সে রাজা বিক্রমের অংশে অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বর্গত অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যা অমিতা দেবী তপতীর অংশে অবতীর্ণ হইলেন। কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ক্রমান্বয়ে চারি রাত্রি এই নাটকের অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের এই অভিনয় দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নাটকের অভিনয়ে দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছিল, মঞ্চটি সুন্দর করিয়া সজ্জিত হইলেও তাহার মধ্যে দৃশ্যপটের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

১৯৩০ সনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের এক দল লইয়া 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক অভিনয় করিবার জন্য সিংহল যাত্রা করেন। তাহাতে তিনি কোন বিষয়েই অংশ গ্রহণ করেন নাই। ইহার পরের বৎসর শান্তিনিকেতনে 'শাপমোচনে'র অভিনয় হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ আদ্যোপান্ত নাটকখানি পাঠ করিয়া যান, মঞ্চে কুশীলবগণ মূক অভিনয় প্রদর্শন করেন।

'তপতী'তে বিক্রমদেবের অভিনয়ই রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয় হয়। ইহার পরও জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতনে আরও কয়েকটি পূর্বাভিনীত নাটকের মধ্যে তিনি অবতীর্ণ হন, তাহাদের মধ্যে চুয়াত্তর বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে 'শারদোৎসবে' সন্ন্যাসীর ভূমিকায়ই তাঁহার সর্বশেষ নাট্যাভিনয়। তখন তাঁহার দেহ অশক্ত হইয়া আসিয়াছে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারেন না, শান্তিনিকেতনের ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি

নিজে সেইবার তাহাদিগের সহিত শেষবারের মত অভিনয় করিলেন। তারপর ১৯৩৫ সনে কলিকাতা এম্পায়ার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ 'অরূপ রতন' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। ইহাতে তিনি রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে থাকিয়া রাজার অংশে বাক্যাভিনয় করেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে এখানেই তাহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। শেষবারের মত ১৯৩৬ সনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অর্থ সংগ্রহের জন্য 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র দল লইয়া ভারত ভ্রমণে বাহির হ'ন। তিনি উত্তর ভারতের নানা স্থানে নৃত্যনাট্যের প্রদর্শনী করিবার পর মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন।

৭

প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, নট ও প্রযোজক। কিন্তু এই বিষয়েও তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি স্বরচিত নাটক ভিন্ন অন্যের রচিত নাটকের অভিনয়ে বিশেষ কোনদিন কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই; কিংবা অন্যের কোন নাটকের প্রযোজনাও করেন নাই। বাংলা রঙ্গমঞ্চের অভিনয়-প্রকৃতির সহিত তাঁহার কোন যোগ ছিল না; তিনি স্বরচিত নাটকের অভিনয়াঙ্গিক নিজেই গড়িয়া লইয়াছিলেন এবং নিজের অভিনয়ের মধ্যে তাহারই রূপদান করিয়াছেন। তিনি এতদ্দেশীয় প্রচলিত অভিনয়-পদ্ধতিকে কোনদিন স্বীকার করেন নাই, কিংবা সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে নিজের অভিনয় বৈশিষ্ট্য প্রচার করিবারও সুযোগ সন্ধান করেন নাই। বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের সহিত যোগ না থাকায় অভিনেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথেরও পরিচয় নির্দিষ্ট দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইয়া ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয় যে, উচ্চাঙ্গ অভিনয়-গুণ রবীন্দ্রনাথের আয়ত্ত ছিল। তাঁহার সুগঠিত সুদীর্ঘ দেহ, আয়ত চক্ষু, তীক্ষ্ণাগ্র নাসিকা প্রত্যেকটিই কৃতী নটের যোগ্য অলঙ্কার। তাঁহার কণ্ঠস্বরের ঐশ্বর্যও অতুলনীয় ছিল, তথাপি তাহার মধ্যে একটু ত্রুটি এই ছিল যে, তাহাতে পুরুষোচিত গাম্ভীর্যের অভাব ছিল; তাহা প্রয়োজনমত খুব উচ্চগ্রামে উঠিয়া গেলেও কখনও গীতিস্বরমুক্ত হইতে পারিত না। তাঁহার কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের অনুগামী ছিল, তাহার মধ্যে কর্কশ কিংবা উদাত্ত গম্ভীর পৌরুষের স্পর্শ ছিল না। অভিনেতার পক্ষে তাঁহার মুখাবয়বের আর একটু ত্রুটি এই ছিল যে, তাহা অনতিপ্রসর থাকাতে বিচিত্র ভাবের সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তি কদাচিৎ সম্ভব হইত। এই বিষয়ে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিলেই এই কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে। দিনেন্দ্রনাথের মুখাবয়ব প্রশস্ততর ছিল, তাহাতে বিচিত্র ভাবের সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তিও সম্ভব হইত। সেইজন্যই তিনি হাস্য, করুণ, গম্ভীর প্রভৃতি সকল প্রকৃতির অভিনয়েই সমান কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু কেবলমাত্র গম্ভীর বিষয়ক অভিনয়েই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইত। অভিনেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা দিনেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অধিকতর স্বীকৃত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজের যোগ্যতা অনুযায়ীই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিতেন। হাস্যরসাত্মক কিংবা লঘুবিষয়ক কোন ভূমিকায় তিনি কোনদিন অবতীর্ণ হন নাই। অতএব তিনি যে অংশে অবতীর্ণ হইতেন, তাঁহার দিক হইতে তাহা নিখুঁতভাবেই অভিনীত হইত। এই বিষয়ে বিদেশী দর্শক টমসনের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'শারদোৎসব'-এর অভিনয় দেখিয়া এডোয়ার্ড টম্‌সন তাঁহার রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"......the star performance of the evening was Rabindranath's own rendering of the double parts of Chandrasekhar and, later, in the mask proper, of Baul the blind bard. Both parts were greatly sustained, but the interpretation of Baul reached a height of tragic sublimity which could hardly be endured. Not often can men have seen a stage so piercing in its combination of fervid acting with personal significance. It was almost as if Milton had acted his own Samson Agonistes. Knowing through what storms the poet's mind was passing, and what forebodings were with him, I felt as if the acting might easily be precursor of reality."

স্বরচিত নাটক অভিনয়ের মধ্যে অভিনেতার যে বিশেষ কতকগুলি সুবিধা আছে, রবীন্দ্রনাথও তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন।

এইবার প্রযোজক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ নিজের নাটক ব্যতীত অন্য কাহারও রচিত কোন নাটক কোনদিন প্রযোজনা করেন নাই; স্বরচিত নাটকের প্রযোজনা বিষয়ে প্রযোজকের যে সুবিধাটুকু আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাও পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্বেও দেখিতে পাওয়া যায়, মঞ্চের ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার যে কি অভিমত, তাহা তাঁহার রচিত 'রঙ্গমঞ্চ' (১৩০৯) নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে তিনি মঞ্চসজ্জার বাস্তব আবেদনকে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে পাশ্চাত্ত্য ধরণের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের যে আদর্শ স্থিরীকৃত হইতে চলিয়াছিল, তাহার সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের এ'বিষয়ে নূতন আঙ্গিকের উদ্ভাবনা একটু নূতনত্বের সৃষ্টি করিলেও, তাহা যে সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা নহে। কারণ, এ কথা সত্য, মঞ্চব্যবহারের দিক দিয়া, নূতন আঙ্গিক পরিকল্পনা বাঙ্গালার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কোন কার্যকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রথম জীবনের নাট্যাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথও সাজপোষাক ও মঞ্চোপকরণকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই ; পূর্বেই বলিয়াছি, এই বিষয়ে তিনি একটি ক্রমপরিণতির ধারা অনুসরণ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত গিয়া মঞ্চোপকরণকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন কেবলমাত্র অভিনয়-কলার উপরই জোর দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে শান্তিনিকেতনের একজন প্রবীণ ছাত্রের অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য,—'প্রথম আমলে দেখিয়াছি, নাটকে কেনা পোষাক ব্যবহৃত হইত। ক্রমে কেনা পোষাকের যুগ গিয়া এখানকার শিল্পিগণ কর্তৃক পরিকল্পিত পোষাক ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পটভূমিকা ও যবনিকায় সত্যকার শিল্পীদের তুলির দাগ পড়িল। সাজপোষাকের আড়ম্বরের চেয়ে আলোর নিপুণ প্রয়োগের দিকে চোখ গেল। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে হার্মোনিয়াম দূর হইয়া গিয়া বীণা, বাঁশী, এসরাজ দেখা দিল। এক কথায়, অভিনয়ের সৌন্দর্যকলার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল' (প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', ১৩৫৩, পৃঃ ৭২)। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তিনি যে 'তপতী' নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাতে দৃশ্যপটের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। তিনি এই সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন—'আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভুলাবার চেষ্টা।' (ভূমিকা)

রবীন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান আছে, তাহা উচ্ছেদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ নট শিশিরকুমার ভাদুড়ী উল্লেখ করিয়াছেন—'আমাদের দেশে নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শক বিচারকের মত আসনে বসে থাক্‌বেন এবং অভিনেতা মঞ্চের কাঠগড়ায় আবদ্ধ আসামীর মত অভিনয় করবে—এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা ঘোরতর অসামঞ্জস্য আছে। দর্শক এবং অভিনেতার মধ্যে যে বেড়া সেকালের যাত্রায়, গ্রীক ট্র্যাজিডির অভিনয়ে, এমন কি সেক্সপীয়রের থিয়েটারেও ছিল না, সে বেড়া তুলে দেবার জন্য বর্তমান

যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন (প্রয়োগাচার্য মায়ার সোল ও রাইন্‌হার্ট) চেষ্টা করে আংশিকভাবে কৃতকার্য হয়েছেন। সেই বেড়া তুলে দেবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথও নিজস্ব দল নিয়ে দু'একবার করেছেন।' ('রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ' আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজা সংখ্যা, ১৩৪৮ সাল, পৃঃ ২০৭)।

নাট্যাভিনয়ের জন্য অনভিজ্ঞ অভিনেতাকে উপযুক্ত শিক্ষাদান বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। প্রয়োগ-শিল্পীর পক্ষে ইহা একটি প্রধান গুণ ; এই কার্যে সার্থকতা লাভ করিবার জন্য যে অধ্যবসায় ও ধৈর্যের প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাহার অভাব ছিল না ; তিনি কোনদিন কোন ব্যবসায়ী অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন নাই ; তিনি যাহাদিগকে লইয়া অভিনয় করিতেন, তাহাদের অধিকাংশ শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক ; অভিনয় ইহাদের কাহারও ব্যবসায় নহে ; কিংবা এই বিষয়ে তাহাদের কাহারও কোন পূর্বসংস্কারও থাকিবার কথা নহে। ইহাদিগকে লইয়া অভিনয় কার্যে সাফল্যের কৃতিত্ব বহুলাংশেই প্রযোজকেরই প্রাপ্য। শান্তিনিকেতনের প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ লিখিয়াছেন,—'নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় একা তিনি শিখিয়েছেন পাখী পড়ানোর মত ক'রে। প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে কোথায় কি ভাবে ঝোঁক দিতে হ'বে, কি ভাবে স্বরের বৈচিত্র্য আসবে, সবই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়েছেন। বইয়ের অক্ষরে অক্ষরে দাগিয়ে দিয়েছেন যাতে তাদের মনে থাকে। এক সময় এমন ব্যক্তিকেও তৈরী ক'রেছেন, যাকে দেখে সেই অভিনয়ের পূর্বে কেউ মনে করতে পারে নি যে, তার মুখ দিয়ে কথা ফুটতে পারে। অভিনয়কালে, অভিনেতার চালচলনে, হাবভাবে, পাছে কোন প্রকার জড়তা বা আড়ষ্টতা প্রকাশ পায়, সেই কারণে প্রতি পদক্ষেপে ওঠা-বসার, হাতের ও দেহের ভঙ্গি কি ভাবে চালালে অভিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে সেদিকেও তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না' ('প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ', পৃঃ ২১১)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলিকাতায় 'সঙ্গীত সমাজ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহার উদ্যোগেই ১৮৯৬ সনে রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র প্রথম অভিনয় হয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ কেদার ও নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় অবিনাশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ন। প্রায় সুদীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের নাট্য-নির্দেশক ও প্রযোজক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পারিবারিক জীবনের বহির্ভূত সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের তাঁহার

নির্দেশনায় এখানেই প্রকাশ্য অভিনয়ের সূচনা হয়। 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে ইহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বিষয়ে যাহা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। 'সঙ্গীত সমাজের অভিনয় উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ কি রকম পরিশ্রম করিতেন তাহার সামান্য আভাস আমরা পাই তাহার স্ত্রীকে লিখিত পত্র হইতে। সভ্যশ্রেণীভুক্ত বিলাত ফেরৎদের অনেকে বাংলাভাষা সহজভাবে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না; রবীন্দ্রনাথ দ্বিপ্রহরে কখনো বা তাঁহাদের বাটিতে গিয়া, কখনো বা সমাজভবনে আসিয়া তাঁহাদের উচ্চারণ সংশোধন করিতেন; আবার সন্ধ্যার পর মিলিত হইয়া তাঁহাদের ভূমিকা পাঠের আবৃত্তি গ্রহণ করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ ভঙ্গি আদি শিক্ষা দিতেন। এক একদিন রিহার্সেলে রাত্রি দেড়টা দুইটা বাজিয়া যাইত, তখন সঙ্কীর্ণ গলিপথ ধরিয়া হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতেন।……স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পুনর্বসন্ত' নামে গীতিনাট্যে রিহার্সেলে কোমরে চাদর বাঁধিয়া হাততালি বাজাইয়া সখীদের নাচ দেখাইয়া দেন।'

রচনার রসটি দর্শকের মনে জাগ্রত করিয়া দেওয়াই রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্য—বাহিরের আড়ম্বর দ্বারা এই রস অযথা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে; রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী সাধনা চিরদিনই বাহিরের আড়ম্বরকে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে; তাঁহার অভিনয়ের মধ্যেও ইহার কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক নাট্যাভিনয়ই প্রায়ই অভিন্ন আদর্শের অনুগামী বলিয়া ইহার বৈচিত্র্যের অভাবও উপেক্ষণীয় নহে।

৮

রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবন হইতেই নাট্যরচনায় উৎসাহী হইলেও এ' কথা সত্য, তিনি নিজস্ব আদর্শ অনুসরণ করিয়া যতদূর এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আদর্শ দ্বারা ততখানি প্রভাবিত হন নাই। তথাপি এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন বহু সংস্কৃত নাটক বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তেমন কোন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিতে দেখা না গেলেও অনেক সময় সংস্কৃত নাটকের বহির্মুখী কিংবা অন্তর্মুখী আদর্শ দ্বারা তিনি কিছু কিছু প্রভাবিত হইয়াছেন।

প্রথমতঃ দেখা যায়, তিনি সংস্কৃত নাটকের মঞ্চব্যবস্থাকেই আদর্শ মঞ্চ-ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। সে কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক তিনি তাঁহার নাট্যরচনায় গ্রহণ করিয়াছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাট্যকাব্য রচনার যুগ পর্যন্ত ইংরেজি নাটকের আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হইলেও, এ'কথা সত্য, ইহার পরবর্তী যুগ হইতেই তাঁহার নাটক রচনা অঙ্গিকের দিক দিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল; এই যুগে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিককেই যুগোপযোগী করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'ফাল্গুনী' নাটকে তিনি নাট্যকাহিনীটি যে ভাবে মঞ্চের উপর উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার কর্তৃক নাট্য-কাহিনী উপস্থাপনারই অনুরূপ। 'ফাল্গুনী' নাটকের 'সূচনা' অংশের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের 'প্রস্তাবনা' বা 'নান্দ্যন্তে সূত্রধার' অংশের আদর্শগত কোন পার্থক্য নাই। সংস্কৃত নাটকে কাহিনী রঙ্গমঞ্চে প্রথম উপস্থিত করিবার জন্য সূত্রধার যে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া থাকে, রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' নাটকে তাহা সূত্রধারের পরিবর্তে কবিশেখর চরিত্র দ্বারা সম্ভব করিয়াছেন। যেমন—

'ওহে কবিশেখর, আমাকে কিছুমাত্র সময় দিয়ো না,—প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখো—একটা যা হয় কিছু করো—যেমন এই ফাল্গুনের হাওয়াটা যা-খুশি-তাই

করছে তেমনি তরো। হাতে কিছু তৈরি আছে হে? একটা নাটক কিংবা প্রকরণ, কিংবা রূপক, কিংবা ভাণ, কিংবা—

তৈরি আছে—কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভাণ, তা ঠিক বল্‌তে পার্‌ব না।'

এখানে পদ্ধতিটি সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার অনুরূপ, কিন্তু বক্তব্য বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 'বসন্তে'র মধ্যেও অনুরূপ পদ্ধতিতে কাহিনীর উপস্থাপনা করিতে দেখা যায়—

রাজা। আজ বসন্ত-উৎসবে কী পালা তৈরি করেছ সেইটে বল।

কবি। আজ সেই পলাতকার পালা।

এখানেও সংস্কৃত নাটকেরই সূত্রধারের কথা কবির মুখে শুনিতে পাওয়া গেল এবং সেইভাবেই এখানেও নাট্যকাহিনীর সূচনা হইল।

'শেষবর্ষণ' গীতিনাট্যের মধ্য দিয়াও কাহিনী উপস্থাপনার প্রায় অনুরূপ প্রণালী গ্রহণ করা হইয়াছে—

রাজা। নটরাজ, তোমাদের পালাগানের পুঁথি একখানা হাতে দাও না।

নটরাজ। (পুঁথি দিয়া) এই নিন মহারাজ।

রাজা। তোমাদের দেশের অক্ষর ভাল বুঝ্‌তে পারিনে। কী লিখ্‌ছে? "শেষ-বর্ষণ?"

নটরাজ। হাঁ মহারাজ।

রাজা। আচ্ছা বেশ ভাল। কিন্তু পালাটা যার লেখা সে লোকটা কোথায়?

গীতিনাট্য রচনার এই রীতির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ পাইলেও ইহার প্রকাশ ভঙ্গিটির মধ্যে সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়।

যদিও এ'কথা সত্য যে, প্রথম জীবনে রচিত নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে আঙ্গিকের দিক দিয়া সংস্কৃত নাটকের বিশেষ কোন প্রভাব দেখা যায় না, তথাপি অন্যান্য কোন কোন বিষয়েও ইহারা সংস্কৃত নাটকের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। এই যুগের কোন কোন নাটকের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী বিদূষক শ্রেণীর চরিত্রের পরিকল্পনাটি তাহার অন্যতম প্রমাণ। এই সম্পর্কে 'রাজা ও

রাণী' নাটকের দেবদত্ত চরিত্রটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। চরিত্র-পরিচিতিতে ইহার সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দেবদত্ত 'রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ।' তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে বিদূষক বলিয়া উল্লেখ না করিলেও নাটকের সর্বত্রই তাহার আচার-আচরণ সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ। বিশ্বাসভাজন, পরিহাস-রসিক, লোভী, স্ত্রৈণ এবং নিরক্ষর ব্রাহ্মণই সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্র হইয়া থাকে। দেবদত্ত সম্পূর্ণ অনুরূপ চরিত্র। সে যখন শুনিতে পাইল যে রাজা তাঁহাকে পুরোহিত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন সে বিস্মিত হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল,

আমাকে বরিবে নাকি পুরোহিত পদে ?
কী দোষ করেছি, প্রভো ? কবে শুনিয়াছ
ত্রিষ্টুভ্ অনুষ্টুভ্ এই পাপমুখে ?
তোমার সংসর্গে পড়ে ভুলে বসে আছি
যত যাগযজ্ঞবিধি। আমি পুরোহিত ?
শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে।
এক বই পিতা নয় তাঁরি নাম ভুলি,
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে।
স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতে খানা
তেজোহীন ব্রাহ্মণ্যের নির্বিষ খোলস।

সংস্কৃত নাটকে বিদূষকের সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটি ব্রাহ্মণ চরিত্র থাকে, সে বিদূষকের মত যেমন নিরক্ষর নহে, তেমনই তাহার আচরণ পরিহাসপ্রিয়ও নহে ; সংস্কৃত নাটকে সে কঞ্চুকী বলিয়া পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকে কঞ্চুকীর সম্পূর্ণ অনুরূপ চরিত্র ত্রিবেদী। সংস্কৃত নাটকে কঞ্চুকী প্রধানতঃ অন্তঃপুরের অভিভাবক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিশ্বাসভাজন ও দায়িত্বশীল এবং সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত, বিদূষকের মত নিরক্ষর নহে। 'রাজা ও রাণী' নাটকের ত্রিবেদী চরিত্রের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের কঞ্চুকী চরিত্রের এই সকল গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। চরিত্রটির পরিকল্পনার দিক দিয়া সংস্কৃত নাটকের চরিত্রের সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য নাই। এমন কি, এই নাটকের শেষাংশে কাশ্মীর রাজের অন্তঃপুরে কঞ্চুকী নামেও একটি চরিত্র আছে, ইহার আচার আচরণ যে সংস্কৃত নাটকের সম্পূর্ণ অনুকূল তাহা বলাই বাহুল্য। 'তাসের দেশ' নাটকের মধ্যেও কঞ্চুকী চরিত্রের কথা আছে।

সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক ব্যতীতও রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সংস্কৃত নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলমে'র ভাবধারা দ্বারা যে কতদূর প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধ হইতেই প্রমাণিত হইবে। তাঁহার কাব্যরচনার মত নাট্যরচনার মধ্যেও কালিদাসের ভাব, সৌন্দর্যবোধ ও চিত্রকল্প নানাভাবে প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' নাটকের মধ্যে কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের মুখে কালিদাস নাগরিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়াছেন—যেমন, শার্ঙ্গরব বলিতেছেন,

'জনাকীর্ণ রাজধানী যেন একটি অগ্নিবেষ্টিত গৃহ।' শারদ্বত বলিতেছেন, 'নগরের লোকগুলি যেন অস্নাত, অপবিত্র, সুপ্ত ও বদ্ধ মনে হয়। ('অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' ৫ম অঙ্ক)

রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসও তেমনই প্রকৃতির মুক্ত জীবনের জন্য এই বলিয়া হাহাকার করিয়া উঠিত, 'হায় রে রাজধানী, পাষাণ-কারা !'

সৌন্দর্য দেখিয়া মন উদাস করিয়া দিবার কথা রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের 'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্যশব্দান্ (৫ম অঙ্ক) হইতে এবং 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র 'অনিমোত্তৎকণ্ঠামপি জনয়তি মনসো মলয় বাতঃ' (৩য় অঙ্ক) হইতে পাইয়াছেন। এই বিষয়ে উভয় কবি-নাট্যকারের মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্যও ছিল।

নাটকের মধ্যে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক ব্যতীত অন্য কোন নাটকের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ অনুভব করা যায় না। কালিদাসের 'কুমার-সম্ভবম্' এবং 'মেঘদূতম্' কাব্যই রবীন্দ্র-মানস সর্বাধিক অধিকার করিয়াছিল। তথাপি তাঁহার 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের কয়েকটি শ্লোক পদ্যানুবাদ করিতে তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র তাঁহার মত প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

কালিদাসের যে সকল কাব্যের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকের মধ্যে অনুভব করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে, তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথমই কালিদাসের 'কুমার-সম্ভবম্' কাব্যের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। রবীন্দ্র-নাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যেরও মূল বিষয় কুমার-সম্ভব। এখানেও নারীর রূপযৌবনোত্তীর্ণ কল্যাণী জননীর সত্তা আত্মপ্রকাশ করিবার কথা আছে। কুমার-সম্ভব কাব্যে যেমন মদনভস্মের পর 'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী'

এবং তাহার পরই তাঁহার জীবন কল্যাণে প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হইয়াছিল, 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যেও মদন ও বসন্তের ক্ষণিক আশীর্বাদের অবসানে জননী-রূপেই রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার নারীজীবনের চরম সার্থকতা দেখা দিয়াছিল। কালিদাসের কাব্যের এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকাব্য রচনার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কালিদাসের 'নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী' কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া যেন রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের চিত্রাঙ্গদা বলিয়াছেন,

'এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে, এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে ধরা, দুই হাতে ছিন্ন
করে দিয়ে সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা ; কোথায় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান ; হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী।'

নারীজীবনের সার্থকতাবোধের দিক হইতে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে ঐক্য ছিল, তাহার ফলেই রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মতই নারীর জননী সত্তার মধ্যে তাঁহার চরম সার্থকতা দেখিয়াছেন। এই দিক দিয়া 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক ও 'কুমার-সম্ভবম্' কাব্য ইহাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যের ভাবগত ঐক্য রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রা'ণীর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটিই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। রাজা বিক্রমদেব সুমিত্রাকে প্রিয়া রূপে নিজের একান্ত ভোগের অধিকারের মধ্যে লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু সুমিত্রা কেবলমাত্র রাজার প্রেয়সী হইবার মধ্যেই নারী জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজিয়া পান নাই, তিনি প্রজাবর্গের জননী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাতে নারীর জননী-সত্তার অনুভূতির মধ্যে তাঁহার জীবনের সার্থকতার কথা আছে।

৯

রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্ত্য নাটক

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সবে মাত্র তের বৎসর তখনকার কথা বলিতে গিয়া তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, 'আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি কোন মতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া 'কুমার-সম্ভব' পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া 'ম্যাকবেথ' আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম, ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ঐ পরিমাণে হালকা হইয়াছে ।' ইহার পর তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, একদিন তাঁহার উক্ত গৃহশিক্ষক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার অনুবাদ শুনাইবার জন্য তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনুবাদ শুনিয়া রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'নাটকের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন, অনুবাদটি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, ইহার কিছু অংশ বিশেষতঃ ডাকিনীর অধ্যায়টি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল (১২৮৭, আশ্বিন), তাহা হইতে ইহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে তের বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের সেক্সপীয়রের মত নাট্যকারের ইংরেজি অনুবাদ করিবার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের অনুবাদের ঘটনাটি রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্য সমালোচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, দেখা যায়, নাট্যকাব্য রচনার যুগ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে সকল পাশ্চাত্ত্য নাটক দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকটির একটি বিশেষ স্থান ছিল।

'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের মধ্যে নাটকীয় ঘটনা যেমন নানা দিক দিয়া রোমাঞ্চকর হইয়া উঠিয়াও একটি উচ্চাঙ্গের ট্রাজিডি সৃষ্টি করিতে সার্থক হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গীতিনাট্যই হউক, কিংবা নাট্যকাব্যই হউক ইহাদের মধ্যেও কাহিনী নানাভাবে রোমাঞ্চকর হইয়া উঠিয়াছে, অথচ সকল ক্ষেত্রেই যে সার্থক ট্রাজিডি সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যাইবে না ; অথচ সেক্সপীয়রের নাটকের প্রভাবজাত অতি-নাটকীয় (melo-dramatic) ঘটনাবলী ট্রাজিডির অনুমোদিত শিল্পসম্মতরূপে ব্যবহৃত না হইতে পারিবার জন্য তাহা অতি-নাটকেই পর্যবসিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে যে গীতিনাট্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে গীতিসুর প্রাধান্য লাভ করা সত্ত্বেও তাহা যে অতিনাটকীয় ঘটনাসঙ্কুল হইয়াছে, তাহার কারণ সন্ধান করিতে গিয়া যদি তাহাদের উপর তাঁহার অপরিণত বয়সেই 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকটির প্রভাব অনুমান করা হয়, তবে যে বিশেষ অসঙ্গত হইবে, তাহা মনে হয় না। কেবল মাত্র প্রথম জীবনের গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য কেন, তাঁহার শেষ জীবনে রচিত রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটকের কাহিনীও অনেক ক্ষেত্রেই অতি-নাটকীয়। সাংকেতিক এবং রূপক নাটকের মধ্যে বিশেষতঃ সাঙ্কেতিক নাটকের মধ্যে ঘটনার যে সংযম রক্ষা করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের অনেক সাঙ্কেতিক এবং রূপক নাটকে তাহা যে রক্ষা পায় নাই, তাহার মধ্যেও তাঁহার প্রথম জীবনের সংস্কার যে কত প্রবল ছিল, তাহা অনুভূত হইতে পারে। সুতরাং 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের অনুবাদটি 'হারাইয়া গেলে'ও রবীন্দ্রনাথের মন হইতে তাহার সংস্কার যে সম্পূর্ণ দূর হইয়া গিয়াছিল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। তের বৎসরের বালকের পক্ষে 'ম্যাক্‌বেথে'র ডাকিনী অধ্যায়ের অনুবাদ যে কত সার্থক হইয়াছিল, তাহার নিদর্শনস্বরূপ নিম্নে তাহার সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা হইল,

(ডাকিনী। ম্যাকবেথ)

দৃশ্য। বিজন প্রান্তর। বজ্র বিদ্যুৎ। তিনজন ডাকিনী।

১ম ডা—ঝড় বাদলে আবার কখন
মিল্‌ব মোরা তিন জনে।

২য় ডা—ঝগড়া ঝাঁটি থাম্‌বে যখন,
হার জিত সব মিট্‌বে রণে।

৩য় ডা—সাঁঝের আগেই হবে সেত ;

১ম ডা—মিল্‌ব কোথায় বলে দেত।

২য় ডা—কাঁটাখোচা মাঠের মাঝ।
৩য় ডা—ম্যাক্বেথ সেথা আস্‌ছে আজ।
১ম ডা—কটা বেড়াল! যাচ্ছি ওরে!
২য় ডা—ঐ বুঝি ব্যাঙ্‌ ডাক্‌ছে মোরে!
৩য় ডা—চল তবে চল ত্বরা কোরে!
সকলে—মোদের কাছে ভালই মন্দ,
মন্দ যাহা ভাল যে তাই,
অন্ধকারে কোয়াশাতে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

'ম্যাক্‌বেথ' ব্যতীত আর কোন ইংরেজি নাটক রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ করিবার কথা জানিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ আর কোন নাটক তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন নাই। 'ম্যাক্‌বেথ' ব্যতীত আর কোন পাশ্চাত্ত্য নাটকেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁহার নাট্য কিংবা অন্যান্য রচনায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে পাশ্চাত্ত্য নাটকের বিষয়বস্তু ব্যতীত অন্যান্য কোন কোন বিষয়ের অত্যন্ত গৌণ প্রভাব কোন কোন সময় তাঁহার নাটকে লক্ষ্য করা যায়। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটক রচনায় তিনি যে আইরিশ সঙ্গীতের সুরে কোন কোন গান রচনা করিয়াছেন, সে কথা তিনি তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তেই উল্লেখ করিয়াছেন (ঐ, পৃঃ ১০৭)।

পূর্বেই বলিয়াছি 'মালিনী' রচনার কাল পর্যন্তই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য নাটকের বিষয়বস্তু এবং রচনা-রীতি দ্বারা কিছু কিছু প্রভাবিত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'রাজা ও রাণী'র মধ্যে যেমন সংস্কৃত নাটকের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই সেক্সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকটির প্রভাবও অত্যন্ত স্পষ্ট অনুভূত হয়। রচনা-রীতির দিক দিয়া 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' উভয়ের সঙ্গেই সেক্সপীয়রের নাটকের সাদৃশ্য আছে। উভয়ই পঞ্চাঙ্ক নাটক, সেক্সপীয়রের নাটকের মত অমিত্রাক্ষর ছন্দে উভয় নাটকই রচিত। ভাবের দিক হইতেও ইহাদের সঙ্গে সেক্সপীয়রের নাটকের অনেকটা ঐক্য আছে। সেক্সপীয়রের নাটকের অনুরূপই নানা উপকাহিনী ও শাখাকাহিনী সৃষ্টি করিয়া উভয় নাটকেই কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টি করা হইয়াছে, অন্ধ প্রবৃত্তি ও সংস্কারের দুর্নিবার আকর্ষণের করুণ পরিণতি উভয় নাটকেরই বিষয়-বস্তু। কোন কোন ক্ষেত্রে সেক্সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের কোন কোন চরিত্রের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের

'রাজা ও রাণী' নাটকের উপর একটু প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াও অনুভূত হইতে পারে।

'রাজা ও রাণী' নাটকের রেবতী চরিত্রটি যে 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের লেডী ম্যাক্‌বেথের ছায়াতলে পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা অতি সহজেই অনুভব করা যায়। লেডী ম্যাকবেথ যে ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্বগৃহে অতিথি বৃদ্ধ রাজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য স্বামীকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, রেবতীও কাশ্মীর সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী কুমারসেনকে বঞ্চিত করিয়া নিজের স্বামীকে সিংহাসন অধিকার করিয়া লইবার জন্য প্রায় অনুরূপ ভাষাতেই উত্তেজিত করিয়াছেন। এই কার্যে ম্যাকবেথের মত চন্দ্রসেনও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনার এই অংশে সেক্সপীয়রের ভাষার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইবে—

রেবতী ॥ যেতে দাও মহারাজ। কি ভাবিছ বসি ?
ভাবিছ কি লাগি ? যাক্ যুদ্ধে, তারপরে
দেবতা কৃপায় আর যেন নাহি আসে
ফিরে।

চন্দ্রসেন ॥ ধীরে রাণী, ধীরে।

রেবতী ॥ ক্ষুধিত মার্জার
বসেছিল এতদিন সময় চাহিয়া,
আজ তো সময় এলো—তবু আজো কেন
সেই বসে আছ ?

চন্দ্রসেন ॥ কে বসিয়া ছিল, রাণী,
কিসের লাগিয়া ?

রেবতী ॥ ছি ছি আবার ছলনা ?
লুকাবে আমার কাছে ? কোন অভিপ্রায়ে
এতদিন কুমারের দাও নি বিবাহ ?
কেন বা সম্মতি দিলে ত্রিচূড় রাজ্যের
এই অনার্য প্রথায় ? পঞ্চবর্ষ ধরে
কন্যার সাধনা !

চন্দ্রসেন ॥ ধিক্ ! চুপ করো রাণী—
কে বুঝে কাহার অভিপ্রায় ?

রেবতী ॥ তবে, বুঝে
দেখো ভালো করে। যে কাজ করিতে চাও
জেনে শুনে ক'রো। আপনার কাছ হ'তে
রেখো না গোপন ক'রে উদ্দেশ্য আপন।
দেবতা তোমার হ'য়ে অলক্ষ্য সন্ধানে
করিবে না তব লক্ষ্য ভেদ। নিজ হাতে
উপায় রচনা করো অবসর বুঝে।
বাসনার পাপ সেই হ'তেছে সঞ্চয়,
তার পরে কেন থাকে অসিদ্ধির ক্লেশ?
কুমারে পাঠাও যুদ্ধে।—৩।৪

সাধারণতঃ নারীচরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কল্যাণ গুণের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে যে মহিমা উদ্ধার করিয়াছেন, রেবতী চরিত্রের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়; সেইজন্য এ' কথা মনে হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষভাবে সেক্সপীয়রের নাটকের লেডী ম্যাকবেথ চরিত্রের প্রভাবেরই ইহা ফল। তারপর ইলা এবং কুমার সেনের প্রণয়-বৃত্তান্ত এবং তাহাদের জীবনের পরিণতির সঙ্গেও সেক্সপীয়রের আর একখানি ট্রাজিডির বিষয় ও ভাবগত সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা 'রোমিও জুলিয়েট।' কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে এই সাদৃশ্য অত্যন্ত গৌণ বলিয়া মনে হইলেও একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ইহাদের উভয়ের পরিণতি একই অভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করিয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই নিয়তির একটি প্রধান ভূমিকা আছে। উভয় নাটকেই শেষ পর্যন্ত এক একটি ভুলের উপর নাট্যকাহিনীর করুণ পরিণতি সংঘটিত হইয়াছে। জুলিয়েটকে মৃত বলিয়া ভুল করিয়াই যেমন রোমিও আত্মহত্যা করিয়াছিল, তেমনই 'রাজা ও রাণী' নাটকেও বিক্রমদেব যে কুমারকে মার্জনা করিয়াছিলেন, সে সংবাদ কুমারের নিকট পৌছিবার পূর্বেই সে আত্মঘাতী হইয়াছিল। বহির্মুখী শক্তির বিরুদ্ধতাই উভয় ক্ষেত্রেই ট্রাজিডির কারণ হইয়াছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্যের সম্পূর্ণ অভাব আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। অন্ধ হৃদয়াবেগ যেমন বিক্রমদেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট, 'ওথেলো' নাটকের ওথেলো চরিত্রের মধ্যেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। ওথেলো নিজের ভুল বুঝিবার পর যেমন দেসদেমোনার মৃতদেহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনুতাপে বিদ্ধ হইতেছিলেন, তেমনই কুমারের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া সুমিত্রা যখন দেহত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার

মৃতদেহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিক্রমদেবকেও অনুতাপ করিতে শুনিতে পাওয়া যায়—

বিক্রমদেব। দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির অপরাধী করে? ইহ জন্মে
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব, তাহারও দিলে না অবকাশ?
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড কঠিন বিধান। —৫।৯

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের কথাও এইবার উল্লেখ করিতে হয়। অনেকে 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের একটি বিষয়ের সঙ্গে সেক্সপীয়রের *A Midsummer Night's Dream* নাটকটির একটি বিষয়ের সাদৃশ্য অনুভব করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা বসন্ত ও মদনের সহায়তায় মাত্র এক বৎসরের জন্য যে অপরূপ দেহ-লাবণ্য লাভ করিলেন, অনুরূপ বিষয় সেক্সপীয়রের উক্ত নাটকটির মধ্যেও উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, কিউপিডের কৌশলে হেলেনা, হারমিয়া এবং লিজাণ্ডার-ডিমিট্রিউসের মধ্যে এক ক্ষণিক স্বপ্ন-জগৎ সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই ভাব-সাদৃশ্য নিতান্ত গৌণ এবং রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট জীবন ও সৌন্দর্যবোধের বিরোধী নহে। সুতরাং ইহাকে রবীন্দ্রনাথের উপর সেক্সপীয়রের প্রভাবের কোন নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা যায় না। সেক্সপীয়রের নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মালিনী'র নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'সেক্সপীয়রের নাটক আমাদের নিকট বরাবর নাটকের আদর্শ; তাহার বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার ক'রেছে। কিন্তু 'মালিনী' নাটক যে তাহার ব্যতিক্রম তাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। 'মালিনী' নাটকের রচনা রীতির সঙ্গে অনেকে গ্রীক্-নাটকের সাদৃশ্য অনুভব করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'হাস্য কৌতুক' গ্রন্থে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌতুক নাট্যগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "য়ুরোপে 'সারাড' নামক এক প্রকার নাট্য লেখা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়। ইহার মধ্যে হেঁয়ালী-রক্ষা করিতে গিয়া লেখা

সঙ্কুচিত করিতে হইয়াছিল—আশা করি সেই হেঁয়ালীর সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না। এই হেঁয়ালী নাট্যের কয়েকটি বিশেষ ভাবে বালকদিগকেই আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।

এতদ্‌ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকেরই জনতার দৃশ্য যে সেক্সপীয়রের 'জুলিয়স সিজার' হইতে গৃহীত, তাহা অতি সহজেই অনুভব করা যায়।

কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকগুলির উপর অনুরূপ পাশ্চাত্ত্য নাটকগুলির প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য বস্তুতান্ত্রিক নাট্যকারদিগেরও কেহ কেহ বাস্তবধর্মী নাটক রচনা করা সত্ত্বেও সাঙ্কেতিক ও রূপক নাটক রচনা করিয়াছেন। সঙ্কেত এবং রূপক নাট্যকলার বিশিষ্ট অঙ্গ রূপেই তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এ'দেশে সংস্কৃত ভাষায় কিংবা বাংলায় রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও রূপকনাটক প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, এদেশের নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন যোগ ছিল না বলিয়া রূপক নাটক রচনার প্রেরণাও রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য নাটক হইতেই পাইয়াছিলেন বলিয়া সাধারণতঃ মনে হইতে পারে।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, সাঙ্কেতিক এবং রূপক নাটক রচনার বিশেষ পদ্ধতির দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ নাটকের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনেকটা ঐক্য আছে। কিন্তু তাঁহার এই প্রকৃতির নাটকে যে ভাব অর্থাৎ জীবন-দর্শন ও সৌন্দর্যবোধ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার জন্য তিনি কোন পাশ্চাত্ত্য সাঙ্কেতিক এবং রূপক নাট্যকারের নিকটই ঋণী নহেন। রবীন্দ্রনাথের রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটকের বক্তব্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং রবীন্দ্রমানসেরই বিশিষ্ট অনুভূতি।

১০

রবীন্দ্রনাট্য ও লোক-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সূচনা হইতেই বাংলার লোক-সাহিত্যের যে প্রেরণা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার নাট্যসাহিত্যেও তাহার নিদর্শন প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি তাঁহার শেষ জীবনের অধিকাংশ রোমান্টিক নাটকের কাহিনীকেই বাংলার রূপকথার পরিবেশের মধ্যে আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন। ইহার সর্বপ্রধান নিদর্শন 'তাসের দেশ।' তাঁহার প্রথম জীবনে রচিত 'একটি আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বন করিয়া 'তাসের দেশ' রচিত হইলেও প্রথম জীবনেই ইহার মধ্যে যে রূপকথার পরিবেশটি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, পরবর্তী জীবনে ইহাকে নাট্যরূপে পরিবর্তিত করিতে গিয়া তাহা উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছেন। রূপকথার একটি গতানুগতিক কাহিনীর মধ্যে তাঁহার নিজস্ব মনোভাব অনুযায়ী রোমান্টিক চেতনা সঞ্চারিত করিয়া দিয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

কাব্যেই হউক কিংবা নাটকেই হউক বাংলার রূপকথাগুলির ব্যবহার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহাদের মধ্যে আধুনিক চিন্তা সঞ্চারিত করিয়া দিয়া ইহাদিগকে তিনি আধুনিক যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহেও যখন আধুনিক সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যেও এই প্রয়াস বহুল পরিমাণে দেখা দিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্ত্য দেশে এই ভাবেই আধুনিক সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোন সাহিত্যিক জাতির লোক-সাহিত্যের সঙ্গে এই যোগ রক্ষা করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্র-প্রতিভা বাঙ্গালীর জাতীয় রস-সংস্কারেই গঠিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার মধ্যেই এই বিষয়ের পূর্ণতম বিকাশ দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটকটি আনুপূর্বিক রূপকথা ভিত্তিক রচনা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য রূপকথারও কিছু কিছু প্রভাব অনুভব করিতে পারা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্ত্য রূপকথার সঙ্গে এই দেশীয় রূপকথার সংমিশ্রণ করিয়া নূতন চেতনার সৃষ্টি করিয়াছেন। 'তাসের দেশ'-র মধ্যেও পাশ্চাত্ত্য রূপকথার ভাবগত একটু সংমিশ্রণ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, তথাপি এ কথা সত্য, বাংলার রূপকথাই ইহার পটভূমিকা সৃষ্টি করিয়াছে।

'তাসের দেশ'-র কাহিনীর মধ্যে বাংলার লোক-সাহিত্যের রস সর্বমুখী করিয়া প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই ইহার মধ্যে যে সঙ্গীতগুলি যোজনা করা হইয়াছে, তাহাদেরও স্বরে প্রধানতঃ বাংলার লোক-সঙ্গীতেরই স্বর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার উদ্বোধনী সঙ্গীতটি বাংলার সুপরিচিত লোক-সঙ্গীত সারিগানের স্বরে রচিত। আধুনিক বাংলার সঙ্গীত রচয়িতাদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই লোক-সঙ্গীতের স্বর ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। 'তাসের দেশ' নাটকের এই উদ্বোধনী সঙ্গীতটি তাহার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন—

খর বায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি ক'ষে ধর হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল
হাঁই মারো মারো টান হাঁইয়ো ॥
শৃঙ্খলে বার বার, ঝঞ্চন ঝঙ্কার,
নয় এতো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার—
বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর,
টলমল করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো মারো টান হাঁইয়ো।

সারিগান বাংলার মাঝিমাল্লার গান, নৌকা বাইচের গান। মাঝিমাল্লার জীবন ও নৌকা বাইচের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল; সেইজন্য তাহাদের ব্যবহৃত নিজস্ব স্বরে তিনি এই সার্থক সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছেন। সারিগান তালপ্রধান গান, বৈঠা ফেলিবার তালে তালে তাল রক্ষা করা হয়, ইহার সঙ্গীতের ভাষায় সেই তালের স্বরটি যেন ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। অথচ মাঝিমাল্লার গ্রাম্য ভাষা ও গ্রাম্য ভাব হইতে রবীন্দ্রনাথ ইহাকে মুক্ত করিয়া লইয়া ইহাকে আধুনিক রুচির সম্পূর্ণ অনুগামী করিয়া লইয়াছেন।

তারপর এই নাটকের চরিত্র রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র বাংলার রূপকথার পথ অনুসরণ করিয়াই কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। রূপকথার রাজপুত্র যেমন নির্বিশেষ চরিত্র, তাহার সুনির্দিষ্ট কোন বিশেষত্ব, অর্থাৎ ব্যক্তি-চরিত্র নাই, 'তাসের দেশে'র রাজপুত্র এবং সদাগরপুত্রও তাহারই সম্পূর্ণ অনুরূপ—ইহারা নাটকের ভিতরে স্থান লাভ করিলেও নাটকীয় চরিত্ররূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, রূপকথার চরিত্ররূপেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ

রূপকথার রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রকে এখানে নূতন ব্যাখ্যা দিয়া কাহিনীর মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র।

রূপকথার কাহিনীর মধ্যে আধুনিক রোমান্টিক চেতনা সঞ্চারিত করিবার যে কি দায়িত্ব, রবীন্দ্রনাথ সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। অর্থাৎ ভাবের দিক দিয়া ইহাকে আধুনিক করিয়া লইলেও ইহার রূপকথার স্বপ্ন-পরিবেশটি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার জন্য যে কল্পনা ও সৃজনী শক্তির আবশ্যক, রবীন্দ্রনাথের তাহা ছিল। কাব্যের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনুরূপ সার্থকতা দেখা গিয়াছে। সেইজন্য 'তাসের দেশে'র কাহিনী উপস্থাপনা, চরিত্র পরিকল্পনা এবং সংলাপের মধ্যে রূপকথার রস সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের রূপক এবং সাঙ্কেতিকধর্মী প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই একটি বাউলের চরিত্র আছে। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ বাসকালে কি ভাবে বাউল সাধনার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া তাহা দ্বারা পরবর্তী জীবনে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে ও সাহিত্য তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তার পর হইতেই তাঁহার নাটকে একটি বাউলের চরিত্র অপরিহার্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। কখনও বাউল নামেই, কখনও বা অন্য কোন নামেও তাহার আবির্ভাব দেখা যায়। বাউল-সাধনা বাংলার একটি বিশিষ্ট লৌকিক ধর্মসাধনা। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম ধ্যান ধারণার সঙ্গে তাহার সুনিবিড় যোগ ছিল এবং নাটকের নৈর্ব্যক্তিকতার গুণকে ক্ষুণ্ণ করিয়াও রবীন্দ্রনাথ এই বাউল চরিত্রের মধ্য দিয়া নিজে বার বার আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বাউলের সাধনা প্রধানতঃ সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়া থাকে। এই সঙ্গীতেরও নিজস্ব একটি সুর আছে। বাংলার বাউলের নিজস্ব ভাষা, ছন্দ ও সুরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকে বাউলের গান রচনা করিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া বাংলার এই লৌকিক ধর্মসাধনার নিজস্ব রূপটিকে তাঁহার মনের মত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন নাটকের মধ্য দিয়া বাউল চরিত্রে অভিন্ন কথাই শুনিতে পাওয়া যায়, সে কথা অনেক সময় বাউলের কথা হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা বলিয়াও ভুল হয়। 'শারোদোৎসব' নাটকে এই বাউল সন্ন্যাসীর রূপে, 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ইহা বৈরাগীর চরিত্ররূপে, 'রাজা' নাটকে ঠাকুরদার চরিত্ররূপে, 'অচলায়তন' নাটকে দাদাঠাকুর চরিত্রের রূপে, 'ডাকঘর' নাটকে ঠাকুরদার রূপে, 'ফাল্গুনী' নাটকে অন্ধ বাউল রূপে আবির্ভূত হইয়াছে।

তারপর হইতে সকল নাটকেই বাউল নামেই তাহার আবির্ভাব দেখা যায়। অনেক নাটকে বাউলের ভাবটিই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি চরিত্রের মধ্য দিয়াও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—সেই সকল ক্ষেত্রে তিনি একটির তিনি নাম দিয়াছেন ঠাকুরদা, আর একটির নাম বাউল।

বাউল গানের সুরটি যেমন রবীন্দ্রনাথ বাউল চরিত্রের মুখে রক্ষা করিয়াছেন, তেমনই তিনি তাঁহার নিজস্ব অধ্যাত্মভাবটিও তাহার ভিতর দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার নিজস্ব অধ্যাত্ম ও রস চেতনা দ্বারা তাহা মার্জিত করিয়া লইলেও তাহার মৌলিক ধর্ম কোথাও বিনষ্ট হয় নাই।

বাংলার লৌকিক ধর্মজীবনের বহু চিত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার 'রথের রশি' ইহার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। বাঙ্গালীর লৌকিক ধর্মের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি না থাকিলেও, সে বিষয়ে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তাঁহার 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র অন্তর্গত 'স্বর্গীয় প্রহসন' তাহার প্রমাণ। ইহাতে তিনি ঘেঁটু, মনসা, শীতলা, ওলাবিবি, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বাংলার লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যঙ্গের ভাব প্রকাশ পাইলেও তাহা যথাযথ।

তারপর বিচ্ছিন্ন ভাবে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকের মধ্যে বাংলার লোক-সাহিত্যের কত যে খণ্ডিত চিত্র ও চিত্রকল্প ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই। ইহাদের মধ্যে ছড়ার ছন্দে অসংখ্য লঘু সুরের সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, যেখানেই প্রয়োজন বোধ হইয়াছে সেখানেই নানা ছড়ার ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রচলিত নীতি অনুসরণ করিয়া 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের মধ্যে স্বয়ং তিনি এই আগমনী গানটি রচনা করিয়াছেন,

সারা বরষ দেখি নে মা,
  মা তুই আমার কেমন ধারা ?
নয়ন তারা হারিয়ে আমার
  অন্ধ হ'ল নয়ন তারা।
এলি কি পাষাণী ও রে ?
দেখ্‌ব তোরে আঁখি ভ'রে ;
কিছুতেই থামে না যে মা,
  পোড়া এ নয়নের ধারা।

'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ রামপ্রসাদী সুরে মালসী গানও

রচনা করিয়াছেন। সারি গানের সুরের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 'ডাকঘর'-এর অমল ও সুধার সংলাপের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলার সুপরিচিত রূপকথার সাতভাই চম্পার কাহিনীটিকে এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,

অমল। জানি, আমি খুব জানি। আমি সাত ভাই চম্পার খবর জানি। আমার মনে হয়, আমাকে যদি সবাই ছেড়ে দেয় তা হলে আমি চলে যেতে পারি খুব ঘন বনের মধ্যে যেখানে রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরু ডালের সব আগায় যেখানে মনুয়া পাখী বসে বসে দোল খায় সেইখানে আমি চাঁপা হ'য়ে ফুটতে পারি। তুমি আমার পারুল দিদি হবে ?

'ডাকঘর' নাটকে অমল ঠাকুরদাকেও বলিতেছে,

······আর সন্ধ্যের সময় গোয়ালঘরে প্রদীপ দেখিয়ে এসে আমার কাছে ব'সে সাত ভাই চম্পার গল্প কর।

বাংলার পৌষ পার্বণের ছড়া ও প্রচলিত গানগুলি রবীন্দ্র-নাটকে যেন নূতন প্রাণ ও রূপ লাভ করিয়াছে, যেমন,

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।

ইহা প্রচলিত কৃষিসঙ্গীত না হইলেও পাকা ফসল ক্ষেতের রূপটি যেন ইহার চরণে চরণে জড়িত হইয়া আসিয়াছে, এইভাবে প্রচলিত কৃষিসঙ্গীতকে ভিত্তি করিয়াই তিনি জাতির নূতন কৃষিসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

রূপকথার চিন্তা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কল্পনা ও সৃষ্টিকে যে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহার গদ্য নাটকগুলির মধ্য হইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার 'গোড়ায় গলদ' নাটকের বিনোদবিহারীর সংলাপে শুনিতে পাওয়া যায়—

'থাকৃত যদি আরব্য উপন্যাসের একটি পোষা দৈত্য, স্ত্রী ঘরে পদার্পণ করলেন, অমনি একটি কিঙ্করী সোনার থালে হ্যামিল্টনের দোকানের সমস্ত ভালো ভালো গয়না এনে তাঁর পায়ের কাছে রেখে গেল······'

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার পরবর্তী যুগের নাটকগুলির গঠনভঙ্গি বহুলাংশেই বাংলার লোক-নাট্যের অনুরূপ। নিজেও তিনি ইহাদিগকে অনেক ক্ষেত্রেই পালা বা পালাগান বলিয়াছেন। পালাগান কিংবা পালা কথাটি বাংলার লোক-নাট্যের একটি বিশিষ্ট পরিচয়। শুধু নামের মধ্যেই নহে, ইহাদের গঠনের মধ্যেও বাংলার লোক-নাট্যের বিশিষ্ট এই রূপটির ধর্ম রক্ষা পাইয়াছে।

১১

রবীন্দ্রনাটক ও যাত্রা

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশই নাটকই যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া অভিনীত হইয়া সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই, তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন। অনেকে ইহার অনেক প্রকার কারণ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রধান কারণ মনে হয় এই, বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ যেমন এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজের মঞ্চব্যবস্থার অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ কোন দিনই তাহা অনুমোদন করেন নাই। সুতরাং সেই অনুযায়ী তিনি কোন নাটক রচনা করিবার প্রয়াস পান নাই। দুই একখানি মাত্র তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় সত্য। শৈশব হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে এদেশের যাত্রা-গানের অনুকুলে একটি সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পরিণত জীবনেও তাহার প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার 'ছেলেবেলা' নামক ছোট বইখানিতে তিনি পরিণত জীবনেও শৈশবের যে স্মৃতিচারণা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সেই বয়সে নিজের বাড়ীতে যাত্রার অভিনয় দেখিয়া যে কি অপার আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, তাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পরিণত বয়সেও শৈশব-অভিজ্ঞতার এই বিষয়ক স্মৃতিকথা তিনি যেমন খুঁটিনাটি করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, অপ্রত্যক্ষভাবে হইলেও তাহা দ্বারা তিনি পরবর্তী কালে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের শৈশব সংস্কার তাঁহার পরবর্তী জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নানা দিক দিয়া প্রভাব বিস্তার [illegible]য়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের যখন শৈশব ও কৈশোর, তখন কলিকাতায় 'নূতন যাত্রা'র যুগ। প্রাচীন বাংলার পল্লীজীবনে যাত্রার যে বিশেষ এক রূপ ছিল, তাহা প্রধানতঃ কৃষ্ণযাত্রা। কিন্তু কলিকাতা মহানগরী প্রতিষ্ঠার পর হইতেই এই প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রার ধারা পরিবর্তিত হইয়া সমসাময়িক কলিকাতার সমাজ-জীবনের নানা রসোপকরণের সংমিশ্রণে যাত্রার যে নূতন রূপ লাভ ঘটিয়াছিল, তাহাই 'নূতন যাত্রা' রূপে পরিচিত। ধনিগৃহেও ইহার সমাদর ছিল। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের নিজের পরিবারের মধ্যেও এই শ্রেণীর নূতন যাত্রার পৃষ্ঠপোষকের অভাব ছিল না। তিনি তাঁহার 'ছেলেবেলা'য় উল্লেখ করিয়াছেন, 'আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনী ঘরে ছিল সখের যাত্রার চলন। মিহি-গলা-

ওয়ালা ছেলেদের বাছাই ক'রে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা ছিলেন এই রকম একটি সখের দলের দলপতি। পালা রচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর, ছেলে তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল (পৃঃ ২৭, ১৩৬৬)।'

এই প্রকার সৌখীন যাত্রাদলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী যাত্রার দলও ছিল, তাহা জনসাধারণের ক্ষেত্রে লোক-প্রিয় ছিল। তাহাদের সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'ধনীদের ঘরপোষা এই যেমন শখের যাত্রা, তেমনি ব্যবসাদারী যাত্রা নিয়েও বাংলা দেশের ছিল ভারি নেশা। এ পড়ায় ও পড়ায়, এক একজন নামজাদা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠ্‌ত (ঐ)।' এ' কথা সকলেই জানেন, কলিকাতার চিৎপুর অঞ্চল 'নূতন যাত্রা'র উৎপত্তি ও বিস্তারের কেন্দ্রস্থল, আজ পর্যন্ত ইহার এই ঐতিহ্যের ধারা অক্ষুন্ন আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কৈশোরের শিক্ষার ভিতর দিয়া নানা ভাবে ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের বাড়ীতেও মধ্যে মধ্যে যাত্রাগানের আসর বসিত। তিনি লিখিয়াছেন, 'আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে।' জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের একটি প্রধান গুণ ছিল যে, ইহার শিক্ষা ও আচার-আচরণের মধ্য দিয়া নূতন বাংলার যে সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাই বিকাশ লাভ করিবার প্রথম সূচনা দেখা দিক না কেন, প্রাচীন জীবন ধারার সঙ্গেও তাহার সকল প্রকার যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। একদিক দিয়া ইহাতে যেমন নূতন পাশ্চাত্ত্য ধরণের নাট্যশালা গঠন করিয়া বাংলা নাটক অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল, আর একদিকে এই পরিবারেরই একজন সখের যাত্রার দল গঠন করিয়াছিলেন। ইহার পারিবারিক উৎসবাদিতে দেশীয় আমোদ আহ্লাদের প্রতি উৎসাহ প্রকাশ করা হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের সাধনার মধ্যে জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ যে এত প্রবল, ইহার কারণ ইহাই। তাঁহার পারিবারিক জীবনের সাংস্কৃতিক ভিত্তি দেশের মাটিতেই স্থাপন করা হইয়াছিল। সেইজন্য জাতীয় জীবনের রসোপকরণ যত তুচ্ছ এবং যত নগণ্যই হউক, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাহা কদাচ উপেক্ষিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শৈশব-স্মৃতি হইতে তাঁহাদের নিজগৃহে অনুষ্ঠিত একটি 'নূতন যাত্রা'র সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন। যাত্রার পালাটির নাম ছিল 'নল-দময়ন্তীর পালা।' ইহার রচনা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন,…'পালা গানটা লেখানো হয়েছে, এমন-সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া-কলমে, যারা ইংরেজি কপি-বুকের মকশো করে নি। এর সুর, এর নাচ, এর

সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা করা; এর ভাষা পণ্ডিত মশায় দেন নি পালিশ করে।'

১৩০৯ সালে রবীন্দ্রনাথের 'রঙ্গমঞ্চ' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যখন ইংরেজি এলিজাবেথীয় যুগের রঙ্গমঞ্চের অনুকরণ-মত্ততা আমাদের দেশের নব্য ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন তাঁহার মুখে বিশেষ করিয়া তাহারই আচরণের প্রতিবাদ রূপে যেন প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমই তিনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গমঞ্চের যে বর্ণনা আছে, তাহার সমর্থন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে, তাহাতে দৃশ্যপটের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি না।'

তারপর রঙ্গমঞ্চের উপর দৃশ্যের এক একটি বাস্তব রূপ উপস্থাপনা করিবার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, 'আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐ জন্য ভাল লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পর বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মত চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।'

এলিজাবেথীয় রঙ্গমঞ্চে দর্শক এবং অভিনেতার মধ্যে যে একটি কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া থাকে, রবীন্দ্রনাথ চিরদিন তাহার বিরোধী ছিলেন। যাত্রার মধ্যে এই ব্যবধান নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটক রচনা করিবার সময়ও এই দিকেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছিলেন। সেই জন্য এলিজাবেথীয় রঙ্গমঞ্চের আঙ্গিক অনুসরণ করিয়া তিনি তাঁহার অধিকাংশ নাটকই রচনা করেন নাই। সুতরাং এলিজাবেথীয় যুগের নাটক কিংবা ইংরেজি রঙ্গমঞ্চ ইহাদের কাহারও প্রভাব তাঁহার মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিতে পারে নাই।

ভরত মুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চের যে বর্ণনা দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাও যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি ভরত মুনি নির্দেশিত কেবলমাত্র অনাড়ম্বর মঞ্চব্যবস্থাটি গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গমঞ্চের উপর যে বহুবিধ আচরণ বা নাট্যক্রিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই। কার্যক্ষেত্রেও দেখা যায়, তাঁহার নাটক রচনায় ইহাদের অনেক কিছুই তিনি গ্রহণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের

নাটক অতিনাট্যিক ঘটনা দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারাক্রান্ত। অধিকাংশ অতিনাট্যিক ঘটনাই রঙ্গমঞ্চের উপর নাট্যশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ভরত মুনিকে অনুসরণ করেন নাই। নূতন যাত্রা সাধারণতঃ অতিনাট্যিক ঘটনা দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে, যাত্রা হইতে প্রত্যক্ষ ভাবেই আসুক, কিংবা অন্য যে কোন ভাবেই হউক, রবীন্দ্রনাথের নাটকেও যাত্রার এই বৈশিষ্ট্যটুকু দেখিতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সঙ্গীতের বাহুল্য। এই গুণটি ইংরেজি নাটক হইতে যেমন আসে নাই, তেমনই সংস্কৃত নাটক হইতেও আসে নাই। যদি অভিনয় শ্রেণীর কোন বিষয় হইতে ইহা আসিয়া থাকে, তবে তাহা যাত্রা হইতেই যে আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে এ' কথা সত্য, গানের ব্যাপক প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যাত্রা হইতেও আসে নাই, ইহা রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক গীতিকবির প্রতিভা হইতেই আসিয়াছে। তবে যাত্রার এই বিশিষ্ট ধর্মটি রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যেও যে লক্ষ্য করা যায়, তাহা উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে বাংলা নাটক রচনায় যিনি যশস্বী হইয়াছিলেন, তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের মধ্যে যে নৃত্য-গীতের বাহুল্য দেখা যায়, তাহা যে 'নূতন যাত্রা'র প্রভাব-জাত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আরও একজন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে যেমন তাঁহার স্বকীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হইতে সঙ্গীতের যোজনা হইয়াছিল; রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও তাহাই হইয়াছিল। অথচ দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন তাঁহার স্বাভাবিক গীতিকবির প্রতিভা সত্ত্বেও তাঁহার রচিত নাটকগুলির নাট্যগুণ অনেক ক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মধ্যেই যে নাটকে গীত ব্যবহারের ব্যাপকতা দেখা যায়, তাহা যাত্রার প্রভাব-জাত নহে, এই বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে ইঁহাদের উভয়েরই পার্থক্য আছে।

যাত্রার মধ্যে একদিন যে নৃত্য নিতান্ত স্থূল গ্রাম্যতার পরিচায়ক ছিল, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির মধ্য দিয়া তাহাই রবীন্দ্র-সাধনার শেষ পর্বে আসিয়া সুমার্জিত এবং সুরুচিসম্পন্ন হইয়া নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। নৃত্য-নাট্যের মধ্যে নৃত্যই প্রাধান্য লাভ করে এ কথা সত্য, যাত্রায় তাহা প্রাধান্য লাভ না করিলেও একটি বিশেষ অংশ অধিকার করে। দুই ক্ষেত্রেই অভিনয়ের মধ্যে

যে নৃত্যেরও একটি বিশেষ স্থান আছে, তাহা স্বীকার করা হয়। শেষ জীবনে রচিত নৃত্যনাট্যগুলির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ যে নৃত্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহা যাত্রার পথ ধরিয়া আসে নাই সত্য, কিন্তু অভিনয়-ক্রিয়ার মধ্যে নৃত্যের যে একটি স্থান আছে, তাহা যাত্রাগানে যে ভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেই ভাবেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তাহা না হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতাভিনয়ের যুগ দীর্ঘকাল অতিক্রম করিয়া আসিয়াও আমরা বিংশ শতাব্দীতে নৃত্যনাট্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিতাম না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অধিকাংশ গীতি-নাটককে পালা গান বলিয়া নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে নাটকের পরিবর্তে যাত্রার সংস্কার তাঁহার মধ্যে যে কত প্রবল ছিল, তাহা অনুভব করা যায়। যাত্রায় কোন প্রকার মঞ্চনির্দেশ (stage direction) থাকে না। জর্জীয় যুগের ইংরেজি নাটকের জটিল মঞ্চ-নির্দেশের অনুকরণ করিয়া যখন আমাদের দেশের নাট্যকারগণও তাঁহাদের নাটকে জটিল মঞ্চনির্দেশ দিতে লাগিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখনও নির্বিকার ভাবে প্রাচীন ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। জর্জ বার্ণাড শ'র মঞ্চনির্দেশ তাঁহার রচিত নাটক অপেক্ষাও জটিল, আমাদের দেশের কয়েকজন সমসাময়িক নাট্যকার তাঁহার অন্ধ অনুকরণ করিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকের প্রবর্তন করিতে লাগিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ধারা পরিত্যাগ করিলেন না।

অবশ্য এ'কথা সত্য, ক্রমে যাত্রার মধ্যে নাটকের প্রভাব যখন ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে লাগিল, তখন ইহাতেও নাটকের অনুযায়ী অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ দেখা দিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে অঙ্ক বা দৃশ্যেরও কোন বিভাগ নাই, এমন কি, এই বিষয়ে তিনি প্রাচীন যাত্রার ধারাই অনুসরণ করিয়া চলিলেন। ইহার মধ্যেই তাঁহার নিজস্ব নাট্য-রচনার আঙ্গিক স্থিতিলাভ করিল।

বাংলা দেশে যাত্রার যে দুইটি রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল—একটি প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রা বা কৃষ্ণযাত্রা, অন্যটি নূতন যাত্রা, ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রাচীন ধারার যাত্রার আদর্শটি অধিকতর প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত হয়। অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন যাত্রার ধারা অনুকরণ করিয়াছেন। বাঙ্গালী জাতির একান্ত গীতিপ্রবণতা হইতে যেমন প্রাচীন যাত্রার জন্ম হইয়াছিল, রবীন্দ্র-মানসের একান্ত গীতিভূমি হইতেই তেমনই রবীন্দ্রনাট্যগুলি বিকাশ লাভ করিয়াছিল। ইহাদের ঐক্যের মূল এইখানেই নিহিত আছে, অনুকরণের মধ্যে নহে।

তবে এখানে একটি কথা হইতে পারে যে, বাংলার যাত্রাগান যেমন জনপ্রিয়, রবীন্দ্র-নাটক সাধারণের মধ্যে তেমন জনপ্রিয় হয় নাই কেন? ইহার প্রধান কারণ, উভয়ের বিষয়-বস্তুর পার্থক্য। ঐক্য কেবলমাত্র বহিরঙ্গে, উভয়ের মধ্যে অন্তরের দিক দিয়া কিংবা বিষয়-বস্তুতে কোন ঐক্য নাই। যাত্রা জনপ্রিয় ঐতিহ্য-মূলক বিষয়-বস্তু লইয়া রচিত; রবীন্দ্রনাট্য রবীন্দ্রসাধনার একান্ত আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতির সৃষ্টি, বিষয় এবং বক্তব্যের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একক। যাত্রাগানের বিষয়-বস্তু প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও নীতির বিজয়-ঘোষণা; রবীন্দ্র-নাটকের বিষয়-বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কার-ধর্মের সঙ্গে হৃদয়-ধর্মের সংঘাত। এই পার্থক্য এতই ব্যাপক যে, তাহা অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্র-নাটক সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তার বিষয়ে কোন ভাবেই অগ্রসর হইতে পারে নাই।

১২

রবীন্দ্রনাট্য ও বৌদ্ধসাহিত্য

বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাঁহার সাহিত্যের সর্বত্র তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এ' কথা সত্য, বৌদ্ধ ধর্মের যে মূল লক্ষ্য, অর্থাৎ নির্বাণ, তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোন সহানুভূতি ছিল না। বৌদ্ধধর্মে অহিংসা, মৈত্রী এবং করুণাগুণের উপর যে বিশেষ গৌরব আরোপ করা হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধধর্মের মূল কথা নহে, মূল লক্ষ্যে পৌছিবার অর্থাৎ মহানির্বাণ লাভ করিবার কতকগুলি উপায় মাত্র। যে মানব-প্রেম বা মানবিকতাবোধ দ্বারা রবীন্দ্রনাথ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী, জীবে অহিংসা এবং করুণাগুণের মধ্যে তিনি তাহার সুগভীর সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য বৌদ্ধধর্ম এবং সাহিত্যের যাহাতেই তিনি অহিংসা, করুণা ও মানব-প্রেমের নিদর্শন পাইয়াছিলেন, তাহাই তিনি সুগভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া নিজের রচনার মধ্য দিয়া সুপরিস্ফুট করিয়া লইয়াছেন। অন্যান্য রচনার তুলনায় নাটককেই তিনি এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন, কবিতায় এবং প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্মের প্রেম ও অহিংস নীতির কথা যত বলিয়াছেন, নাটকের মধ্য দিয়া তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলিয়াছেন; নাট্যকাহিনীর মধ্য দিয়া বৌদ্ধধর্মের এই ভাবগুলিকে অধিকতর সার্থকতার সঙ্গে রূপায়িত করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা', 'মালিনী', 'রাজা' অরূপ রতন', 'শাপমোচন' ইত্যাদি নাটক বৌদ্ধসাহিত্য ও বৌদ্ধ সমাজ-জীবনের পরিবেশে রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ আখ্যান হইতে গৃহীত পূর্বরচিত অনেক কাব্য-কাহিনীর ভাব তিনি প্রত্যক্ষ জীবনের সহায়তায় রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে পরবর্তী কালে নাটকে রূপায়িত করিয়াছেন।

'নটীর পূজা' এমনই বৌদ্ধকাহিনীমূলক একটি রচনা। ইহার নায়িকা শ্রীমতী। শ্রীমতীর কাহিনী বৌদ্ধ সাহিত্য 'কল্পদ্রুমাবদান' এবং 'অবদান-শতক' হইতে গৃহীত। অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ কাহিনীকে নিজের দিক হইতে কিছু কিছু রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই মূলের আদর্শকে বিসর্জন দেন নাই। অনেক সময় নিতান্ত সাধারণ কাহিনীকে নিজস্ব কল্পনার অপরূপ স্পর্শ দান করিয়া তাহাতে নূতন জীবন সঞ্চারিত করিয়া লইয়াছেন।

বৌদ্ধ 'অবদান শতকে' শ্রীমতীর কাহিনীটির যে কোন বিশেষত্ব আছে, তাহা নহে। তাহাতে এইমাত্র দেখা যায়, রাজবাড়ীর দাসী (নটী নহেন) শ্রীমতী রাজার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া বৌদ্ধস্তুপের পাদমূলে একদিন প্রদীপোহার দিয়াছিল। তাহাতে রাজদণ্ডে তাহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল। এই অকিঞ্চিৎকর কাহিনীটিকে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ 'কাহিনী'র 'পূজারিণী'তে কাব্যরূপ দিয়াছিলেন এবং পরে 'নটীর পূজা'য় নাট্যরূপ দিতে গিয়া ইহার সৌষ্ঠব শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

মাহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের আন্দোলন যখন ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রসার লাভ করিল, তখন রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে একটি কাহিনীর সন্ধান করিয়া তাহা অবলম্বন কবিয়া এই বিষয়ক একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করিলেন, তাহা 'চণ্ডালিকা।' 'দিব্যাবদানে'র অন্তর্গত 'শার্দূলকর্ণাবদানে'র ভূমিকায় কাহিনীটির উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ ইহা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*-গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারই মূল কাহিনীটিকে রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি মার্জিত ও পরিবর্তিত করিয়া গ্রহণ করায় আধুনিক পাঠকের নিকট ইহার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পৃথিবীর প্রথম গণতান্ত্রিক ধর্ম বৌদ্ধধর্ম, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে ইহার যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ একদিন ধ্বনিত হইয়াছিল, বৌদ্ধ কাহিনীতে তাহারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পরও ভারতবর্ষ হইতে সেই সামাজিক সমস্যা দূর হইতে পারে নাই, প্রাচীন ভারতের সমাজ-সমস্যামূলক এই কাহিনীটি আধুনিক ভারতবর্ষের সেই একই সমস্যার সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ সে'দিন তেমনিই বলিষ্ঠ ভাবেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের মানব-প্রীতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী ও সাম্য-বোধের সহজ সংমিশ্রণ হইয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, মূল কাহিনী ইহাতে রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন। মূল কাহিনীতে দেখা যায়, চণ্ডালিকা শেষ পর্যন্ত ভিক্ষুণী বেশ ধারণ করিয়া বুদ্ধের নির্দেশে বুদ্ধশিষ্য আনন্দকে বিবাহ করিয়াছিল। বুদ্ধ তাহাকে বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের শুদ্ধ আচার পালন করিবার ফলে চণ্ডালিকার মন হইতে সকল কলুষ দূর হইয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কারণ, ধর্মের দিক হইতে এই অংশের প্রয়োজন থাকিলেও কাব্যের দিক দিয়া ইহার কিছু প্রয়োজন নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের বিষয়-বস্তুও বৌদ্ধসাহিত্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা বৌদ্ধ 'মহাবস্তু'র অন্তর্গত 'মালিন্যাবস্তু'র অন্তর্গত। কিন্তু 'মালিনী' নাটকে ইহার কাহিনী বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। মূল কাহিনীতে সুপ্রিয় এবং ক্ষেমঙ্করের প্রসঙ্গ একেবারেই অনুপস্থিত; কেবলমাত্র তাহাতে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আছে। ব্রাহ্মণদিগের অনাচারে রাজকন্যা মালিনী তাহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী গুরু কশ্যপের শরণাপন্ন হন। ব্রাহ্মণদের চক্রান্তে মালিনীর প্রতি রাজার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। বৌদ্ধ কশ্যপের মন্ত্রদীক্ষার ফলে মালিনী ব্রাহ্মণদিগের চক্রান্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন, অতঃপর পরিবারস্থ সকলে এবং রাজ্যের প্রজাবর্গ সহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া জীবনে কল্যাণের পথ খুঁজিয়া পান।

ইহার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যে বিরোধের কথা আছে, তাহাই রবীন্দ্রনাথ দুই ধর্মের দুইটি প্রতিনিধি কল্পনা করিয়া তাহাদেব দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম হৃদয়-ধর্মেরই প্রতিনিধি এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম আচার-ধর্মের প্রতিনিধি। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ মূল কাহিনীটির মধ্য হইতে যে দুইটি নায়ক ও প্রতিনায়কের চরিত্র পরিকল্পনা করিয়া তাহাদের আদর্শের বিরোধের মধ্য দিয়া নাটকীয় দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কাহিনীটির নাটকীয় গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী'র মধ্যে আর একটি মানবিক অনুভূতি আনিয়া যোগ করিয়াছেন, তাহা প্রেম। যদিও তাহার ভাব স্পষ্ট নহে এবং কাহিনীর মধ্যে তাহা স্পষ্ট করিবার তাঁহার কিছুমাত্র অবকাশও ছিল, না তথাপি ইহা দ্বারা কাহিনীর গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই অনুভূত হইবে।

বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থের 'কুশজাতক' এবং 'মহাবস্তু অবদানে'র কুশজাতকের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ তিনখানি নাটক রচনা করিয়াছেন— 'রাজা', 'অরূপ রতন' ও 'শাপমোচন'। অন্যান্য ক্ষেত্রে বৌদ্ধ কাহিনী যেমন মুখ্যভাবে অবলম্বন করা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার ব্যতিক্রম করা হয় নাই, বরং ইহাদের মধ্যে অধিকতর মুখ্য ভাবে জাতকের কাহিনী অনুসরণ করা হইয়াছে। উক্ত তিনখানি নাটক রচনায় যে বৌদ্ধ জাতক এবং অবদানের কাহিনীই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল, তাহা কুশজাতকের কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

ইক্ষাকুর মহিষী শীলবতীর দুই পুত্র—কুশকুমার ও জয়ম্পতি। জ্যেষ্ঠ কুশকুমারই বোধিসত্ত্ব, তিনি পরম জ্ঞানী হইলেও দেখিতে অত্যন্ত কুৎসিত

ছিলেন। কনিষ্ঠ জয়ম্পতি পরম রূপবান্, কিন্তু অত্যন্ত নির্বোধ। কুশকুমার যখন যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন পিতা তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু তাহার পূর্বে তাঁহাকে মনোমত পত্নী নির্বাচন করিতে বলিলেন। কুশকুমার একটি অনিন্দ্যসুন্দর স্বুবর্ণ প্রতিমা নির্মাণ করিয়া মাতাকে দিয়া বলিলেন, ইহার অনুরূপ পাত্রী সন্ধান করিয়া আনিতে হইবে। অবশেষে মদ্ররাজের সুন্দরী কন্যা পাইয়া তাহার সঙ্গেই কুশকুমারের বিবাহ দিলেন। মদ্ররাজকন্যার নাম প্রভাবতী। কুশকুমার এইবার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন এবং পত্নী প্রভাবতী তাহার অগ্রমহিষীর স্থান অধিকার করিলেন। পুত্রের কুৎসিত রূপ দেখিয়া সুন্দরী পুত্রবধূ কুশকুমারকে পরিত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় রাজমাতা শীলবতী আদেশ দিলেন যে দিবালোকে প্রভাবতী স্বামীকে দেখিতে পাইবে না, কেবলমাত্র রাত্রির অন্ধকারে তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইবেন। এই ব্যবস্থাই চলিতে লাগিল। রাত্রির অন্ধকার দূর হইবার পূর্বেই রাজা কুশকুমার শয়নগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যান, প্রভাবতী কোন দিন তাঁহার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। রাজাও প্রভাবতীকে দর্শন করিতে পারেন না। কিন্তু একদিন রাজা তাহাকে দিনের আলোকে দেখিতে চাহিলেন, কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইতে চাহিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া রাজমাতা একদিন হস্তিশালায় ও অশ্বশালায় তাহাদের সাক্ষাতের আয়োজন করিলেন। প্রভাবতী স্বামীকে চিনিলেন না। কিছুকাল পর প্রভাবতীও রাজাকে দিনের আলোকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। রাজমাতা তাহাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন; কিন্তু প্রভাবতী কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া রাজমাতা ইহার একটি ব্যবস্থা করিলেন। তিনি বধূকে বলিলেন, 'আগামী কল্য আমার পুত্র নগর প্রদক্ষিণে বাহির হইবে; তোমার বাতায়ন খুলিয়া তাহাকে দেখিয়া চিনিও।' রাজমাতা পুত্রের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য এখানে একটু ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার সুদর্শন কনিষ্ঠপুত্র জয়ম্পতিকে রাজবেশ পরিধান করাইয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন এবং জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা কুশকুমারকে হস্তিপালকের বেশ ধারণ করাইয়া হস্তিপৃষ্ঠে তাহার পশ্চাতে স্থাপন করিলেন। রাণী প্রভাবতী শয়নগৃহের বাতায়ন খুলিয়া হস্তিপৃষ্ঠে জয়ম্পতিকে দেখিয়া রাজা বলিয়া স্থির করিলেন। রাজমাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীকে দেখিয়াছ?' রাণী প্রভাবতী বলিলেন, 'দেখিয়াছি।' বলিয়া জয়ম্পতিকে হস্তিপৃষ্ঠে যেমন দেখিয়াছিলেন, তেমন বর্ণনা দিলেন।

রাজা কুশকুমারের আর সহ্য হইল না, তিনি একদিন প্রভাবতীর সম্মুখে দিবালোকেই আত্মপ্রকাশ করিয়া পরিচয় দিলেন, 'আমিই কুশরাজ।' প্রভাবতী তাঁহার কুৎসিৎ আকার দেখিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন; মনে করিলেন, কোন যক্ষ তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই রাণী প্রভাবতী সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। কুৎসিত ও প্রবঞ্চক স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। তিনি পিতৃরাজ্যে চলিয়া গেলেন; কুশরাজ কিছুই বলিলেন না, কেবল মনে মনে স্থির করিলেন, নিজ শক্তি দিয়া তাহাকে জয় করিয়া পুনরায় গৃহে আনিবেন।

প্রভাবতীর বিরহে কাতর হইয়া কুশরাজ একদিন তাঁহার বীণাটি হাতে করিয়া স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রভাবতীর পিতৃরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভাবতীর পিতৃগৃহে আসিয়া হস্তিশালায় আশ্রয় লইলেন, সেখান হইতে বীণা বাজাইতে লাগিলেন। বীণার সুরে প্রভাবতী বুঝিতে পারিলেন, কুশরাজ তাঁহার সন্ধানে আসিয়াছেন; কিন্তু প্রভাবতী অবিচলিত রহিলেন। কুশরাজ নানা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাণী প্রভাবতীর হৃদয় কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারিলেন না। বরং রাজার প্রতি তাহার মন আরও বিরূপ হইয়া উঠিল। প্রভাবতীর এক দাসী ছিল, নাম কুব্জা; সে কুশরাজার গুণমুগ্ধ ছিল, সেও রাজার প্রতি রাণীর অনুরাগ সৃষ্টি করিবার নানা প্রয়াস করিল, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

প্রভাবতীকে লাভ করিবার জন্য এইবার সাত জন রাজা একসঙ্গে মদ্ররাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাজগণ প্রত্যেকেই মদ্ররাজের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, 'প্রভাবতীকে আমার নিকট সমর্পণ কর, নতুবা যুদ্ধ কর।' মদ্ররাজ ভীত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অবশেষে কন্যার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া স্থির করিলেন, তাহাকে সাতখণ্ড করিয়া কাটিয়া সাত রাজার মধ্যে বিতরণ করিবেন—নিজের স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার পাপের এই ভাবেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মদ্ররাজ-মহিষী কন্যার কথা ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'এখন যদি কুশরাজ এখানে উপস্থিত থাকিতেন, তবে তাঁহার কন্যাকে এই দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিতেন।' কুশরাজ সত্য সত্যই সূপকারের ছদ্মবেশে মদ্ররাজগৃহে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, মদ্ররাজ তাহা জানিতে পারিয়া কন্যাকে লইয়া গিয়া তাঁহার হাতে অর্পণ করেন। কুশরাজ

ছিলেন বোধিসত্ব, প্রভাবতী শেষ পর্যন্ত বোধিসত্বের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

কুশরাজ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, সাতজন আক্রমণকারী রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া পরাজিত করিলেন। অবশেষে মদ্ররাজের সাত কন্যাকে তাহাদের নিকট বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে স্বরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্রের প্রভাবে কুশরাজ রূপবান্ হইলেন; এখন রাজা ও রাণী উভয়েই তুল্য রূপের অধিকারী হইয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। (Fausbal, *Jataka* Vol. V, No. 531, pp. 278-312)

বৌদ্ধসাহিত্যের এই কাহিনীটিকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব সমসাময়িক অধ্যাত্ম প্রেরণা অনুযায়ী পরিবর্তিত করিয়া 'রাজা' ও 'অরূপ রতন' নাটকে গ্রহণ করিয়াছেন; তবে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত জাতকের কাহিনী অপেক্ষা 'মহাবস্তু অবদানে'র কাহিনী দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়; অবদানের কাহিনীতে রাণীর নাম প্রভাবতীর পরিবর্তে সুদর্শনা; এই নামটিই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'রাজা' ও 'অরূপ রতন' নাটকে গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য কয়েকটি বিষয়েও 'অবদানে'র কাহিনীর সঙ্গে 'রাজা' নাটকের ঐক্য অধিক বলিয়া অনুভূত হইবে। ইহার কাহিনীটিও এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা গেল—

রাজা কুশ রাজমাতা অলিন্দার আদেশে রাণী সুদর্শনার সঙ্গে কেবলমাত্র অন্ধকার গর্ভগৃহে সাক্ষাৎ করিতে পারেন, দিবালোকে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয় না। একদিন দিবালোকে স্বামীকে দেখিবার জন্য সুদর্শনা অধীর হইয়া উঠিলেন। রাজমাতা কিছুতেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাহাকে এই অনুমতি দিলেন, রাজা যেদিন উৎসবে যোগদান করিবেন, সেইদিন বাতায়ন হইতে তিনি তাঁহাকে দেখিতে পারেন। উৎসবের দিন রাজমাতার কৌশলে রাজভ্রাতা কুশক্রম রাজার ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন, রাজা স্বয়ং তাহার ছত্রধর হইলেন। রাণী সুদর্শনা ছদ্মবেশী রাজাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; কিন্তু ছত্রধরের কুৎসিত রূপ দেখিয়া তাহাকে বিতাড়িত করিবার আদেশ দিলেন। তারপর পদ্মসরোবরে এবং আম্রকাননে দুইদিন সেই কদাকার ছত্রধরকে দেখিয়া রাণী রাক্ষস মনে করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রাসাদের হস্তিশালায় একদিন আগুন লাগিল, রাজা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্য হইতে হস্তিযূথকে মুক্তি দিয়া রক্ষা করিলেন, জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে রাণী রাজার ভয়ঙ্কর কুৎসিত রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ভীত হইলেন। রাণী রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃরাজ্যে চলিয়া

আসিলেন। বীণা হস্তে রাজা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুদর্শনার অভিমান কিছুতেই দূর হইল না। এমন সময় সাতজন রাজা সুদর্শনার পিতৃরাজ্য আক্রমণ করিলেন, তাহারা প্রত্যেকেই সুদর্শনাকে অর্পণ করিবার দাবী জানাইলেন। পিতার ক্রোধ কন্যার প্রতি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, সে স্বামী পরিত্যাগ করিয়া তাহার আশ্রয়ে আসিয়াছে বলিয়াই ত তাঁহার আজ এই বিপদ! তিনি কন্যাকে সাত খণ্ড করিয়া কাটিয়া সাত রাজার মধ্যে বিতরণ করিবেন স্থির করিলেন। ভয় পাইয়া সুদর্শনা কুশরাজের আশ্রয় লইলেন, কুশরাজ তাঁহার পিতৃগৃহেই ছিলেন। তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন, যুদ্ধ করিয়া সাত রাজাকে পরাজিত করিলেন। ইন্দ্রের প্রভাবে কুশরাজ তাহার দৈহিক সৌন্দর্য ফিরিয়া পাইলেন।—(*Mahavastu Abadan*, Senart, Vol. III, pp. 1-27)

এই দুইটি বৌদ্ধ কাহিনীকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের আদর্শ ও প্রেরণা অনুযায়ী নানাভাবে ব্যবহার করিয়া তাঁহার 'রাজা' ও 'অরূপ রতন' নাটক রচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধকাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর সাদৃশ্যের কথা পরে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নাটকটি উক্ত দুইটি বৌদ্ধকাহিনী হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়া রচিত হইয়াছে। তবে 'শাপমোচনে'র রাজা 'রাজা' কিংবা 'অরূপ রতনে'র রাজার মত অলোকচারী নহেন, বরং মর্ত্যচারী; তিনি অপার্থিব নহেন, সাধারণ পার্থিব চরিত্র। সেইজন্য এই চরিত্রের মধ্যেই নাটকের যথার্থ গুণ অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়ন' এবং 'গুরু' নাটকের কাহিনীও বৌদ্ধসাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধ 'চূড়াপক্ষ অবদানে' এই কাহিনীটি পাওয়া যায়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে নাটকীয় চরিত্রের বৌদ্ধ নাম এবং পরিবেশটি রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার কাহিনী সে ভাবে গ্রহণ করেন নাই। 'চূড়াপক্ষ অবদানে' পন্থক ও মহাপন্থকের পাঠান্তর রূপে পঞ্চক এবং মহাপঞ্চক যে নাম পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাহাই ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অচলায়তন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে সকল দেবদেবীর নাম ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ হইতে আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই নামগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়,—যেমন একজটা, মহামারীচি, পর্ণশবরী, মহাময়ূরী, মহাভৈরব, মহাশীতবতী, উষ্ণিষবিজয়।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'র কাহিনীও বৌদ্ধসাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য 'শ্যামা' তাঁহার পূর্বরচিত একটি কবিতার নৃত্যনাট্যরূপ, কবিতাটি 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত 'পরিশোধ'; বৌদ্ধ 'মহাবস্তু অবদান' হইতে ইহার কাহিনী গ্রহণ করা হইয়াছে। মূল বৌদ্ধ কাহিনীটির নাম 'শ্যামাজাতক'। এই কাহিনীকেও রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী নূতন করিয়া গঠন করিয়া লইয়াছেন।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, নাটক রচনায় সংস্কৃত কিংবা ইংরেজি সাহিত্য অপেক্ষাও রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধসাহিত্য দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছেন। কারণ, যে ভাবে বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া তিনি নাটক রচনা করিয়াছেন, সেই ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যই হউক, কিংবা ইংরেজি সাহিত্যই হউক, তাঁহার নিজের নাটক রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী ও করুণাগুণের মধ্যে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ মানবিকতাবাদের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের মূল কথা ছিল—নির্বাণ এবং নিবৃত্তি; ইহাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল না।

১৩

রবীন্দ্রনাট্য ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চ

রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কেন সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইতে পারে নাই, তাহার একটি কারণ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতে বলিয়াছি যে, সামান্য কয়েকটি নাটক বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রায় সকল নাটকেই এমন এক আঙ্গিক ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার উপযোগী ছিল না। পাশ্চাত্ত্য নাটকের বহির্মুখী আঙ্গিক এবং অন্তর্মুখী ভাব অনুকরণ করিয়া সেইযুগে যাঁহারা নাটক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সেদিন অভিনীত হইত। রবীন্দ্রনাথ সে পথে অগ্রসর হন নাই।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ সর্বদাই ব্যবসায়-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়; সুতরাং সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাপকাঠিতে নাটকের সাহিত্যিক মূল্যও বিচার করা যায় না। তথাপি এ কথাও সত্য যে, নাটকের অভিনয়ের দিক দিয়া যদি উপযোগিতা না থাকে, তবে তাহা আর যাহাই হউক, নাটক নহে। সাধারণ বা ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের উপযোগিতা এবং রঙ্গমঞ্চের উপযোগিতা এক কথা নহে। ব্যবসায়-বুদ্ধি-পরিচালিত সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হইলেও বহু নাটকের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার উপযোগিতা থাকিতে পারে। কিন্তু এই অনুচ্ছেদে তাহা আলোচ্য নহে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকের কি সম্পর্ক ছিল, তাহাই এখানে বিবেচ্য।

উনবিংশ শতাব্দীতেই কলিকাতার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের রুচি ও আদর্শ গিরিশচন্দ্র-অমৃতলালের নাটকের আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ক্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনার আদর্শও তাহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দিক হইতে নূতন কোন ভাবনা-চিন্তা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর দ্বারাই প্রথম প্রবর্তিত হয়। গিরিশচন্দ্র তাঁহার গীতিনাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়াছেন; কিন্তু সামগ্রিক ভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটক দ্বারা অনুপ্রেরণা লাভ করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়ের মধ্যে তাঁহারা মঞ্চসাফল্যও কল্পনা করিতে পারেন নাই। শিশিরকুমার ভাদুড়ীই এই বিষয়ে প্রথম পরীক্ষা করিতে অগ্রসর

হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি পরীক্ষায় সার্থক হইতে পারেন নাই। 'শেষরক্ষা' নামক রবীন্দ্রনাথের যে প্রহসনখানি লইয়া শিশিরকুমার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বিষয়-বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতার জন্যই হউক, কিংবা শিশির-কুমারের অভিনয়-প্রতিভার অনুকুল না হইবার জন্যই হউক, নাট্যকার কিংবা অভিনেতা কাহাকেও সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই।

শিশিরকুমারের সম্প্রদায় ব্যতীতও অন্যান্য ব্যবসায়ী নাট্যগোষ্ঠী কোন কোন সময় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'ই সর্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করা হয়। 'রাজা ও রাণী' গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের মত নহে। ইহা মুখ্যত পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে রচিত এবং সমসাময়িক অন্যান্য বাংলা নাটকের মত অতিনাট্যিক ঘটনা দ্বারা ভারাক্রান্ত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া এই নাটকের উপস্থাপনা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ইহার অভিনয় সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দর্শক-গোষ্ঠীর রুচি যে অনুযায়ী গড়িয়া উঠিতেছিল, বক্তব্য বিষয়ের দিক হইতে ইহা তাহার ব্যতিক্রম ছিল। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে ভক্তি, সামাজিক নাটকে হিন্দু রক্ষণশীলতা এবং ঐতিহাসিক নাটকে দেশাত্মবোধ জনসাধারণের মধ্যে নাটকের বিষয়ে যে রুচি গড়িয়া তুলিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'তে তাহাদের কিছুই ছিল না। ইহার বাগ্‌বৈদগ্ধ সাধারণ দর্শকের অনুভূতিগম্য ছিল না, বিশেষতঃ সুদীর্ঘ গীতিধর্মী সংলাপ ইহার মধ্যে ক্লান্তিকর যে একঘেয়েমী সৃষ্টি করিত, তাহা সাধারণ দর্শকের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিত। ইহার বক্তব্য বিষয় ছিল মানবিক। মানবিক প্রেম তখনও সাধারণ সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং অভিনয়ের দিক হইতে ইহার মধ্যে সকল গুণই থাকা সত্ত্বেও ইহা শেষ পর্যন্ত দর্শকের রুচিকর হয় নাই। এমন কি, রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটির নানা 'ত্রুটি সংশোধন' করিয়া যখন 'তপতী' নামে নূতন রূপে প্রকাশ করিলেন, তখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নূতন ভাবধারা প্রবর্তন করিবার জন্য আগ্রহশীল হইয়া শিশিরকুমার ভাদুড়ী ইহার প্রযোজনা করেন ; কিন্তু তাহাতেও তিনি সার্থক হইতে পারেন নাই। ক্লান্তিকর সুদীর্ঘ পদ্য সংলাপের পরিবর্তে ইহাতে গদ্য সংলাপ ব্যবহৃত হইলেও রবীন্দ্রনাথের পরিণত বিদগ্ধ মনের সৃষ্টি সেই অপ্রত্যক্ষধর্মী গদ্যভাষাও সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করিতে পারিল না। বক্তব্য বিষয় ইহার মধ্যেও প্রায় অভিন্নই রহিয়া গেল।

'রাজা ও রাণী' রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথ যে আর একখানি নাট্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, আঙ্গিকের দিক দিয়া তাহারও অভিনয়োপযোগিতা ছিল। কিন্তু তাহারও বক্তব্য বিষয় জনসাধারণের ধ্যান-ধারণার অনুকূল ছিল না। নাটকটির নাম 'বিসর্জন।' ইহা আনুপূর্বিক সেক্সপীয়রের বিয়োগান্তক নাটক রচনার অনুগামী রচনা। বহির্দ্বন্দ্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটনা-বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে ইহাতে উচ্চাঙ্গ অভিনয়-গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ইহাকে উপস্থিত করিবার পক্ষে ইহার প্রধান বাধা ছিল, ইহার শেষ দৃশ্যের একটি আচরণ —তাহা প্রতিমা-বিসর্জন। ইহার মধ্যে হিন্দুসমাজের পৌত্তলিকতা-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। যে যুগে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির অভিনয়ের ভিতর দিয়া দর্শক-সমাজে ভগবদ্ভক্তি ও ধর্মবিশ্বাসের এক সমুচ্চ সৌধ গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই যুগে হিন্দুর আচার-ধর্ম পদদলিত করিয়া কালী প্রতিমাকে মন্দির হইতে নদীজলে বিসর্জন করিয়া দিবার কথা দেশের সমাজ স্বভাবতই গ্রহণ করিতে পারিল না। সেইজন্য উচ্চাঙ্গের অভিনয়-সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ ইহা সাধারণের সম্মুখে সেদিন অভিনয় করিবার দুঃসাহস প্রকাশ করিতে পারে নাই। তবে ইহার মধ্যে যে ঘটনা ও চরিত্রের বৈচিত্র্য ছিল, তাহা দ্বারা ইহা সৌখীন রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে অনেক ক্ষেত্রেই প্রশংসা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সুতরাং এখানেও দেখা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার পক্ষে দুইটি বাধা—প্রথমতঃ নাটকের গঠন-ভঙ্গির দিক দিয়া তিনি যেমন দেশীয় কিংবা প্রচলিত ধারা অনুসরণ করেন নাই, তেমনই নাটকের বক্তব্য বিষয়ের দিক দিয়াও তিনি ঐতিহ্যের ধারা পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক উপলব্ধিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার উপলব্ধি যেখানেই প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেখানেই জনসাধারণের সহানুভূতি হইতে তাহা বঞ্চিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি প্রহসন কতকটা সাফল্যের সঙ্গে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে; কিন্তু প্রহসনের আবেদন ক্ষণস্থায়ী; দীর্ঘকাল ইহারা দর্শক আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ষ্টার থিয়েটারে 'চিরকুমার সভা' কিছুকাল নিয়মিত অভিনীত হইয়াছিল সত্য; কিন্তু ইহার প্রধান আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের সুরচিত সঙ্গীতগুলি। ইহার বক্তব্যের মধ্যেও আপত্তিকর বিষয় ছিল সত্য; কারণ, প্রধানতঃ ইহাতে তৎকালীন একটি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উপর ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ ছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার কাহিনীতে বাংলার পারি-

বারিক জীবনের একটি সুমধুর পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল; তারপর পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত সঙ্গীতগুলিও ইহার বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট গায়ক এবং গায়িকা অভিনেতা-অভিনেত্রী ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবার ফলেই ইহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার অভিনয় দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল না। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' নাটকখানিও কিছুদিন অভিনয় করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারের অভিনয় সত্ত্বেও ইহারও বিষয়-বস্তু নিতান্ত লঘু এবং চরিত্রগুলি গুরুত্বহীন বলিয়া ইহাও বেশিদিন দর্শক আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথের একটি ক্ষুদ্র কৌতুক নাটক 'বশীকরণ'ও কয়েকবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই; বর্তমানে ইহার অভিনয় আর দেখা যায় না। ইহার মধ্যেও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া সাধারণ দর্শক তাহা সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি নাটক কোন কোন রঙ্গমঞ্চে অল্পদিনের জন্য অভিনীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'গৃহপ্রবেশ' নাটকটি উল্লেখযোগ্য। অহীন্দ্র চৌধুরীর মত অভিনেতা ইহার প্রধান অংশে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ইহারও অভিনয় সম্ভব হইতে পারে নাই।

তারপর 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র নাট্যরূপ 'বসন্তরায়', 'চোখের বালি' 'বিদায় অভিশাপ', 'ডালিয়া', 'দশচক্র' ইত্যাদিও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এখানে সেখানে অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু কোন অভিনয়ই দীর্ঘকাল যাবৎ দর্শকের ঔৎসুক্য আকর্ষণ করিতে পারে নাই। 'বিদায় অভিশাপে'র অভিনয়ে সেকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী দানীবাবু ও তারাসুন্দরী অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাও জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ, দানীবাবু কিংবা তারাসুন্দরী যে শ্রেণীর অভিনয়ে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, এবং দর্শক সমাজ ইহাদের নিকট হইতে যে শ্রেণীর অভিনয় দর্শনে অভ্যস্ত 'বিদায় অভিশাপে'র মধ্যে তাহা ছিল না।

সুতরাং প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে রবীন্দ্রনাথের কোন নাটকই কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দর্শকগোষ্ঠীর নিকট সে যুগে রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। সাম্প্রতিক কালেও এই অবস্থার যে বিশেষ কিছু পরিবর্তন হইয়াছে

তাহা নহে; তবে কলিকাতার কোন কোন অর্ধব্যবসায়ী নাট্যসম্প্রদায় কোন কোন সময়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকের যে অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহাতে এক শ্রেণীর দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে, তাহা ব্যাপকভাবে বাংলা-নাট্য দর্শক-সমাজের প্রতিনিধি নহে।

উপরে যেভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যর্থতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করা গেল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বহির্মুখী আঙ্গিক এবং অন্তর্মুখী ভাব ইহাদের কাহারও সঙ্গে রবীন্দ্রনাট্য ধারার সঙ্গে ঐতিহ্যের যোগ ছিল না। ঐতিহ্যের ধারাকে অস্বীকার করিয়া একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক সাধনায় ধ্যানমগ্ন থাকিলে সাধারণ দর্শকের তাহা গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কারণ, নাটক একান্ত আত্মিক সাধনার সৃষ্টি নহে—ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে ইহার যোগরক্ষার দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার নাটকের দেহ এবং আত্মা এমন স্বকীয় উপাদানে গঠিত, যাহাতে সাধারণ দর্শক-সমাজ কিছুতেই তাহা আপনার করিয়া লইতে পারে নাই।

ঘটনাবিন্যাসের পরিবর্তে ভাব-বিন্যাসকে রবীন্দ্র-নাটকে প্রাধান্য দিবার ফলে ইহার পাঠ্যগুণ যত বৃদ্ধি পাইয়াছে, দৃশ্যগুণ তত বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। অর্থাৎ রবীন্দ্র-নাটক পাঠ্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য নহে। পাঠ্যকাব্যের যে গুণই থাক, নাটকের দর্শক তাহাতে খুসী হইতে পারে না। কোনও রঙ্গমঞ্চে সাধারণ দর্শক দেখিয়া আনন্দলাভ করিতে চাহে, পড়িয়া শিক্ষা লাভ করিতে চাহে না। ইহা নাট্য-দর্শকের একটি সংস্কার। একজন নাট্যকার—তাঁহার প্রতিভা যত শক্তিশালীই হউক, তাঁহার একক প্রচেষ্টায় কিছুতেই দর্শককে এই সংস্কার হইতে মুক্ত করিতে পারে না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নাটক পাঠ্যরূপেই বাঁচিয়া থাকিবে, দৃশ্যরূপে বাঁচিতে পারিবে না। পাঠ্যগুণ এবং দৃশ্যগুণ উভয়ের সংমিশ্রণে উচ্চাঙ্গের নাটক রচিত হয়। সেক্সপীয়ের নাটক তাহার দৃষ্টান্ত। সংস্কৃত নাটকেরও পাঠ্যগুণই প্রধান এবং সেই সূত্রে সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের সকল সংস্কার লুপ্ত হইয়া গেলেও কেবল মাত্র পাঠ্যরূপে তাহা আজিও বাঁচিয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকও পাঠ্যরূপেই বাঁচিয়া থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিকাশের নিজস্ব একটি ক্ষেত্র আছে—তাহা গীতি-কাব্যের ক্ষেত্র, নাটকের ক্ষেত্রটি তাহার ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। সুতরাং স্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে প্রকার শক্তিশালী, স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে তিনি তাহা হইতে

পারেন নাই। তবে এ' কথা সত্য নাটক রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার, একটি বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন সূক্ষ্ম অনুভূতি সাপেক্ষ; কিন্তু নাটক স্থুল জীবনাশ্রয়ী—জীবনকে প্রত্যক্ষ এবং স্থুল ভাবে দেখিতে না পারিলে নাট্য-চরিত্র সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিতে পারে না, রঙ্গমঞ্চের মধ্যেও তাহার কোন স্থান হইতে পারে না। স্থুল রক্তমাংসে গড়া মানুষটিকে আমরা রঙ্গমঞ্চের উপর প্রত্যক্ষ করি, সূক্ষ্ম নিরবয়ব ভাব সেখানে অপ্রত্যক্ষগোচর; তাহা কোন রূপকে আশ্রয় করিলেও তাহার প্রত্যক্ষতার গুণ ক্ষুণ্ণ হয়। প্রত্যক্ষতাকে অস্বীকার করিলে নাটকীয় চরিত্র ভাবসর্বস্ব হইয়া উঠে। ইহাতে দর্শকের আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাহাই হইয়াছে বলিয়া তাহাদের মঞ্চসাফল্য গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

১৪

রবীন্দ্র-নাট্য বিচার

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে এই কথা স্পষ্ট হইয়াছে যে, সাধারণতঃ নাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, রবীন্দ্রনাথের নাটক তাহা নহে। যে বাস্তবধর্মিতা নাটকের একটি প্রধান গুণ, রবীন্দ্রনাট্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা অনুপস্থিত। যে আত্ম-নির্লিপ্ততা নাট্য রচনার পক্ষে অপরিহার্য, রবীন্দ্রনাট্যে তাহারও অভাব আছে। যে রক্তমাংসের গঠিত মানুষের প্রত্যক্ষ আচার-আচরণ আমরা নাটকের মধ্যে অনুসরণ করিয়া আনন্দলাভ করি, রবীন্দ্রনাট্যে তাহাও নাই; বরং তাহার পরিবর্তে কবির মনঃকল্পিত ধ্যানমূর্তি রূপেই তাঁহার চরিত্রগুলি গঠিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে মানব-জীবন ও প্রকৃতি-জগৎ সম্পর্কে যে সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির উপলব্ধি দেখা দিয়াছিল, রবীন্দ্রনাট্যের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র ব্যাপিয়া তাহারই নানাভাবে অভিব্যক্তি হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার প্রধান একটি অংশ রূপক এবং সঙ্কেতাশ্রিত, অথচ যে নাটকের সঙ্গে আমাদের সাধারণতঃ পরিচয় হইয়া থাকে এবং এই বিষয়ে যে ভাবে আমাদের মনে একটি রস-সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে অপ্রত্যক্ষ কোন বিষয়েরই স্থান নাই। অথচ রবীন্দ্রনাথের নাটকের যে সাহিত্যিক আবেদন আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু সাহিত্যিক আবেদন থাকিলেই যে নাটকের আবেদনও সেখানে সার্থক হইবে, এমন কোন কথা নাই। সেইজন্য প্রচলিত নাটক বিচারের মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথের নাটক বিচার করা যায় না। ইহাদের মধ্যে যে রস প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সর্বত্রই নাটকের রস নহে, তবে তাহা যে সাহিত্যের রস, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নিজস্ব একটি ক্ষেত্র আছে, সে'টি কাব্যের ক্ষেত্র,—নাটকের ক্ষেত্রও নহে, উপন্যাসের ক্ষেত্রও নহে। অনেকে ছোট গল্পকেও তাঁহার প্রতিভার স্বক্ষেত্রের সৃষ্টি বলিয়া মনে করেন। তথাপি এই কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও তিনি তাহার কবিধর্মকে বিসর্জন দিতে পারেন নাই। অনেক ছোটগল্পই তাঁহার কেবলমাত্র রচনার দিক দিয়াই নহে, বক্তব্য এবং ভাব-পরিবেষণের দিক দিয়াও কবিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং নাটকের মধ্যেও ইহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম দেখা দিবে, তাহা নহে।

নাটকে এবং কাব্যে প্রকৃত পক্ষে পার্থক্য কোথায়? বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ আচার-আচরণের ভিতর দিয়া জীবনের চরম সত্যের নির্দেশ শ্রেষ্ঠ নাটকের লক্ষণ। কাব্যের মধ্যে বাস্তব জীবন অপ্রত্যক্ষ থাকিতে পারে, কল্পনা এবং ভাব-বিলাসিতা সেখানে সমগ্র ক্ষেত্র অধিকার করিতে পারে। কিন্তু নাটকের মধ্যে জীবনকে ইহার স্থূল রূপের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ দেখিতে চাই—জীবন-রূপায়ণের দিক হইতে এখানে স্বপ্নবিলাসিতা কিংবা ভাবনির্ভরতার স্থান নাই। প্রত্যক্ষ জীবনের নানা জটিল সমস্যা, তাহার রূঢ় এবং নগ্ন পরিচয়, তাহার সংগ্রামশীল ক্ষত-বিক্ষত রূপ রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে স্থান পায় নাই। জীবনের যাহা শাশ্বত সত্য, তাহাকেই তিনি সন্ধান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাকে সন্ধান করিতে গিয়া প্রত্যক্ষ জীবনকে তিনি প্রায় সর্বদাই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আত্মিক শক্তির অন্তহীন মহত্ত্বই রবীন্দ্রনাথ সন্ধান করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন 'তিনি বিশ্বাস করেন, জীবনের যে সাধনা, যে চিরন্তন অতৃপ্তি ও জিজ্ঞাসা, অসীমকে লাভ করার যে ঐকান্তিক আকুতি তার মধ্য দিয়াই মানবের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বিকাশিত। মানুষের যে অবিনশ্বর পরিচয় তার সনাতন শাশ্বত আত্মার জ্যোতির্ময় প্রকাশের মধ্যেই নিহিত আছে, তাই শ্রেষ্ঠ নাটকের উপাদান।' মানুষের বাহিরের পরিচয়টির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতে পারেন নাই; কারণ, সেখানে তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত কদাচ ঘটে নাই। তিনি সর্বদাই তাঁহার ধ্যানদৃষ্টি যোগে তাহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়া মানুষের শাশ্বত আত্মার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেখান হইতেই তাহার নাটকীয় দ্বন্দ্বের প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। ইহা দার্শনিকের দৃষ্টি, তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টি—এমন কি, কতখানি কবির দৃষ্টি সেই বিষয়েও সংশয় আছে। কারণ, কবিও প্রত্যক্ষ জীবনকে সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া পারেন না—ইহার ভিতর দিয়াই তাঁহার সত্যোপলব্ধি ঘটে। কিন্তু কেবলমাত্র দার্শনিক জীবন এবং জগতের সকল প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব-কোলাহলের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বত জীবনের অন্তর্লোকের সন্ধান করিয়া জীবন-তত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া হইয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকের মধ্যে যতখানি জীবনের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, ততখানি জীবন-রসরসিক নহেন। সাহিত্যের কথা রসের কথা, তত্ত্বের কথা নহে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকের মধ্যে জীবনের তত্ত্বকে যে প্রাধান্য দিয়াছেন, জীবনের রসকে সেই প্রাধান্য দেন নাই।

যুগে যুগেই মানব-জীবনে বহির্মুখী নানা সমস্যা প্রকাশ পাইতেছে। প্রত্যেক

যুগের নাট্যকারই যুগ-জীবনের সেই সমস্যাকেই নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়াস পান এবং তাহার ভিতর দিয়া জীবনের সত্যও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কারণ, যুগজীবনের সমস্যা উপলক্ষ করিয়াই নাটকে চিরন্তন জীবনের সত্যের সন্ধান পাইতে হয়। রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রত্যক্ষ যুগজীবন উপেক্ষিত হইয়াছে, তিনি তাঁহার মানসলোকে অপ্রত্যক্ষ নানা ভাব-জীবনের সৃষ্টি করিয়া জীবনের চরম সত্য লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। লক্ষ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি যেমন স্থির নিবদ্ধ ছিল, উপলক্ষের প্রতি তেমন ছিল না। অথচ উপলক্ষের মধ্যে যে রূপ-বৈচিত্র্য দেখা যায়, লক্ষ্যের মধ্যে তাহা নাই ; লক্ষ্যের মধ্য হইতে বাহিরের চোখের দৃষ্টি ফিরিয়া আসে, কিন্তু সেখানে অন্তরের চোখ খুলিয়া যায়।

সেক্সপীয়রের নাটকে বহির্মুখী যুগজীবনের ভিতর দিয়াই জীবন সত্যের উপলব্ধি সম্ভব হইয়াছে ; যুগজীবনের বৈচিত্র্যের ও তাহার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে যে রস ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই প্রকৃত নাট্য-রস। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া নাট্যরস উপেক্ষিত হইয়াছে।

মানবাত্মার শক্তির উপলব্ধির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পরমাত্মার উপলব্ধিও আসিয়াছে। তাহাই ঈশ্বরের উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর নাটকের মধ্যে পরমাত্মা বা ঈশ্বরোপলব্ধি নাট্য-পরিণতির ধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। অলৌকিক শক্তি দ্বারা নাট্য পরিণতি নিয়ন্ত্রিত হইবার ফলে ইহাদের প্রত্যক্ষতার গুণ ক্ষুণ্ণ হইয়া সাধারণ নাটকের সঙ্গে ইহাদের ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য নাটকে চরিত্রগুলি স্বাভাবিক নিয়মে স্বাধীন আচরণ করিবার যেমন অধিকারী, এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা নাট্যকাহিনী নিয়ন্ত্রিত হইবার ফলে রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাহা আশা করা যায় না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ নাটকের সংজ্ঞায় বিচার করা যায় না। ইহাদের বিচারের ধারা স্বতন্ত্র।

কিন্তু যেখানে অতীয়িন্দ্র অনুভূতিনির্ভর চরিত্র নাট্য-কাহিনীর গতি এবং প্রকৃতির নিয়ামক, সেখানে কোন সাহিত্যিক বিচার সম্ভব নহে। যাহা অনুভূতির মধ্যে জন্মলাভ করিয়া থাকে, তাহাকে অনুভব করিয়াই বুঝিতে হয়, তাহাকে সর্বদা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সেইজন্য রবীন্দ্র-নাট্যের বিশ্লেষণ অনেক ক্ষেত্রেই আত্মভাব-পরায়ণ (subjective) হইতে বাধ্য। অনেক ক্ষেত্রেই ইহার বিচার দর্শনের বিচার, সাহিত্যের বিচার নহে। তবে রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার কোন রচনাতেই

দর্শনচিন্তা সাহিত্যরূপকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে সাহিত্যগুণের সমান্তরালভাবেই দার্শনিক চিন্তা বিকাশ লাভ করিয়াছে।

জীবনের কোন খণ্ডরূপের দিকে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল না, জীবনের একটি অখণ্ড অনুভূতি তাঁহার মধ্যে সর্বদাই সক্রিয় ছিল ; নাটকের মধ্যেও তিনি সেই অখণ্ড বা অনন্ত জীবনের সন্ধানী ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য নাটক কিংবা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত বাংলা নাটকে এই অনুভূতির কোন অস্তিত্ব নাই। মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ-অনুভূতির মধ্যেই ট্রাজিডি সৃষ্টি হইয়া থাকে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই অনুভূতি ছিল না বলিয়া সেই ভাবে তাঁহার নাটকে ট্রাজিডি সৃষ্টি হইতে পারে নাই। কেবলমাত্র দুই একখানি নাটক বাদ দিলে পাশ্চাত্ত্য ভাবের ট্রাজিডি তাঁহার মধ্যে নাই। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য নাটকের বিচার-পদ্ধতি এখানেও প্রযোজ্য নহে। তাহার নিজস্ব পদ্ধতিতেই তাহার বিচার কর্তব্য।

১৫

রবীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রনাট্য

রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছে, নাটকের মধ্য দিয়া তিনি সর্বদাই তাহাদেরই রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহার নাটকের জন্য তিনি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রকৃত স্বাধীন ক্ষেত্র রচনা করিতে পারেন নাই। নাট্যকার প্রত্যক্ষ জীবন হইতে যে ভাবে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নাট্য-কাহিনীব মধ্যে তাহা বিন্যাস করিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথ সে ভাবে তাঁহার নাটকের কাহিনী পরিকল্পনা করেন নাই। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে তাঁহার একটি ধ্যান তাঁহার অন্তরের মধ্যে সর্বপ্রথম উদয় হইয়াছে, সেই ধ্যান-জগৎকে রূপ দিবার জন্য তিনি একটি রোমাণ্টিক জগৎ রচনা করিয়াছেন; সেই জগৎ স্বভাবতঃই প্রত্যক্ষ কর্মকোলাহল মুখর জগৎ হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাঁহাব চিত্তপটে উদ্ভাসিত যে কল্পজগৎ, ইহা সেই জগৎ। ইহা কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যানুভূতিরই অপর একটি দিক মাত্র, কবি-চেতনারই আর একটি রূপ, ইহাকে তাহা হইতে স্বাধীন মনে করিবার কোন কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের ক্রমবিকাশের পটভূমিকায় ইহা বিচার করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার সর্বপ্রথম যুগ 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' রচনার যুগ। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'ব মধ্যে যে বেদনার সুর বাজিয়াছে, তাহা তাহার অনতিকাল পূর্বে রচিত গীতি-নাট্যগুলির মধ্য হইতেই আসিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। কারণ, তাঁহার প্রথম জীবনের গীতিনাট্যগুলি কাহিনীর দিক দিয়া অতিনাট্যিক এবং সুরের দিক দিয়া বেদনাময়। একই মনোভাব হইতে সেই যুগে তাঁহার কাব্য এবং গীতিনাট্যগুলি রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের মধ্যে ভাব-গত কোন পার্থক্য দেখা যাইতে পারে নাই। সেই যুগের রবীন্দ্রনাথের কবি-মনোভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচক অজিত চক্রবর্তী লিখিয়াছেন,

'নবযৌবনের আরম্ভে অন্তরে যখন হৃদয়াবেগ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, অথচ বিশ্বজগতের সঙ্গে তাঁহার যথোচিত যোগ ঘটিতেছে না—হৃদয়ের অনুভূতির সহিত জীবনের অভিজ্ঞতার যখন সামঞ্জস্য হয় নাই, তখন নিজের

মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থার যে অধীনতা, তাহাই সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবিতার মধ্যে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে।'

'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক যে কয়টি গীতিনাট্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটির কাহিনীই বিয়োগান্তক এবং একটি সুগভীর বেদনার সুরে আচ্ছন্ন। এই বেদনা অবরুদ্ধ অবস্থারই বেদনা। 'রুদ্রচণ্ড', 'ভগ্নহৃদয়', 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্যে অন্তরের এই অবরুদ্ধ বেদনাই কাহিনীর করুণ পরিবেশ এবং সকরুণ পরিণতির কারণ। এই মনোভাব হইতে সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত হইয়া ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কহীন স্বাধীন কোন কাহিনী তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। দস্যু রত্নাকর কর্তৃক করুণা-রূপিণী সরস্বতীর বন্ধন দশার মধ্যে কবি-হৃদয়ের অবরুদ্ধ অবস্থার এই মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'রুদ্রচণ্ড' ও 'ভগ্নহৃদয়ে'র বেদনাবোধও ইহার মধ্যেই জন্মলাভ করিয়াছে।

'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' উক্ত গীতিনাট্যগুলি অপেক্ষা অধিকতর পরিণত রচনা। ভাব এবং ভাব-প্রকাশের ভঙ্গি ইহাতে অধিক স্পষ্ট। এই পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে রবীন্দ্রনাথকে গীতিনাট্যগুলি যে সহায়তা করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র বহু কবিতার ভিতর দিয়া উক্ত গীতিনাট্যগুলির বহু অংশের সুর প্রতিধ্বনিত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়।

গীতিনাট্যগুলির বিষয়বস্তু প্রেম, কিন্তু সেই প্রেমে চরিতার্থতা নাই ; 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'রও মূল সুরের সঙ্গে ইহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। সুতরাং দেখা যায়, প্রথম জীবন হইতেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনা এবং কাব্যরচনা এক সুরেই গাঁথা হইয়া গিয়াছিল এবং এই ধারাই তাহার জীবনের সাধনাকে শেষ পর্যন্ত সার্থকতার পথে লইয়া গিয়াছে।

'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র পরই রবীন্দ্র-কাব্যসাধনায় সমৃদ্ধতম যুগের আবির্ভাব হয়, তাহা 'মানসী-সোনারতরী-চিত্রা'র যুগে। অনেকেই মনে করেন, এই যুগই সমগ্র রবীন্দ্র-সাধনার সমৃদ্ধতম যুগ। কাব্যের ক্ষেত্রে এই যুগে যেমন 'মানসী', 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' রচিত হইয়াছিল, নাটকের ক্ষেত্রেও সেই যুগে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি আবির্ভূত হইয়াছিল—তাহাই তাঁহার নাট্যকাব্য 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' 'মালিনী' ইত্যাদি। গদ্য রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সেই যুগে 'গল্পগুচ্ছ' তিন খণ্ড এবং 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয়। প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধির দিক হইতে রবীন্দ্র-সাধনায় এই যুগই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

বিশেষতঃ এই যুগে তিনি পল্লীবাংলার একান্ত নিভৃত জীবনে বাস করিবার ফলে সাধারণ মানুষের নিবিড়তম সান্নিধ্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার সাহিত্য সেদিন এক নূতন শক্তি লাভ করিয়াছিল। প্রকৃতি এবং মানুষ সে'দিন তাঁহার সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার সাহিত্য সে'দিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহার মধ্যে রূপ লাভ করিয়াছিল। সে যুগের 'মানসী', 'সোনার তরী' 'চিত্রা' কাব্য কয়খানি বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে, তাহারই ভাব নানাভাবে তাঁহার সে যুগের নাট্যকাব্যগুলির মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। মর্ত্য-প্রীতি অর্থাৎ মানব এবং প্রকৃতি প্রেম সেদিন তাঁহার কাব্যে যেমন প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাঁহার সমসাময়িক নাটকের মধ্যেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্য হইতেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে মানবের প্রতি সহজাত করুণাবোধের যে জন্ম হইয়াছিল, তাহারই ধারা এই পর্বের শেষ নাট্যকাব্য 'মালিনী' পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা'র মধ্য দিয়াও মানুষের প্রতি মমতায় মানুষের চারিত্রিক শৈথিল্যকে আঘাত করিয়াছেন, মৃত্যুজনিত খণ্ডিত জীবনের বেদনা তাঁহার সমগ্র অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছেন, আচার ধর্মের হৃদয়হীনতাকে তিনি নির্মমভাবে আঘাত করিয়াছেন, মর্ত্যের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদের দুঃখকেও গভীরভাবে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাদের পরস্পরের সঙ্গে এক সুগভীর যোগ অনুভব করা যায়। এমন কি, যদি তাঁহার সে যুগের 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলিও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও অনুভব করিতে পারা যায় যে, তাহারা রবীন্দ্রনাথের সে'যুগের সামগ্রিক সাধনার এক অখণ্ড পরিচয়ই প্রকাশ করিতেছে, ইহারাও কোন বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নহে। রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রকৃতি চিরকালই অখণ্ডনীয়, ইহা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত নহে। কেবলমাত্র তাহা কালের দিক দিয়া পর্বে পর্বে বিভক্ত হইতে পারে ; কিন্তু একই কালে বিভিন্ন বিভাগে কিংবা বিষয় দ্বারাও বিভক্ত হইতে পারে না। সেইজন্য নাট্যকাব্যের চিন্তা তাঁহার সে যুগের কাব্যের মধ্যে যেমন প্রবেশ করিয়াছে, কাব্যের চিন্তাও ছোটগল্প কিংবা নাটকের কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পরস্পরকে বুঝিবার জন্য পরস্পরের আলোচনা আবশ্যক হয়, পরস্পরের কোন স্বাধীন সত্তা নাই।

'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা'-যুগের অন্যান্য রচনার মত সে যুগের নাট্য রচনাও রবীন্দ্রনাথের নাটক হিসাবে সমৃদ্ধতম রচনা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, সেই যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ জীবনের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহা হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, নাটকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মহৎ প্রেরণা আর কিছুই হইতে পারে না। পূর্ববর্তী যুগের গীতি-নাট্যগুলি রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক চিন্তার ফল, কিন্তু এই যুগের কাব্য ছোটগল্পের মত, তাঁহার নাটকও প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতার ফল। ইহার পরবর্তী জীবনেও রবীন্দ্রনাথ এই সুযোগ আর কখনও লাভ করিতে পারেন নাই। তখন আবার তিনি কল্পনার রাজ্য এবং একান্ত আত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে ফিরিয়া গিয়াছেন, এখানেই তাহার জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পর্ব শেষ হইয়া গিয়াছে।

কাব্য রচনার ক্ষেত্রে 'চিত্রা'র যুগ অতিক্রম করিয়া ক্রমে রবীন্দ্রনাথ 'খেয়া' উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবন এবং পরিদৃশ্যমান জগতের সঙ্গে তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। কাব্যের ক্ষেত্রে যাহাই হউক না কেন, নাটকের ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষ জীবন এবং জগৎকে অস্বীকার করিয়া নাটক হইতে পারে না। কিন্তু পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকই তাঁহার একান্ত আত্মিক উপলব্ধিরই বহিঃপ্রকাশ—প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। 'খেয়া' উত্তীর্ণ হইবার পর হইতেই রবীন্দ্রনাথের নাটকের ক্ষেত্রে সেই যুগের সূচনা দেখা দেয়।

'খেয়া'র ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে 'গীতালি' 'গীতিমাল্য' ও 'গীতাঞ্জলি'র যুগে উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন, মর্ত্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করিয়া প্রথমতঃ অতীত কল্পনার লোকে এবং তারপর অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মলোকে গিয়া তিনি প্রবেশ করিলেন, নাটকের ক্ষেত্রেও তখন তিনি অলোকচারী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। সেই যুগেই তাঁহার অলোকধর্মী রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটকগুলি রচিত হইল। সুতরাং কাব্যধারার স্বধর্ম অনুসরণ করিয়াই এখানেও তাঁহার নাট্যধারা বিকশিত হইয়া চলিল; নাট্যধারাকে তিনি তাঁহার কাব্যচিন্তা হইতে মুক্ত রাখিতে পারিলেন না। এই যুগেই রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক 'রাজা', 'ডাকঘর', রূপক নাটক 'অচলায়তন' 'মুক্তধারা' ইত্যাদি রচিত হয়। যে ভাব তাঁহার 'গীতাঞ্জলি'র ভিতর দিয়া

তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল, তাহাই তিনি 'রাজা' নাটকের মধ্যে রূপায়িত করিলেন। তাঁহার কাব্যভাবকে রূপায়িত করিবার জন্যই তিনি তাঁহার নিজস্ব নাটকগুলিকে ব্যবহার করিলেন, এই যুগের নাটকগুলিরও কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন রূপ দিতে পারিলেন না।

কাব্যের ক্ষেত্রে এই যুগের অবসানের পর যখন তাঁহার মধ্যে 'বলাকা' যুগের সূচনা হইল, তখনও 'ফাল্গুনী' নাটকের ভিতর দিয়া তিনি 'বলাকা'র ভাবটি প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু চিন্তাকে তাহার কর্মের ভিতর দিয়া রূপ দিয়েছেন, এই ভাবে শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, কাব্যের ভাবকে তিনি রূপ দিবার জন্য নাটকের কাহিনী ও চরিত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কাব্য ও নাটক পরস্পর এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া আছে।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, কাব্যই রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বক্ষেত্র, নাটক তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে; কাব্যের প্রেরণা এবং সৃষ্টি উভয়ই রবীন্দ্রনাথের মৌলিক, নাটক তাঁহার নিকট গৌণমাত্র। সেইজন্য কাব্যের ভাব দিয়াই রবীন্দ্রনাথের নাটক বুঝিবারও প্রয়োজন হয়।

রবীন্দ্রনাথের নাটক কাব্যের ভাবকেই একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়া রচনার বহিরঙ্গের দিক দিয়াও ইহারা কাব্যধর্মী হইয়াছে। বস্তু অপেক্ষা ভাব যেখানে প্রাধান্য লাভ করে, সেখানে রচনা স্বভাবতঃই কাব্যধর্মী হইয়া থাকে। ভাষায় কিংবা কাহিনীতে নাটক সেখানে দৃঢ়সংবদ্ধতাও লাভ করিতে পারে না। যে যুগে যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, সেই যুগে সেই ভাষাতেই তিনি তাঁহার নাটকও রচনা করিয়াছেন। সেইজন্য 'সোনার তরী'র কাব্যভাষা এবং 'রাজা ও রাণী'র নাট্যসংলাপের ভাষায় কোন পার্থক্য নাই, তারপর 'রাজা ও রাণী'র পরিবর্তিত রূপ দিতে গিয়া 'তপতী'তে তিনি তাঁহার সমসাময়িক গদ্য রচনার ভাষা ব্যবহার করিলেন।

১৬

সাধারণ বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনা তাঁহার কবি-মানসেরই এক অখণ্ড অভিব্যক্তি বলিয়া ইহার মধ্যে ভাব-প্রবাহের একটি অখণ্ড ধারাই অনুসরণ করা হইয়াছে। এই ভাবকে রূপ দিবার জন্য যে চরিত্রগুলি তিনি বিভিন্ন নাটকের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহারাও একই অখণ্ড ভাব-ধারা অনুসরণ করিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নাটককে যদি দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—রোমান্টিক ও সামাজিক, তবে দেখা যায় যে, রোমান্টিক ধারা প্রথম হইতেই সুনির্দিষ্ট একটি আদর্শ লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহার এই শ্রেণীর নাটকগুলি পরস্পব বিভিন্ন হইলেও এবং সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে রচিত হইলেও মূল ভাব-ধারা হইতে ইহারা কদাচ বিচ্যুত হয় নাই। যাঁহারা বাস্তবধর্মী নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ জীবনের মধ্যেই নানা বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পান; কিন্তু এক অভিন্ন ভাব বা 'আইডিয়া'-কেন্দ্রিক নাটকের মধ্যে যেমন অন্তর্মুখী কোন বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইতে পারে না, বহির্মুখীও কোন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে এই ত্রুটি-ই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাট্যের একেবারে প্রথম হইতেই একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ বা 'মডেল' গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বিশেষ যেমন একটি ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই প্রায় একই শ্রেণীর কতকগুলি চরিত্র আছে। অবশ্য চরিত্রগুলির বহির্মুখী পরিচয় রবীন্দ্র কবি-মনোভাবের ক্রমবিকাশের সূত্রে গ্রথিত হইয়া তাঁহার জীবনের বিভিন্ন পর্বের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া যাইবার ফলে বিভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে; কিন্তু ইহাদের অন্তরের কথা প্রায় সকলেরই অভিন্ন। প্রায় সমগ্র রোমান্টিক নাটকের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ একটি মাত্র কথাই বলিতে চাহিয়াছেন, বিভিন্ন নাটকের মধ্য দিয়া এক একটি প্রায় সমধর্মী চরিত্র কল্পনা করিয়া সেই একই কথা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রত্যেক নাটকেই একই শ্রেণীর কতকগুলি চরিত্রের সন্ধান লাভ করা যায়।

শুধু তাহাই নহে, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকেও একই চরিত্র ইহাদের কোন পরিচয় কিংবা বৈশিষ্ট্য বিসর্জন না দিয়াও বার বার আবির্ভূত হইয়া থাকে।

তাহার ফলে অনেক সময় তাঁহার নাটক একই নাটকের বিভিন্ন খণ্ড বলিয়াও মনে হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় একই নাটক বার বার নূতন করিয়া লিখিয়া থাকেন। ইহার অর্থ কাব্য-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ কিংবা পত্রসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যেমন প্রথম হইতেই একটি পরিণত সৃষ্টিকে রূপ দিতে পারেন, নাটকের ক্ষেত্রে তাহা পারেন না। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে যে বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে, নাটকের মধ্যে তাহা পাইতে পারে নাই বলিয়াই বার বার করিয়া একই কথা একই শ্রেণীর চরিত্রের মুখ দিয়া তিনি নাটকে প্রকাশ করেন। একই নাটক বারে বারে 'সংশোধন' করিয়া প্রকাশ করিবার মধ্যেই তাঁহার সমগ্র নাট্যরচনায় একই ধারা অনুসরণ করিবার ইঙ্গিতটুকুও রহিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রত্যক্ষ জীবনের কোনও সাময়িক সমস্যা রবীন্দ্রনাথের নাটকের লক্ষ্য ছিল না, বরং তাহার পরিবর্তে শাশ্বত মানবাত্মা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। মানুষ করুণা এবং মৈত্রীর মধ্য দিয়া কি ভাবে নিজের আত্মার অনুভূতি লাভ করিয়া তাহাতেই পরমাত্মার সন্ধান করিতে পারে, তাহাই তিনি তাঁহার অধিকাংশ নাটকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নাটকের সংখ্যা যাহাই থাকুক, বক্তব্য বিষয় তাঁহার একই হইবার জন্যই প্রকাশ ভঙ্গির মধ্যেও বৈচিত্র্যহীনতা আসিয়াছে। ভাব-জগতে বৈচিত্র্য নাই, ভাব এক এবং অখণ্ডনীয়। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছেন, 'অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা।' কিন্তু বাহিরের জগতে তাহাই বিচিত্র রূপে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ অন্তরের একাকীত্বকে যতখানি নিবিড় ভাবে অনুভব করিয়াছেন, বাহিরের বৈচিত্র্যকে তত ব্যাপক ভাবে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই তাঁহার নাটকে ভাব-গভীরতা যত বেশী, বহির্মুখী জীবন-বৈচিত্র্য তত বেশী নাই। একই চরিত্র এবং চিত্র বার বার করিয়া তাহার বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হইয়া একই কথা নানা ভাবে বলিয়াছে মাত্র।

রাজা

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক নাটকে রাজার একটি চরিত্র আছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের 'রাজতন্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাস' ছিল। অন্ততঃ তাঁহার রোমান্টিক নাটকগুলি হইতে তাহাই মনে হইতে পারে। তাঁহার এই শ্রেণীর প্রত্যেক নাটকে রাজার একটি চরিত্র স্থান লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ সম্পর্কে

কেহ কেহ উল্লেখ করেন, 'এর ভিত্তিমূলে আছে ঐশ্বরিক অস্তিত্বে তাঁর প্রগাঢ় আস্থা। ঈশ্বরই যেন সবার রাজা। সে জগতে গণতান্ত্রিক সাম্যবোধের সত্যি-কারের অস্তিত্ব যেন নেই। জগতের ভারসাম্য রক্ষার জন্য তিনি রাজার অস্তিত্বে বিশ্বাসী।' কিন্তু এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর-বিশ্বাস লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন নাই, জীবনের বিশেষ একটা পর্বে তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইয়াছিলেন, এ' কথা সত্য। 'গীতাঞ্জলি' রচনার যুগের পূর্ব পর্যন্ত যথার্থ ঈশ্বরবিশ্বাস বলিতে যাহা বুঝায়, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাহা বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, তবে তাহা বীজের আকারে অস্ফুট অবস্থায় না থাকিলে পরবর্তী কালে তাঁহার জীবনে তাহা এত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। তাঁহার সেই ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রকৃত তখন কি আকারে ছিল, তাহা আলোচনার বিষয় হইতে পারে। 'গীতাঞ্জলির' যুগে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাস সুপরিণত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্বে তাহা তাঁহার নাটকের রাজা চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া অস্ফুট ভাবে বিকাশ লাভ করিতেছিল। রাজা চরিত্রের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ যে গুণটি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ রাজার শক্তি। রাজা শক্তিমান্—তিনি ইচ্ছা করিলে প্রাণদণ্ড দিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে প্রাণরক্ষাও করিতে পারেন। যিনি প্রকৃত শক্তির অধিকারী, তিনিই প্রকৃত ক্ষমা এবং করুণাগুণের অধিকারী হইতে পারেন। সেইজন্য রাজার শক্তিমত্তার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কারুণ্য গুণের সন্ধান করিয়াছেন। রাজার এই পরিকল্পনার মধ্যে 'গীতাঞ্জলি' যুগের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক ভাব স্পর্শ করিতে পারে নাই। রাজা তখন তাঁহার পরিকল্পনায় মহামানব বা superman মাত্র, ক্রমে সেই ভাবই আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নীত হইয়া গেল। তখন হইতেই রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় রাজা পরিকল্পনার সঙ্গে ঈশ্বর-বোধ একাকার হইয়া গেল, রাজা বলিতে তিনি ঈশ্বরই বুঝিতে লাগিলেন। অবশ্য তাঁহার এই ঈশ্বরবোধের সঙ্গে সাধারণ ধর্মসম্প্রদায়ের ঈশ্বরবোধের পার্থক্য ছিল।

আধ্যাত্মিক-বোধ উন্মেষের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ রাজার মধ্যে দুইটি শক্তি অনুভব করিয়াছেন—একটি তাঁহার প্রাণ গ্রহণ করিবার নিষ্ঠুরতা, আর একটি প্রাণ রক্ষা করিবার করুণা। আধ্যাত্মিক-বোধ বিকাশ লাভ করিবার পরও তিনি রাজা অর্থে যখন ঈশ্বরই মনে করিয়াছেন, তখনও ঈশ্বরের মধ্যে এই দুইটি গুণই তিনি বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছেন, একটি তাহার শক্তির ঐশ্বর্য, আর একটি তাঁহার কারুণ্যের মাধুর্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনেও ঈশ্বরকে কেবলমাত্র ঐশ্বর্য রূপের

প্রতীক্ বলিয়া অনুভব করা হয় নাই, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাধুর্যের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে বলিয়া যে অনুভূত হয়, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবোধও তাহারই অনেকটা অনুকূল। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও যেমন তাঁহার একটি বিশেষ রূপও স্বীকার করা হয়, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-বোধে তাহা হয় না। রূপের মধ্য দিয়া তাঁহার আত্মপ্রকাশ ঘটিলেও কোন বিশেষ রূপে তিনি ধরা দেন না। এইখানেই কোন সম্প্রদায়গত ঈশ্বরবোধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবোধের পার্থক্য।

রবীন্দ্রনাট্যের রাজা চরিত্রের দুইটি প্রধান কালগত বিভাগ আছে। প্রথমতঃ 'গীতাঞ্জলি'র যুগের পূর্ববর্তী, অর্থাৎ তাঁহার অধ্যাত্মবোধ বিকাশ লাভের পূর্ববর্তী রাজা চরিত্র এবং 'গীতাঞ্জলি' যুগের রাজা চরিত্র। পূর্ববর্তী যুগের যে রাজা পার্থিব পরিচয়ের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিই 'গীতাঞ্জলি'র যুগে অপার্থিব পরিচয় লাভ করিয়াছেন। পরবর্তী যুগেই তিনি ঐশ্বরিক শক্তিতে প্রগাঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহার পূর্ববর্তী জীবনে নহে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাট্যের এই দুই যুগের এই দুই রাজা পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন, এক যুগের পার্থিব রাজাই পরবর্তী যুগে অপার্থিব হইয়াছেন; কারণ, ইহাদের অন্তর্মুখী পরিচয়ে কোন পার্থক্য নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, রাজা চরিত্রের পরিকল্পনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকে একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করা যায়। কয়েকটি নাটক হইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই বিষয়টি সহজবোধ্য হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' হইতেই এই আলোচনার সূচনা করা যায়। এই বিষয়ে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র একটি বিশেষ মূল্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনুভব করিয়াছেন, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্যেই তাঁহার নাট্য-কাহিনী সর্বপ্রথম 'দানা বাঁধিয়া' উঠিয়াছিল। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র নায়ক চরিত্র রাজা চরিত্র; তবে তিনি দস্যুদলের রাজা। রাজা চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে দুইটি শক্তি অনুভব করিয়াছেন বলিয়া পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ প্রাণ গ্রহণ করিবার শক্তি এবং প্রাণ রক্ষা করিবার শক্তি, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র রাজা চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ এই দুইটি শক্তিই প্রকাশ করিয়াছেন। নাটকের প্রথমেই অমানিশার নিশীথে কালীপুজায় বলি দিবার জন্য দস্যুদলের রাজা বলির সন্ধান করিয়া আনিতে বলিলেন। ইহাতে রাজা চরিত্রের নিষ্ঠুরতার দিকটি প্রকাশ পাইল।

দস্যুদল একটি অসহায়া বালিকাকে ধরিয়া আনিল, তাহাকে বলিদান করা হইবে। দস্যুদলের রাজা আদেশ করিলেন—

নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও যা ত্বরায়।
লোল জিহ্বা লক্‌লকে, তড়িত খেলে চোখে
করিল খণ্ড দিক্‌দিগন্ত, ঘোর দন্ত ভায়।

এই পর্যন্ত রাজার প্রাণ গ্রহণ করিবার নিষ্ঠুর শক্তির কথা বলিয়াই তাঁহার মধ্যে নাট্যকার যেন এক নূতন মানুষকে জাগাইয়া তুলিলেন। সেই মুহূর্তে বালিকার আর্তক্রন্দন শুনিয়াই রাজা ভাবান্তর অনুভব করিলেন,

এ কেমন হলো মন আমার ?
কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারিনে।
পাষাণ হৃদয়ও গলিল কেন রে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে ?
কী মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল !
সব ভেসে গেল গো—সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে।

এখানে দেখা যায় যে, রাজার একই হৃদয়ে দুইটি গুণ—একটি নিষ্ঠুরতা, আর একটি করুণা। নিষ্ঠুর হইবার শক্তিও রাজার যেমন চরম হইতে পারে, করুণা গুণেও তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। সেইজন্য বিদ্রোহী দস্যুদলকে উপেক্ষা করিয়াও তিনি বালিকাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই অনুভব করিয়াছেন, দুর্বলের ক্ষমা অর্থহীন ; যিনি কঠিনতম শাসন্ করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করেন, কিংবা যিনি চরম নিষ্ঠুর হইবার শক্তির অধিকারী হইয়াও করুণা প্রকাশ করিতে পারেন, তাহারই ক্ষমা এবং করুণা যথার্থ। রাজার মধ্যে শক্তির পূর্ণতা তিনি কল্পনা করিয়াছেন, সেই শক্তি অত্যাচারে নিয়োজিত হইলেই সমাজের অকল্যাণ, সেই শক্তি সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারিলেই সমাজের কল্যাণ। ইহার মাঝখানে আর যাহা আছে, তাহা লইয়া কাহারও প্রকৃত কোন কল্যাণ নাই। সেইজন্য রাজাই রাষ্ট্র এবং সমাজের পরম লক্ষ্য হইতে পারে।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্যে একই চরিত্রে যেমন রাজার দুইটি গুণ পাশাপাশি

প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার পরবর্তী নাটক 'রাজা ও রাণী'র মধ্যে তাহাই দুইটি চরিত্রের মধ্য দিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বিক্রমদেব রাজা চরিত্রের নিষ্ঠুরতার প্রতিনিধি এবং রাণী সুমিত্রা করুণার প্রতিনিধি। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বাল্মীকির মধ্যে এক দেহে বিক্রমদেব ও সুমিত্রা বর্তমান রহিয়াছেন। কিন্তু এখানেও সেই রাজা চরিত্র তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়াই সক্রিয় বলিয়া অনুভূত হয়। তাঁহার নিষ্ঠুরতার জন্যই কুমার, ইলা ও সুমিত্রার জীবনের পরিণতি সুগভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। 'বিসর্জনে'র মধ্যেও গোবিন্দমাণিক্য এবং রঘুপতির মধ্য দিয়া রাজার শক্তি দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। রঘুপতি যেমন শক্তির নিষ্ঠুরতার প্রতিনিধি, গোবিন্দমাণিক্য তেমনই করুণার প্রতিনিধি। রঘুপতিও এক হিসাবে দেশাচারের রাজা ; সেখানে তাঁহার শক্তি কোনও রাজা অপেক্ষাই হীন নহে।

'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটকে রাজার যে দুইটি গুণ রবীন্দ্রনাথ এক দেহেই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার পরবর্তী কোন কোন নাটকে তাহার পরিবর্তে সাধারণতঃ দুইটি চরিত্রের মধ্য দিয়া দুইটি গুণ প্রকাশ করা হইয়াছে—এইভাবে এই দুইটি চরিত্র একে অন্যের পরিপূরক (Complement) হইয়াছে। 'রাজা ও রাণী' নাটকের রাজা চরিত্র নিষ্ঠুরতার দিকটি প্রকাশ করিয়াছে, রাণী চরিত্র করুণার গুণটি প্রকাশ করিয়াছে, 'বিসর্জনে' রাজা গোবিন্দমাণিক্য করুণার গুণ এবং রঘুপতি নিষ্ঠুরতার দিকটি প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু একমাত্র গোবিন্দ-মাণিক্যের মধ্যেই রাজা চরিত্রের উক্ত দুইটি দিক প্রকাশ করিবার যে সুযোগ ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহার যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তাঁহার মধ্যে করুণা গুণটিই প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্রমাণিক্য এবং রঘুপতিকে দণ্ড দিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই দণ্ডদানের মধ্যে নিষ্ঠুরতার স্পর্শ ছিল না, বরং তাহার সঙ্গে করুণার সংমিশ্রণ হইয়া যথার্থ দণ্ডও লাঘব করিয়া দিয়াছে। ইহার কারণ, একই নাটকে নিষ্ঠুরতার প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য আরও দুইটি চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা রঘুপতি এবং রাণী গুণবতী। সেইজন্য রাজা গোবিন্দমাণিক্য কারুণ্যেরই প্রতিনিধিত্ব করিয়া গুরুপাপে লঘু রাজদণ্ড দিয়াছেন।

'মালিনী' নাটকেও রাজা চরিত্র আছে, কিন্তু দ্বিধা বিভক্ত চরিত্র সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্করের মধ্য দিয়া যথাক্রমে কারুণ্য ও নিষ্ঠুরতার দুইটি চরিত্রগুণ প্রকাশ পাইয়াছে।

অধ্যাত্মলোকে উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ যে নাটকখানি রচনা করেন, তাহার নাম 'প্রায়শ্চিত্ত'। এই নাটকের রাজা-চরিত্র প্রতাপাদিত্যের মধ্য দিয়া রাজার নিষ্ঠুরতার নির্মমতম রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে। রাজার হাতে যে শক্তি থাকে, তাহা যথেচ্ছচারিতায় নিয়োজিত হইলে তাহার আশ্রিত সমাজ ও ব্যক্তির দুর্দশা যে কত মর্মান্তিক হইতে পারে, ইহাতে রবীন্দ্রনাথ তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন। রাজার বাহুতে যে শক্তি আছে, তাহা যে দিকে নিয়োজিত হয়, তাহার উপরই সমাজের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নির্ভর করে। রাজা প্রতাপাদিত্যের আচরণের মধ্য দিয়া তাহা দেখা গিয়াছে। নিষ্ঠুরতায় তাঁহার কোন দ্বিধা কিংবা সংকোচ নাই, তাঁহার কোন উদ্দেশ্যও নাই। শক্তিমত্ততা স্বৈরাচারী শাসকদিগকে কি ভাবে যে সকল বিষয়ে অন্ধ করিয়া তুলে, এই বিষয়ক সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাও ইহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের নিষ্ঠুরতার পার্শ্বেই আর এক রাজার করুণাগুণ মানব-কল্যাণে স্বতঃউৎসারিত হইয়া পড়িতেছে—তিনি রাজা বসন্ত রায়। উভয় চরিত্র মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার এক অখণ্ড রাজার চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

'প্রায়শ্চিত্ত' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাট্যের প্রাক্-আধ্যাত্মিক যুগের অবসান হইয়া আধ্যাত্মিক যুগের সূচনা হইল। রাজা চরিত্রও এই পার্থিব জগতের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া অপার্থিব লোকে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার পরবর্তী কালে রচিত 'রাজা' নাটকের রাজা অন্ধকারে অবস্থান করিয়াছেন; 'ডাকঘরে'র রাজা অদৃশ্য, 'রক্তকরবী'র রাজাও জালের অন্তরালে বাস করিয়াছেন। ইহার পূর্ববর্তী যুগে রচিত যে সকল কাহিনী অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাহাদের মধ্যেই রাজা চরিত্রের পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে, মৌলিক কোন নাটকের মধ্যেই রাজার কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রকাশ পায় নাই।

এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'রাজা' নাটকের রাজা-চরিত্রে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ ঐশ্বরিক শক্তি আরোপ করিয়াছেন; পূর্ববর্তী কোন নাটকের রাজা চরিত্রের মধ্যে যে সদ্‌গুণই আরোপ করুন না কেন, তাহা সকলই পার্থিব গুণ, ঐশ্বরিক গুণ নহে। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরবোধ বলিতে যাহা বুঝায়, রবীন্দ্র-মানসে তাহা তখনও বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। এ কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথের নাটকের কাহিনীগুলি হইতে দেখা যায় যে, তিনি রাজতন্ত্রে সুগভীর

বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহার প্রায় সকল নাটকের মধ্যেই প্রধান চরিত্ররূপে রাজা চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে, তথাপি সর্বক্ষেত্রেই এই রাজা ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী নহেন, কেবলমাত্র 'রাজা' নাটক হইতেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্র-মানসে এই ঈশ্বরবোধ তাঁহার 'রাজা' ও 'ডাকঘর' নাটকে যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, সে যুগেরও অন্যান্য নাটকে সে ভাবে প্রকাশ পায় নাই। 'রাজা' ও 'ডাকঘরে'র রাজা এবং রক্তকরবীর রাজা এক নহে; 'রক্তকরবী'র রাজাকে ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী বলিয়া মনে করা সঙ্গত হয় না। কারণ, তিনি আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত। তাঁহার সংশয়, দ্বিধা, সংকোচ সকলই আছে, ইহা কখনও ঈশ্বরের গুণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না; 'রাজা'র রাজা ও 'ডাকঘরে'র রাজার তাহা নাই, তাঁহাদের সংশয়-দ্বিধা-সঙ্কোচবিহীন আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির অধিকার তাঁহাদিগকে যথার্থই ঐশ্বরিক গুণে ভূষিত করিয়াছে। কিন্তু মকর রাজের মধ্যে যে সেই গুণ প্রকাশ পায় নাই, তাহা সত্য। তথাপি তিনি নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করেন নাই। অন্তরালেই সর্বদা তিনি বাস করিয়াছেন, 'রাজা' কিংবা 'ডাকঘরে'র রাজার সঙ্গে এই বিষয়ে তাহার কোন পার্থক্য নাই।

'রাজা' নাটকের রাজাচরিত্রে একের মধ্যেই দুইটি গুণ প্রকাশ পাইয়াছে—প্রথমতঃ তাঁহার প্রেম বা করুণার শক্তি, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার নিষ্ঠুরতার শক্তি। তিনি সুদর্শনার প্রতি যেমন প্রেম ও করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনই যখন সুদর্শনা ভ্রান্তিবশতঃ বিপথে চলিয়াছেন, তখন তাঁহাকে নিষ্ঠুর আঘাত করিয়াছেন। যথার্থ ঐশ্বরিক শক্তি বলিতে রবীন্দ্রনাথ ইহাই বুঝিয়াছেন—তাঁহার প্রেম এবং করুণার যেমন তুলনা নাই, তেমনই তাঁহার শক্তিরও অন্ত নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মত তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দুই গুণই সমানভাবে প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন যেমন শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের মধ্যে ঈশ্বরের সর্বশক্তি বিধৃত বলিয়া স্বীকার করে, তিনি তাহা করেন না; তাঁহার রাজা অরূপ রতন। সুনির্দিষ্ট কোন রূপকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার পরিচয় প্রকাশ পায় না, অথচ প্রকৃতির নানা খণ্ডরূপের মধ্য দিয়া তাঁহার শক্তি বিকাশ লাভ করে। যে একটি রূপের মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখিতে চায়, সে তাঁহাকে কদাচ দেখিতে পায় না। অন্তর্লোকের ধ্যানের মধ্যে তাহাকে পাওয়া যায়, কিন্তু বহির্বিশ্বের কোন বস্তুরূপের মধ্যে তাঁহার সন্ধান মিলে না।

'রাজা' নাটকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের রাজা পরিকল্পনার পূর্ণতম বিকাশ হইয়াছে। পার্থিব জগৎ হইতে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র দস্যুদলের রাজার চরিত্র অবলম্বন করিয়া যাহার প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল, অপার্থিব লোকের 'রাজা' নাটকের রাজা চরিত্রের মধ্যে তাহার পূর্ণতম পরিণতি দেখা গিয়াছে। রাজা'র পরও 'ডাকঘর' নাটকে রাজার অস্তিত্ব আছে সত্য, কিন্তু তিনি সেখানে সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় লোকে বাস করিয়াছেন। অন্যে তাঁহার বাণী বহন করিয়াছে, কিন্তু তিনি স্বয়ং সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যদিও কাহিনীর মধ্যে তাঁহার প্রভাব এজ'ন্য বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তথাপি এ'কথা সত্য 'রাজা' নাটকের রাজা-চরিত্রের মত তাহার এত সক্রিয়তা নাই। 'রক্তকরবী'র রাজার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মকররাজ সেখানে নন্দিনীর নিকট শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। 'রাজা' নাটকের রাজা-চরিত্র কিংবা 'ডাকঘর' নাটকের রাজা-চরিত্রের গৌরব তাহাতে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং যে রাজা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল নাটকেরই অপরিহার্য চরিত্র, তাহার পূর্ণতম রূপ তাঁহার 'রাজা' নাটকের রাজা-চরিত্র। এখানেই রবীন্দ্রনাথের রাজা-চরিত্রের চরম বিকাশ দেখা যায়।

রাণী

রাজা চরিত্রের মতই রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক নাটকেই বিভিন্ন নামে রাণীরও একটি চরিত্র অনিবার্যরূপেই, আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তবে রাণী চরিত্রের পার্থিব গুণ প্রায় সর্বত্রই রক্ষা করিবার প্রয়াস দেখা যায়; এমন কি, রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকের যুগে রাজা চরিত্র অলোকচারী হইলেও রাণী চরিত্রের বাস্তবধর্ম অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষা পাইয়াছে। বাস্তবধর্মী নাটক রচনার যুগে অনেক ক্ষেত্রেই রাণী চরিত্র আদর্শায়িত হইয়া উঠিলেও পার্থিব জীবনের পরিবেশ হইতে তাহা কদাচ মুক্ত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ নারীচরিত্রের সার্থকতার মধ্যে যে দুইটি প্রধান গুণের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা প্রথমত তাঁহার কল্যাণী শক্তি এবং দ্বিতীয়ত তাঁহার মাতৃত্ব; নাটকের রাণী চরিত্রের মধ্য দিয়াও নারীর এই দুইটি গুণই বিকাশ লাভ করিয়াছেন। মাতৃত্বের মধ্যে একদিকে যেমন তাহার পূর্ণতা, কল্যাণীশক্তি বিকাশের মধ্য দিয়া তেমনই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। কেবল মাত্র একটি ক্ষেত্রে নারীচরিত্রের মধ্যে ইহার যে ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহা

পাশ্চাত্ত্য অনুকরণজাত, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পরিকল্পনা-প্রসূত নহে। তাহা 'রাজা ও রাণী'র রেবতীর চরিত্র। সেইজন্য এই নারীচরিত্রটি রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমের মত হইয়া আছে। 'বিসর্জনে'র গুণবতীর চরিত্রের মধ্যে মাতৃত্বের ক্ষুধা তাহার আচরণকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল। এখানে তাঁহার চরিত্রে যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণজাত নহে, বরং নারীজীবনের পূর্ণতার মধ্যে তিনি যে মাতৃত্বের সন্ধান করিয়াছেন, এখানে তাহার অভাবেই এই চরিত্রটি এমন ক্রূর প্রকৃতির হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা রবীন্দ্রনাট্যের নারীচরিত্রের মূল আদর্শের বিরোধী নহে। সুতরাং সাধারণভাবে ইহাই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাট্যে রাজা চরিত্র যেমন বিশেষ কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতিনিধি নহে বরং মানব-মনের চিরন্তন একটি ভাব-পরিকল্পনা মাত্র, রাণী চরিত্রও তেমনই কোন বিশেষ রাজ্যের বিশেষ কোন রাজার মহিষী-চরিত্র নহে, বরং তাহার পরিবর্তে চিরন্তনী নারীর কামনা-বাসনার প্রতিনিধি মাত্র।

পূর্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন নামে বিভিন্ন নাটকে এই চরিত্রটির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু গুণগত কিংবা কাহিনীতে তাহার অবস্থানের দিক দিয়া বিচার করিলে তাহার মধ্যে রাণীচরিত্রেরই মূল্য প্রকাশ পাইবে। রাজা চরিত্রের সঙ্গে সর্বদাই রাণীচরিত্রের আদর্শগত বিরোধ সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং এই বিরোধের মধ্য দিয়াই কাহিনীর নাটকীয় গুণ প্রকাশ পায়। রাণী সর্বদাই যে রাজাকে সত্যের পথ নির্দেশ করিয়া তাঁহার আদর্শের উপর জয় লাভ করিতে পারেন, তাহা নহে, রাজার চরিত্রই সবদা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া রাণীকেও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। তবে রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকে রাজা যেখানে ঈশ্বরের স্তরে উন্নীত হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার সমকক্ষ চরিত্র স্বভাবতঃই আর কিছুই নাই। সেক্ষেত্রে তিনিই রাণীর ভ্রান্তি দূর করিয়াছেন।

'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটকে করুণারূপিণী সরস্বতীর চরিত্রের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাট্যের রাণী-চরিত্রের যে মৌলিক গুণ, তাহা সর্বপ্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। করুণাই রবীন্দ্রনাট্যের রাণী-চরিত্রের প্রধানতম গুণ, প্রেম নহে কিংবা শক্তিও নহে। নারীচরিত্রের এই গুণই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাটক 'রাজা ও রাণী'র সুমিত্রা চরিত্রের মধ্যে প্রসারলাভ করিয়াছে এবং ইহারই ধারা রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ রোমান্টিক নাটক 'রক্তকরবী'র নন্দিনী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

'বিসর্জন' নাটকের রাণী গুণবতীর চরিত্রের সঙ্গে 'রাজা ও রাণী' নাটকের রাণী সুমিত্রা চরিত্রের কতকগুলি বিষয়ে ঐক্য আছে। উভয় রাণীই নিঃসন্তানা। কিন্তু 'রাজা ও রাণী'র সুমিত্রা যেমন নিজের প্রজাদিগকে সন্তান রূপে গ্রহণ করিয়া নিজের একান্ত মাতৃত্বের ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন, 'বিসর্জনে'র গুণবতী তাহা পারেন নাই। সেখানে তাহার একান্ত স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত স্নেহ-বোধ তাহার নিজস্ব গর্ভজাত সন্তানের জন্য সুরক্ষিত ছিল। সেইজন্য তিনি হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সুমিত্রা তাঁহার মাতৃস্নেহ শত শত প্রজার কল্যাণে বিতরণ করিয়া নিজের সন্তানের অভাব যথার্থই পূর্ণ করিয়াছিলেন। 'বিসর্জন' নাটকে প্রকৃত বিবোধ সৃষ্টি হইয়াছে রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে, রাজা ও রাণীর মধ্যে ততটা নয়। রঘুপতি দেশাচারের প্রতিপালক, সুতরাং সেও এক ক্ষেত্রে রাজার তুল্য শক্তিব অধিকারী, এই ক্ষেত্রে করুণার প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য তাঁহার বিরোধী শক্তি গোবিন্দমাণিক্যেব আবশ্যক হইয়াছে। ইহার জন্য কোন রাণী চরিত্র পরিকল্পনা সম্ভব হয় নাই। তবে 'বিসর্জন' নাটকে যে অর্পণা চরিত্র আছে, তাহার মধ্য দিয়াও রবীন্দ্র-নাট্যের রাণী চরিত্রের মৌলিক গুণ অনেকাংশে বিকাশ লাভ করিয়াছে। কারণ, অপর্ণা সত্য, অহিংসা ও প্রেমের সিংহাসনে অভিষিক্ত রাণী ব্যতীত আর কিছুই নহে, তবে তাহার চরিত্র সেই অনুযায়ী পরিস্ফুট হয় নাই। 'মালিনী' নাটকে স্বতন্ত্র রাণী চরিত্র থাকিলেও মালিনী চরিত্রই নায়িকার প্রাধান্য লাভ কবিয়াছে। তাঁর চরিত্রের সঙ্গে 'রাজা ও রাণী'র সুমিত্রা চরিত্রের গুণগত ঐক্য আছে। প্রজাদিগকে সন্তান রূপে গ্রহণ করিয়া উভয়েই তাহাদের নারী জীবনের মাতৃত্বেব অভাব পূর্ণ করিয়াছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের রাজবধূ সুরমা এবং রাজকন্যা বিভা চরিত্রের মধ্য দিয়া নারীচরিত্রের শাশ্বত করুণাগুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। যদিও এই নাটকেও স্বতন্ত্র রাণী চরিত্র আছে, তথাপি রবীন্দ্রনাট্যের রাণী চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ রাজকন্যা বিভার ভিতর দিয়াই সর্বাধিক প্রকাশ পাইয়াছে। বিভা যশোরের রাজকন্যা হইলেও চন্দ্রদ্বীপের রাণী, সুতরাং তাহার পরিচয়ও এখানে অভিন্ন রহিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সাঙ্কেতিক ও রূপক নাটক রচনার যুগে স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত রাজা চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং রাণী যেখানে আছে, সেখানে গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছে মাত্র। একমাত্র 'রাজা' নাটক অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম। এখানে রাজা পরমাত্মা এবং রাণী জীবাত্মার প্রতীক্। 'রাজা' নাটক তাহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের একমাত্র 'ডাকঘর' নাটকের মধ্যে রাণীর কিংবা তাহার সমধর্মী কোন চরিত্র সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ইহার প্রথম কারণ, রাজার চরিত্রও এখানে অনুপস্থিত এবং রাজতন্ত্রভিত্তিক কাহিনীর উপর ইহার কাহিনীর পরিকল্পনা করা হয় নাই; বরং তাহার পরিবর্তে অনেকটা বাস্তবধর্মী গার্হস্থ্য-জীবনের পরিবেশে এই কাহিনীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু সাঙ্কেতিক এবং রূপক নাটক রচনাব যুগের শেষ প্রান্তে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ যে 'রক্তকরবী' নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি স্ত্রীচরিত্রের মধ্য দিয়া তাঁহার রাণী চরিত্রের বিশেষত্ব শেষবারের মত আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; তাহা নন্দিনীর চরিত্র। নাট্যকাহিনীর মধ্যে রাণী চরিত্র নাই, নন্দিনী চরিত্রই রাণী চরিত্রের অভাব পূর্ণ করিয়াছে। তবে নন্দিনী চরিত্রের মধ্যে করুণাগুণ যত বিকাশ লাভ করিয়াছে, তদপেক্ষা সৌন্দযগুণ অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধের মধ্যে করুণাগুণের অভাব আছে, তাহা নহে; তবে নন্দিনীর মধ্যে সৌন্দযের প্রকাশ করুণাগুণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সরস্বতী এবং 'রাজা ও রাণী'র সুমিত্রা চরিত্রেব সঙ্গে নন্দিনী চবিত্রের বহির্মুখী সাদৃশ্য আছে। বিহারীলালের প্রভাবজাত করুণারূপিণী সরস্বতীর যে পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্যে প্রথম বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহাই জীবনের বিভিন্ন পর্ব অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত সৌন্দযরূপিণী নন্দিনী চরিত্রের মধ্যে আসিয়া চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। নন্দিনী মকররাজের সংশয় দূব করিয়াছে, সুমিত্রা আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া রাজা বিক্রমদেবকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নন্দিনী ভূমিকা-লিপির পরিচয়ে রাণী নহে, কিন্তু কার্যতঃ রাণীর আচরণই সে করিয়াছে। সে সত্য এবং সৌন্দর্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাণী ব্যতীত আর কি? এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল নাটকেই রাজা চরিত্রের মধ্যে যেমন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, রাণী চরিত্রের মধ্যেও করুণার সন্ধান দিয়াছেন।

বাউল

রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি এবং সেই সূত্রেই একান্ত আত্মভাবপরায়ণ বা Subjective। নাটকের যে আত্মনির্লিপ্ততার গুণ আবশ্যক, তাহা তাঁহার নাটকের মধ্যে নাই। কখনও বিভিন্ন চরিত্রের মুখে, কখনও বা একটি বিশেষ

চরিত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিজস্ব বক্তব্য বা মনোভাব তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তিনি কদাচ গোপন করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে কিংবা অন্যান্য বিভিন্ন রচনায় যে জীবন ও সৌন্দর্যবোধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নাটকের মধ্যেও নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করিয়া রবীন্দ্রনাট্যে এই ভাবটি বিকাশ লাভ করিয়াছে। প্রধানতঃ যে চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট মনোভাবটি নাটকের মধ্যে ব্যক্ত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহা বাউল নামে পরিচিত। তবে রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটক রচনার যুগের পূর্বে বাউল নামটি তিনি ব্যবহার করেন নাই, অন্য নামে তাহাকে উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু আচার-আচরণের দিক দিয়া তাহার সঙ্গে রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক রচনার যুগের বাউল চরিত্রের কোন পার্থক্য নাই। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বাল্মীকি চরিত্রের মধ্যেই সর্ব প্রথম ইহার উন্মেষ দেখা দিয়াছিল। ইহার প্রথম প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ বিহারী-লালের 'সারদামঙ্গলে'র মধ্যেই পাইয়াছিলেন। বিহারীলাল যে তাহার 'সারদামঙ্গলে'র বাল্মীকি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন,

'ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাব-ভোলা মনে।'

ইহার মধ্যেই রবীন্দ্রনাট্যের বাউল চরিত্রের জন্ম হইয়াছিল। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় বাল্মীকির এই বাউল রূপ ইহারই অনুসরণে পরিকল্পিত হইয়াছিল—

বাল্মীকি। ব্যাকুল হয়ে বনে বনে,
ভ্রমি একেলা শূন্য মনে।
'কে পূরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধা বরিষণে।

পূর্বেই বলিয়াছি, বাউল নামটি সাঙ্কেতিক-রূপক নাটক রচনার যুগে ব্যবহার করিলেও ইহার পূর্ববর্তী যুগে বাউল চরিত্রের গুণটুকু তিনি অন্যান্য চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বিষয়-নিস্পৃহ সত্যদর্শী মাত্রই বাউল; রবীন্দ্র-প্রকৃতির মধ্যে ইহার প্রেরণা ছিল, রবীন্দ্রনাথও বাউলের সাধনায় সিদ্ধ। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের সন্ন্যাসী চরিত্রের মধ্যে এই বাউলের পরিচয় সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট আকার লাভ করিয়াছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সন্ন্যাসীই রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাউল চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের বাউলের বিশেষত্ব এই যে, সে মনের মধ্যে মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়ায় না, বরং তাহার পরিবর্তে পার্থিব জীবনের মানবিক সম্পর্কের প্রত্যক্ষ বন্ধনের ভিতর দিয়া ভগবানের

অস্তিত্ব অনুভব করে। এখানে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম তাহার আধ্যাত্মিক শক্তির উপর জয় লাভ করিয়াছে। ‘বাল্মীকি-প্রতিভা’য় বাল্মীকি যেমন জীবের প্রতি করুণায় বাউল হইয়াছিলেন, ‘প্রকৃতির প্রতিশোধে’র মধ্য দিয়াও সন্ন্যাসী মানুষের প্রতি করুণায় বাউলের মত আচরণ করিয়াছেন। এমন কি, রবীন্দ্রনাথ যখন আধ্যাত্মিক লোকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া রূপক এবং সঙ্কেতধর্মী নাটক রচনা করিয়াছেন, তখনও বাউলের মধ্যে প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবনের কথাই শুনিতে পাওয়া গিয়াছে—ইহা হইতে মুক্ত হইয়া কোন আধ্যাত্মিক মার্গে তাহা উন্নীত হইতে পারে নাই। ইহাই কবি-প্রকৃতি। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে বাংলার বাউল আত্মার মধ্যে ভগবানের সন্ধান করিয়াছে; কিন্তু রবীন্দ্র-নাটকের বাউল সর্বদাই মর্ত্যচারী। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, কবি রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট জীবন-দর্শন এই চরিত্রটি অবলম্বন করিয়াই সর্বত্র বিকাশ লাভ করিয়াছে।

বাউলের গুণ সর্বদাই যে রবীন্দ্র-নাটকে পুরুষ-চরিত্র অবলম্বন করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা নহে—অনেক সময় কোন কোন স্ত্রীচরিত্র অবলম্বন করিয়াও তাহা বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই সম্পর্কে ‘বিসর্জনে’র অপর্ণা এবং ‘মালিনী’ নাটকের মালিনী চরিত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। গৃহ-স্নেহ-বন্ধনহীন এই নারীচরিত্র দুইটির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত বাউল চরিত্রেরই গুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। তারপর ‘বিসর্জনে’র রাজা গোবিন্দ-মাণিক্যের চরিত্রের মধ্যেও রাজোচিত দৃঢ়তার অভাব, মানব-প্রেম এবং সর্বসংস্কার মুক্তির যে প্রেরণা সক্রিয় দেখা যায়, তাহা রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত বাউল চরিত্রেরই গুণ। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এই সকল বাউল চরিত্রের মধ্য দিয়া মানবপ্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথই সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

‘রাজা ও রাণী’ নাটকের মধ্যে দেবদত্ত চরিত্র অনেকখানি বাউল চরিত্রেরই অনুরূপ আচরণ করিয়াছে। বাউলের মত দেবদত্তও সত্যদর্শী, মানব-প্রীতিতে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাট্য রচনার প্রথম যুগে সঙ্গীত প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া এই শ্রেণীর চরিত্রের মুখে রবীন্দ্রনাথ তখনও সঙ্গীত আরোপ করেন নাই; রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটক রচনার যুগে এই শ্রেণীর চরিত্রের মুখে সঙ্গীত আরোপ করিয়া বাউলের রূপটি তাহাদের মধ্যে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী এবং বসন্ত রায় চরিত্র দুইটির মধ্যে রবীন্দ্রনাট্যের বাউলের পরিকল্পনা স্পষ্টতর রূপ লাভ করিয়াছে। বসন্ত রায়

রাজকুমারী বিভার ঠাকুরদা, সেই সূত্রে তাহার পরবর্তী নাটকগুলিতে বাউলধর্মী চরিত্রের আর একটি পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা ঠাকুরদা। অবশ্য 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনার মাত্র এক বৎসর পূর্বে রচিত 'শারদোৎসব' নাটকে সন্ন্যাসী চরিত্রে বাউলের রূপ এবং ঠাকুরদার চরিত্রে পরবর্তী ঠাকুরদার রূপটি প্রথম দেখা যায়। তারপর হইতে বাউল এবং ঠাকুরদা কখনও কখনও দ্বিধা বিভক্ত চরিত্র, কখনও বা একই অখণ্ড চরিত্র, উভয়ের মধ্য দিয়াই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কবি-মনোভাব সমান ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বসন্ত রায় ঠাকুরদা রূপে এবং ধনঞ্জয় বৈরাগী স্ব-রূপেই রবীন্দ্রনাথের এই যুগের নাটকগুলির মধ্য দিয়া সর্বত্র বিচরণ করিয়াছে। তবে ঠাকুরদার মধ্যে সত্যোপলব্ধির আনন্দ এবং বাউলের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে; একদিকে অনুভূতির আনন্দ, আর একদিকে সত্যাগ্রহের উল্লাস অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এই বাউলই 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে দিয়া বিশু পাগলায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, বিহারীলালের সেই 'ভাবে ভোলা' বাল্মীকি রবীন্দ্র-কবিমানসে যে অক্ষয় আসন অধিকার করিয়াছিল, তাহার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের সকল নাটকের মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

১৭

রবীন্দ্রনাট্যে সঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথের নাটকে সঙ্গীতের যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, তাহা সকলেই জানেন; ইহাও একটি ধারা অনুসরণ করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই ধারার প্রকৃতিটি কি, তাহা একটু সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা যাইতে পারে।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে গীতিনাট্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন, যেমন 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড' প্রভৃতি, ইহাদের কাহিনী আদ্যোপান্ত গীতিসুরে বাঁধা, সেইজন্য যদিও এখানে সেখানে স্বতন্ত্রভাবে সঙ্গীতও তাহাদের মধ্যে রচিত হইয়াছে, তথাপি তাহা কোন স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে নাই, গীতিসুর-ভারাক্রান্ত কাহিনীর ধারার মধ্যে তাহা একাকার হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে যে গীতি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ভাবমূলক নহে, বরং বর্ণনামূলক, কাহিনীব ধারা ইহাদের মধ্য দিয়া যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, চরিত্রের কোন ভাব তাহার ভিতর দিয়া সার্থকভাবে তত ব্যক্ত হয় নাই। ভাবকেন্দ্রিক নহে বলিয়াই সঙ্গীতগুলি অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘ রচনা এবং সুরের পরিবর্তে কথার উপরই ইহাদের মধ্যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনার সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সঙ্গীত সাধনায় এক নূতন যুগের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতিপূর্বে গতানুগতিক পথেই তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শৈশবের সঙ্গীত শিক্ষার মধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্পর্কে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, এই যুগেই তাহার প্রতি তাঁহার অন্ধ আনুগত্যের মোহ দূর হইয়া গেল। সঙ্গীত-রচনার এক অভিনব পদ্ধতি তিনি এই যুগে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পিয়ানোতে এক একটি সুর বাজাইয়া তুলিতেন, তাহাতেই কথার যোজনা করিয়া গান রচিত হইত। অর্থাৎ পিয়ানোর সুরে তখন রবীন্দ্রনাথ বাংলা গান রচনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সম্পর্কে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহা দ্বারাও অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। প্রবন্ধটি 'The Origin and Function of Music', স্পেন্সার কর্তৃক রচিত প্রবন্ধটি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের *Fraser's Magazine*-এ প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধটিতে সঙ্গীত সম্পর্কে নূতন যে চিন্তা প্রকাশিত হয়, তাহা রবীন্দ্রনাথকে এই বিষয়ে প্রভাবিত করে।

নূতন সুর-ভাবনাকে রূপ দিবার জন্যই রবীন্দ্রনাথকে তখন 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটক রচনা করিতে হয়। কেবলমাত্র স্পেন্সর নির্দেশিত পথই নহে, রবীন্দ্রনাথ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহার মধ্যে সঙ্গীত বিষয়ে আরও নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছেন। তবে একথা সত্য, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সঙ্গীত রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুর যোজনা করিয়াছিলেন এবং তাহার উপর রবীন্দ্রনাথ কথা যোগ করিয়াছেন; তবে সুরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি না থাকিলে তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইত না। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সম্পর্কে তাঁহাব 'জীবন-স্মৃতি'তেও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'ইহা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সঙ্গীতের একটি নূতন পরীক্ষা।' ইহার মধ্যে গদ্যসংলাপ নাই, আদ্যোপান্ত সঙ্গীতেই ইহা রচিত। কিন্তু ইহার সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'ইহা সুরে নাটিকা;' অর্থাৎ সঙ্গীত ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টিকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পই আছে।

ইহার সুরের মধ্য দিয়া বাংলার সঙ্গীত জগতের এক নূতন দিঙ্‌মণ্ডল উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। মার্গসঙ্গীতের বন্ধন হইতে এখানেই প্রথম মুক্তির প্রয়াস দেখা গেল। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রথম সোপান ইহার মধ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল। 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সম্পর্কে উল্লেখিত হইয়াছে, 'ইহা এক হিসাবে সঙ্গীত-জগতের একটা বিপ্লব, কারণ, ওস্তাদের মতে মার্গ সঙ্গীতের বিশুদ্ধ ঠাট ভঙ্গ করায় গানের আভিজাত্যই নষ্ট হইয়াছিল। ইহার উপর ইহারা নিজেদের যদৃচ্ছাক্রমরচিত সুর বসাইলেন, বিলাতি সুরেরও প্রয়োগ করেন বাংলা গানে। এই সব অভিনবত্ব যে কত বড় সঙ্গীত-দ্রোহিতা তাহা আজ আমাদের কাছে সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে না; কারণ, গান এখন বহুসুরগ্রাহী হইয়াছে (পৃ ১০০)।'

বাংলা গানে বিদেশী সুর প্রয়োগের রীতি রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনার পর আর বেশি দূর পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলেন না। কারণ, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন, ইহা বাংলা গানের পক্ষে উপযোগী হইবে না। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম বাংলার লোক-সঙ্গীতের

সুরেও কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী সঙ্গীত রচনায় বাংলার লোক-সঙ্গীতের সুরকেই নিজের সঙ্গীত রচনায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, বিদেশী সুরকে ক্রমে সম্পূর্ণ বর্জন করিলেন। সুতরাং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' সঙ্গীত রচনার দিক দিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষারই যুগ এবং এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া তিনি যে শিক্ষা ও সুর-চেতনা লাভ করিলেন, পরবর্তী সঙ্গীত রচনায় তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

গীতিনাট্যের যুগ অতিক্রম করিয়া যখন রবীন্দ্রনাথ নাট্যকাব্য রচনার যুগে প্রবেশ করিলেন, তখন সঙ্গীত অনেকখানি সংযত হইয়া কাব্যসংলাপই প্রাধান্য লাভ করিল। কারণ, সেই যুগের রচনা প্রধানতঃ কাহিনীমূলক, ভাবমূলক নহে; যদিও একথা সত্য যে, একটু একটু করিয়া এক একটি ভাব বা 'আইডিয়া' তাহাদের মধ্যে সবে মাত্র মুকুলিত হইতেছে। প্রধানতঃ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' হইতে 'মালিনী' রচনা পর্যন্ত এই যুগ প্রসারিত হইয়াছে। এই যুগের নাটক প্রত্যক্ষ জীবনের বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এবং রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় কাব্য-ভাষায় রসস্নাত। সেইজন্য সঙ্গীত ইহাতে আসর জমাইবার অবকাশ লাভ করিতে পারে নাই; যেখানে বস্তুর দৈন্য, সেখানেই ভাবের প্রাবল্য এবং সেখানেই সঙ্গীতের বাহুল্য। রবীন্দ্র-সাধনার দিক দিয়াও তাহা সঙ্গীত রচনার যুগ ছিল না। এই জীবনে কবি প্রত্যক্ষ জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হইতেই জীবনের রস এবং রহস্যের সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার 'গল্পগুচ্ছ' 'ছিন্নপত্র' প্রভৃতি গদ্য-রচনাএবং কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস এই যুগেই রচিত; সুতরাং সঙ্গীতের প্রেরণা তখন তাঁহার মধ্যে অনেকখানি গৌণ হইয়া পড়িয়াছিল।

নাট্যকাব্য রচনার যুগ উত্তীর্ণ হইয়া রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনার ভিতর দিয়া যখন তাঁহার রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটকগুলি রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বস্তু জগৎ এবং প্রত্যক্ষ জীবন তাঁহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন তিনি ভাবলোকে নিমজ্জিত হইয়া নূতন করিয়া সঙ্গীতের প্রেরণা লাভ করিলেন। প্রথম জীবনে যখন তাঁহার মধ্যে সঙ্গীতের প্রেরণা আসিয়াছিল, তখন তাহা লইয়া তিনি নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছেন, কোন পরিণত আদর্শে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই; কিন্তু সেই যুগে সঙ্গীত রচনার এবং সাহিত্যের প্রয়োজনে তাহাকে ব্যবহার করিবার একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তখন

নাটকের মধ্যে বস্তুর পরিবর্তে ভাব প্রাধান্য লাভ করিল, সেই সূত্রেই সংলাপের পরিবর্তে সঙ্গীত ইহার ব্যাপক অংশ অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু এই যুগের একটি নাটক ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম ; তাহা রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক 'ডাকঘর'। ইহাতে একটিও সঙ্গীত ব্যবহৃত হয় নাই। অথচ ইহাই রবীন্দ্রনাথের এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায়, গানের ভিতর দিয়া যে ভাবমূলক নাটকেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা নহে। বরং ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, এই যুগে নাটকীয় বস্তুর দৈন্য গোপন করিবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতকে ব্যবহার করিয়াছেন। গান যদি এই যুগের নাটকের সার্থকতার কিছুমাত্র কারণ হইত, তবে 'ডাকঘর' কখনও সার্থক নাটক হইতে পারিত না।

রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটকের বস্তুগত দৈন্য গোপন করিবার জন্য এই যুগের নাটকে বহু সঙ্গীত ব্যবহৃত হইলেও সঙ্গীতগুলি যে নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হইতে পারে নাই, তাহা অতি সহজেই অনুভব করা যায়। অনেক সময় সঙ্গীতগুলি নাটকীয় পরিস্থিতি-নিরপেক্ষ স্বাধীন ভাবমূলক সঙ্গীত মাত্র। সেইজন্যই দেখা যায়, একই সঙ্গীত বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহাদের জন্য রচিত সঙ্গীতগুলি অন্যত্রও স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে কোন বাধা হয় নাই। 'রাজা' নাটকের সঙ্গীতই প্রধানত 'গীতাঞ্জলি'র সঙ্গীত ; 'রাজা' নাটক 'গীতাঞ্জলি'র নাট্যরূপ মাত্র—ইহারা পরস্পর স্বাধীন নহে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত সামাজিক নাটকের মধ্যে যে সকল হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষ আবেদন আছে। তবে ইহারা নৈর্ব্যক্তিক ভাবমূলক নহে, বাস্তব জীবনের সুকোমল স্পর্শে স্নিগ্ধোজ্জ্বল, ইহাদের মূল্য স্বতন্ত্র।

১৮

রবীন্দ্রনাটকের ভাষা

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটক রচনার ভিতর দিয়া গীতি, কাব্য ও গদ্য এই বিভিন্নধর্মী সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন। এই বিভিন্নধর্মী সংলাপই বিভিন্ন নাটকের মধ্য দিয়া একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, কোনখানে আসিয়াই স্থির হইয়া পড়িয়া কোন অবিচল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে নাই।

রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার প্রথম যুগ গীতিনাট্য রচনার যুগ। এই যুগে নাটকের মধ্যে যে তিনি সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা গীতিকবিতা, গদ্যও নহে কিংবা কাব্যও নহে। রবীন্দ্রনাথ এই যুগে রচিত তাঁহার 'ভগ্নহৃদয়' নাটককে গীতি-কাব্য (lyric poem) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গীতি কবিতা বলিলেই ইহার পরিচয় আরও স্পষ্ট হইতে পারিত। পরবর্তী নাটকাব্য রচনার যুগে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা সেই ভাষা নহে। ইহা গীতি-কবিতারই ভাষা। কবিতার অনুযায়ীই ইহাতে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করা হইয়াছে—

চপলা। সখি, তুই হলি কি আপন-হারা?
এ' ভীষণ বনে পশি একেলা আছিস বসি
খুঁজে খুঁজে হয়েছি যে সারা।
এমন আঁধার ঠাঁই জনপ্রাণী কেহ নাই,
জটিল-মস্তক বট চারিদিকে ঝুঁকি
দু একটি রবিকর সাহসে করিয়া ভর
অতি সন্তর্পণে যেন মারিতেছে উঁকি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহা কবিতা, নাটকীয় সংলাপের উপযোগী ভাষা নহে; সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ ইহাকে নাটক বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন। তিনি 'রুদ্রচণ্ড' সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'এই কাব্যটিকে যেন কেহ নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে; কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে,

দৃষ্টান্ত স্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল। (ভূমিকা)।' এই উক্তি এই যুগের সকল গীতি-নাট্যের পক্ষেই সত্য। নাটকের কাহিনীতে যেমন দৃঢ়তা এবং প্রত্যক্ষতার গুণ থাকা আবশ্যক, গান কিংবা কাব্যের ভাষায় তাহা থাকিতে পারে না। গানকেই এখানে ফুল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য মাত্রই শিথিল বদ্ধ ভাষায় গীতিস্বরে রচিত গানের মালিকা। ইহাদের নাট্যভাবের অস্পষ্টতার সঙ্গে এই শিথিল বদ্ধ গীতিভাষার সহজ সংযোগ সাধিত হইলেও তাহা দ্বারা নাটকের কোন গুণ আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নাই।

সমসাময়িক যুগে রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যোপন্যাস' নামক কবিতায় যে কয়েকটি কাহিনী রচনা করিয়াছেন, এই যুগের গীতিনাট্যের ভাষা তাহারই অনুরূপ। কাব্যোপন্যাস 'বনফুল' ও 'কবি-কাহিনী'র সঙ্গে এই যুগের গীতিনাট্যের ভাষার কোন পার্থক্য নাই।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' আদ্যোপান্ত সঙ্গীতে রচিত হইলেও ইহার গীতিভাষার মধ্যে সর্বপ্রথম গীতিনাট্যের ভাষার কিছু ব্যতিক্রম দেখা গেল। অন্যান্য গীতি-নাট্যের ভাষার মধ্যে সুরের কোন বৈচিত্র্য ছিল না। তাহার ফলে ঘটনাসঙ্কুল কাহিনীও সুরের দিক দিয়া একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্যে গানের ভাষা ব্যবহৃত হইলেও তাহার সুরে বৈচিত্র্য দেখা দিল। সুরে বৈচিত্র্য দেখা দিল বলিয়াই ভাষাও বৈচিত্র্যপূর্ণ না হইয়া পারিল না। বিশেষতঃ অন্যান্য গীতি-নাট্যগুলি ছিল সুর-প্রধান ; কিন্তু 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অধিকাংশ সঙ্গীতই ছিল তাল-প্রধান। তালপ্রধান এবং সুর প্রধান সঙ্গীতের ভাষায় যতটুকু পার্থক্য সৃষ্টি হইবার কথা, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সে যুগের অন্যান্য গীতিনাট্যের সেইটুকুই পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছিল।

কিন্তু এখানে একটি কথা স্বীকার করিতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়' গীতিনাট্য রচনার পরই যে 'রুদ্রচণ্ড' নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই গীতি-সংলাপেও মিত্রাক্ষরের বেড়ী প্রথম ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন ; নাটকীয় সংলাপের প্রয়োজনে ইহাতেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা অমিত্র পয়ার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। নাটকীয় সংলাপে সঙ্গীতের বন্ধন হইতে মুক্তির ইহাই প্রথম প্রয়াস। সেইজন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়'কে 'গীতিকাব্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যেই সর্বপ্রথম নাটকের অনুযায়ী দৃশ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এ কথা সত্য, 'রুদ্রচণ্ডে'র অমিত্রাক্ষর ছন্দে যতিবিন্যাস

বৈচিত্র্য না থাকায়, ইহার মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাধারণ ধর্ম বিকাশ লাভ করিয়া সংলাপের ভাষায় দৃঢ়তার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে গীতি-সুর থাকিলেও গতির প্রবাহ নাই। সেইজন্য ইহা দ্বারা নাটকীয় সংলাপ রচনাও কোন দিক দিয়াই সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—

অমিয়া। তাই যদি হত, পিতা, বড় ভাল হ'ত!
কে জানে মনের মধ্যে কি হয়েছে মোর,
বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি
বর্ষিয়া সহস্রধারে অশ্রুজলরাশি
বজ্রনাদে করিতাম আকুল বিলাপ!

ইহা যেমন প্রচলিত পয়ার ছন্দও নহে, তেমনি প্রকৃত অমিত্রাক্ষর নহে; কারণ, ইহার মধ্যে যতিবিন্যাসে বৈচিত্র্য নাই। ইহা গীতিও নহে, কবিতাও নহে। তবে ইহার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাট্যকাব্য যুগের সংলাপের কাব্য-ভাষা এবং কাব্য রচনার প্রবহমান পয়ার ছন্দের সূচনা হইয়াছিল।

'রুদ্রচণ্ডে'র পরই উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ।' ইহার মধ্যেও 'রুদ্রচণ্ডে'র কাব্যসংলাপই ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি ইহার ভাষা যে একটু দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের সংলাপের ভাষা ইহাতে স্পষ্টতর হইয়াছে, কিন্তু পূর্ণতা লাভ করিবার এখনও অনেক দেরী—

সন্ন্যাসী। এ কী ক্ষুদ্র ধরা! এ কী রঙ্গ চারিদিকে!
কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি গাছপালা গৃহ
চারিদিক হতে যেন আসিছে ঘেরিয়া,
গায়ের উপরে যেন চাপিয়া পড়িবে!
চরণ ফেলিতে যেন হতেছে সংকোচ,
মনে হয়, পদে পদে রহিয়াছে বাধা। —২ দৃশ্য

আরও একটি বিষয় 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা এই যে, ইহাতেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম তাঁহার নাটকে গদ্য সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন। সংলাপে গদ্যভাষার স্বাচ্ছন্দ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় হইয়া প্রথমেই দেখা দিয়াছে; গদ্য ভাষাকে চরিত্রানুযায়ী বাস্তবধর্মী করিয়া তুলিতেও প্রথম হইতেই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা যাইতেছে—

'স্ত্রীলোক। (ব্রাহ্মণ পথিকের প্রতি) হ্যাঁগা দাদাঠাকুর, এত ব্যস্ত হয়ে কম্‌নে চলেছ ?

ব্রাহ্মণ। আজ শিষ্যবাড়ী চলেছি, নাতনি। অনেকগুলি ঘর আজকের মধ্যে সেরে আসতে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি। তুমি কোথায় যাচ্ছ গা ?

স্ত্রীলোক। আমি ঠাকুরের পুজো দিতে যাব। ঘরকন্নার কাজ ফেলে এসেছি, মিন্‌সে আবার রাগ করবে। পথে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিগ্‌গেস পড়া করব তার জো নেই। বলি দাদাঠাকুর, আমাদের ওদিকে যে একবার পায়ের ধুলো পড়ে না।'—২য় দৃশ্য

রবীন্দ্রনাথের গদ্যসংলাপের যে বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌বৈদগ্ধ তাঁহার শেষ জীবনের গদ্যনাটকগুলিকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছিল, সেই গদ্যভাষার তখনও তাঁহার মধ্যে জন্ম হয় নাই। তবে একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথের গদ্য নাটকের ভাষার এখানেই প্রথম উদ্ভব হইয়াছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র সংলাপের ভাষা তখন পর্যন্ত গদ্যই হউক কিংবা পদ্যই হোক, পরিণত রূপ লাভ না করিলেও ইহা হইতেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার যুগের সূচনা হয়। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' হইতে 'মালিনী' পর্যন্ত এই যুগ প্রসারিত। ইহাতেই রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য রচিত হয়। এই যুগের নাটকগুলির সংলাপে যে কাব্যধর্মী ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের সমৃদ্ধতম কাব্যভাষা। সমৃদ্ধি ইহার রসে, ব্যঞ্জনায় এবং অলঙ্করণে। সুতরাং ইহা কাব্যেরই সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহার ভাষার সমৃদ্ধি নাটকীয় গুণে নহে, বরং কাব্যগুণে ; এই যুগের রচনা 'রাজা ও রাণী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমগ্র নাট্যকাব্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তিনি লিখিয়াছেন, 'এঁর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি (সূচনা)।'

নাটকীয় সংলাপের প্রত্যক্ষতার গুণ ইহা দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা কাব্যরস পিপাসা যে পরিমাণে চরিতার্থ হয়, রবীন্দ্রসাহিত্যের আর কোন রচনা দিয়াই তাহা তেমন হয় কি না সন্দেহ।

'রাজা ও রাণী' নাটকের মধ্যে এই গুণ সর্বাধিক প্রকাশ পাইয়াছে, ইহার কারণ প্রেমের কাহিনী ইহার অবলম্বন। প্রেমের বিষয়ই রচনাকে মধুরতম

করিয়া তুলিয়াছে। এই গুণ অন্যান্য নাট্যকাব্যে যে প্রকাশ পায় নাই, তাহা নহে ; কারণ, এই যুগের প্রত্যেক নাট্যকাব্যে গৌণভাবে হইলেও প্রেমের বিষয়ই অবলম্বন করা হইয়াছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র মধ্যে কাব্য-সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে যে গদ্য-সংলাপ ব্যবহারের রীতি দেখা দিয়াছিল, এই যুগের সকল নাটকের মধ্য দিয়াই তাহার ধারাও অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গদ্য-সংলাপও ক্রমে গীতিরসে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। বরং 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' গদ্যসংলাপে যতটুকু প্রত্যক্ষতার গুণ ছিল, তাহা ক্রমে পরবর্তী নাট্যকাব্যগুলির মধ্য হইতে হ্রাস পাইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে গদ্য-সংলাপের পরিমাণও হ্রাস পাইতে লাগিল। 'রাজা ও রাণী'তে যে পরিমাণ গদ্য-সংলাপ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার পরবর্তী নাটক 'বিসর্জনে' তাহার পরিমাণ সেই তুলনায় আরও অনেক হ্রাস পাইল। ক্রমে 'চিত্রাঙ্গদা' এবং 'মালিনী'তে গদ্য-সংলাপ একেবারেই লোপ পাইয়া গেল —আনুপূর্বিক কাব্য সংলাপেই এই দুইখানি নাট্যকাব্য রচিত হইল। এই যুগের নাটকীয় সংলাপের কাব্যভাষায় তিনি সর্বত্রই অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা blank verse ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে যতির বৈচিত্র্য থাকিলেও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের দৃঢ়-সংবদ্ধতা ছিল না। গীতিপথে ইহার গতি শিথিল হইয়াছিল ; সেইজন্য মধুসূদন একই ছন্দে নয় সর্গ পর্যন্ত কাব্য রচনা করিয়াও যে সুরগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ততর রচনার মধ্য দিয়াও তাহা পারেন নাই। সেক্সপীয়রের নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদর্শেই রবীন্দ্রনাথ এই যুগের নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, মধুসূদনের আদর্শে নহে ; কিন্তু সেক্সপীয়রের মধ্যেও কাব্যসংলাপে ভাষার যে দৃঢ়তা এবং নাটকীয়তা প্রকাশ পাইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের সংলাপে তাহা পাইতে পারে নাই। কারণ, রবীন্দ্রনাথের একান্ত গীতি-প্রবণতা তাহার রচিত নাট্যসংলাপে নাটকীয় দৃঢ়তা সৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছিল। সুতরাং কাব্যপাঠ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের এই যুগের নাটকীয় সংলাপগুলি যে তৃপ্তি দেয়, অভিনয় দর্শনে সেই তৃপ্তি দিতে পারে না। কারণ, অভিনয়ের দাবী ইহা অপেক্ষা আরও বেশি কিছু।

নাট্যকাব্যের সংলাপগুলি যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতা, ইহাদের মধ্যে মিল বা মিত্রাক্ষর নাই সত্য, তথাপি শব্দচয়ন-নৈপুণ্য দ্বারা এমন গীতিসুর প্রকাশ

পাইয়াছে, যাহাতে বিষয় এবং প্রসঙ্গ নিরপেক্ষ এক একটি সংলাপ শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতা রূপে সহজেই পাঠকের তৃপ্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই—

বিক্রমদেব। মৌন মুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবন মাঝে, প্রিয়তমে, লজ্জা নম্র
নববধূ সম—সম্মুখে গম্ভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার
এ কনক-কান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি—
ওই হাসি, ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে—দিবালোক তট হতে
এস, নেমে এস, কনক চরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ সাগরে।—১।৩

নাট্যকাব্য রচনার যুগের পর রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি গদ্য নাটক রচিত হয়। ইহারা যথাক্রমে 'গোড়ায় গলদ' 'বৈকুণ্ঠের খাতা,' 'হাস্য কৌতুক,' 'ব্যঙ্গ কৌতুক'। প্রকৃত পক্ষে ইহার পরই রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য যুগ অর্থাৎ রূপক ও সাঙ্কেতিক নাট্যরচনার যুগের সূচনা হয়। প্রহসনগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যসংলাপ ব্যবহার করেন। কাহিনীগুলি নাগরিক জীবন হইতে গৃহীত বলিয়া নাগরিক জীবনের শিষ্ট কথ্যভাষাই ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। যে বাগবৈদগ্ধ্য তাঁহার শেষ জীবনের নাটকীয় সংলাপে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে তখন পর্যন্ত তাহা বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। 'গোড়ায় গলদে'র সংলাপের ভাষায় পূর্ববর্তী কোন কোন বাংলা প্রহসন রচয়িতার ভাষার অনুকরণ পর্যন্ত দেখা যায়। সুতরাং ইহাদের ভাষা বিশেষত্বহীন। তবে হাস্যরসের স্নিগ্ধ ধারায় তাহা অভিষিক্ত বলিয়া তাহা দ্বারা মন সহজেই সাময়িকভাবে প্রসন্ন হইয়া যায়। তবে তাহা জীবনের মধ্যে গভীর দাগ কাটিতে পারে না। সংলাপের ভাষাতেও সেই গুণের অভাব দেখা যায়।

'গোড়ায় গলদে'র এই সকল ত্রুটি কিছু কিছু সংশোধন করিয়া পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ইহার একটি 'অভিনয় যোগ্য' সংস্করণ প্রকাশিত করেন, ইহার নাম 'শেষ রক্ষা।' ইহা ১৯২৮ সনে প্রকাশিত হয় এবং ইহাতে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গদ্য ভাষার স্পর্শ কতকটা অনুভূত হয়।

প্রহসনে গদ্যসংলাপ ব্যবহার করিবার পর হইতে রবীন্দ্রনাথ নাটকীয় সংলাপে

কাব্যভাষা ব্যবহারের রীতি পরিত্যাগ করিয়া গদ্য ব্যবহারের রীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু এই গদ্য-সংলাপের প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইতে থাকে। এখান হইতে ইহা ক্রমবিকাশের একটি ধারা অনুসরণ করিয়া পূর্ণতর রূপের মধ্যে একটি শেষ পরিণতি লাভ করে।

'শারদোৎসব' নাটককেই এই যুগের প্রথম নাটক বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। ইহার গদ্য সংলাপ স্বচ্ছ ও সাবলীল, শরৎকালের মেঘের মতই স্বচ্ছন্দগতি। কিন্তু যে কাব্যধর্মিতা রবীন্দ্রনাথের সকল রচনারই বৈশিষ্ট্য, তাহা হইতে ইহা মুক্ত নহে। প্রহসন রচনার যুগের গদ্য সংলাপে অলঙ্কার-বাহুল্য ছিল না; কারণ, ইহার জীবন ছিল বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ। কিন্তু 'শারদোৎসব' হইতে রবীন্দ্রনাট্যে যে নূতন যুগের স্থচনা দেখা দিল, তাহার জীবন রোমান্টিক। সেই অনুযায়ী তাহার গদ্য-সংলাপও কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। 'শারদোৎসবে'র মধ্যেই সর্বপ্রথম সন্ন্যাসিরূপী বাউল এবং ঠাকুরদা চরিত্রের আবির্ভাব দেখা যায়। এই যুগের সকল নাটক জুড়িয়াই তাহাদের পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আচরণ এবং সংলাপে সর্বত্র অভিন্নতা লক্ষিত হয়। অভিন্ন চরিত্রের অভিন্ন প্রকৃতির সংলাপের মধ্য দিয়া ক্রমে এই যুগের নাটকের মধ্যে সংলাপের দিক দিয়া বৈচিত্র্যহীনতা দেখা দিল।

'শারদোৎসবে'র পর ঐতিহাসিক ক্ষুদ্র নাটক 'মুকুট' আদ্যোপান্ত এই যুগের অন্যান্য নাটকের মত গদ্য সংলাপেই রচিত। ইহার ভাষায় কাব্যধর্মিতার অনেকখানি অভাব থাকিলেও ইহাকে আদর্শ নাটকীয় গদ্যসংলাপ রূপেও গ্রহণ করা যায় না। ভাষার শৈথিল্যে ইতিহাসের সুনিবিড় পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষা পাইতে পারে নাই।

তারপর 'প্রায়শ্চিত্ত' রচিত হয়। এই নাটকখানিই রবীন্দ্রনাথের রূপক সাঙ্কেতিক যুগের নাটকের সঙ্গে ইহার পূর্ববর্তী নাট্যরচনার যুগের সেতু বন্ধন করিয়াছে। ভাষার দিক দিয়া ইহাতে পরবর্তী যুগের পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের পরিবেশের মধ্যে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক জীবনের অতীত ইতিহাসের একটি কাহিনী আনিয়া যুক্ত করিয়াছেন। গদ্য-সংলাপের ভাষায় ইহার এই বিষয়গত মর্যাদা রক্ষা পাইয়াছে।

ইহার পরই রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাটক 'রাজা' ও 'ডাকঘর' রচিত হয় এবং এই যুগই রবীন্দ্রনাথের রূপক সাঙ্কেতিক নাটকগুলিও রচনার যুগ। মিত ভাষণ এই যুগের গদ্যসংলাপের একটি প্রধান গুণ। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গদ্যভাষার সূক্ষ্মতম বুদ্ধিদীপ্ত বাগবৈদগ্ধ্য এই যুগের নাটকীয় সংলাপের

মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। এই যুগের সংলাপের প্রতিটি বাক্য সুগভীর তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনাময়; কেবলমাত্র কানে শুনিলেই ইহাদের দায়িত্ব শেষ হয় না, অন্তরের মধ্যে সুগভীর উপলব্ধি ব্যতীত ইহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায় না।

রোমান্টিক জীবনাশ্রয়ী রচনা বলিয়া 'রাজা' নাটকের সংলাপে যে কাব্যধর্মিতা প্রকাশ পাইয়াছে, বাস্তব জীবনাশ্রয়ী রচনা বলিয়া 'ডাকঘরে' তাহা প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কিন্তু সহজ স্বচ্ছন্দ সাধারণ জীবন-চিত্রের মধ্যেও ইহাতে যে রস ও ব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আর কোন নাটকের মধ্যে তাহা পায় নাই। ইহার সংলাপের ভাষায় পাণ্ডিত্য নাই, ব্যঞ্জনা আছে; কল্পনা নাই, ইঙ্গিত আছে, বাহুল্য নাই, পরিমিতি আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নাটকীয় সংলাপের অতিভাষণ এই যুগে আসিয়া এই মিতভাষণে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ভাব এখানে গভীর বলিয়াই ভাষা এখানে সংযত হইয়াছে।

ইহার পর 'মুক্তধারা' এবং তারপর রবীন্দ্রনাথের এই যুগের শেষ নাটক 'রক্তকবরী' রচিত হয়, ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গদ্য ভাষার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই কাব্য-ধর্মিতা ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গাত্মক সংলাপের ভাষা ইহার মধ্যে তীব্রতম জ্বালাময় হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, 'রক্তকবরী' নাটকে জীবনে সৌন্দর্য-সন্ধানের মধ্য দিয়াও রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি অবিশ্বাসী একটি ব্যাঙ্গাত্মক মনোভাবকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন। সেই জন্য ইহার সংলাপের ভাষা হইতে জ্বালা দূর হইতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাটকের গদ্য-সংলাপের পরিণততম রূপ তাঁহার রচিত 'বাঁশরী' নাটকের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। 'বাঁশরী'ই রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য সর্বশেষ নাট্যরচনা। ইহার সংলাপের ভাষা ক্ষুরধার, বুদ্ধিদীপ্ত, শাণিত তরবারির মত তীক্ষ্ণ। এই ভাষা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র যুগের ভাষা; রবীন্দ্র গদ্যভাষার পরিণততম রূপের সর্বশেষ নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ চরিত্রানুযায়ী সংলাপের ভাষা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। প্রথম যুগের 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সেই প্রয়াস দেখা দিয়াছিল মাত্র; কিন্তু তাহার ধারা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সকল চরিত্রের মূলেই রবীন্দ্রনাথ প্রায় নিজেরই সমসাময়িক কাব্য কিংবা গদ্যভাষা আরোপ করিয়াছেন। তাহার ফলে চরিত্রগুলির বাস্তবধর্ম বিনষ্ট হইলেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ পাইতে কোন বাধা হয় নাই।

প্রথম অধ্যায়

গীতিনাট্য

আখ্যানমূলক গাথা-কাব্যরচনার ভিতর দিয়াই রবীন্দ্র-কাব্যসাধনার সূত্রপাত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কবি-কাহিনী' আখ্যানমূলক গাথা-কাব্য। কবিহৃদয়ের ভাব যখন পর্যন্ত নিরাশ্রিত ও প্রত্যক্ষ রূপে প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছিল না, জীবনের সেই অপরিণত বয়সে কবি এক একটি কল্পিত আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া সেই ভাবটির বিকাশ করিতে চাহিতেছিলেন—তাহার ফলেই তাঁহার প্রথম জীবনের কাব্যোপ-ন্যাসগুলি রচিত হইয়াছিল। পর পর দুইখানি কাব্যোপন্যাস—'কবি-কাহিনী' ও 'বনফুল' রচনার পর সামান্য একটু বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রয়াসেই হউক, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, রবীন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে কয়েকখানি গীতিনাট্য রচনা করিলেন। রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে এই গীতিনাট্য সংজ্ঞাটি বড় ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সেইজন্য কি বিশেষ অর্থে রবীন্দ্রনাথের কোন্ রচনা এই সংজ্ঞা দ্বারা এখানে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা প্রথমেই ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মাত্র কয়েকটি রচনা বাদ দিলে প্রায় সকল নাট্যরচনাই গীতিনাট্যের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও যাহাদের প্রকৃত গীতি-লক্ষণ সর্বাপেক্ষা প্রবল, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সেই রচনা কয়েকখানিই এখানে গীতিনাট্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গীতি-লক্ষণটির উপর এখানে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে—অবশ্য কাব্য ও গীতির পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনার এখানে প্রয়োজন নাই। এখানে যে সকল নাট্যরচনা কাব্য কিংবা কবিতার সুপরিণত কোন লক্ষণাক্রান্ত হইবার পরিবর্তে কেবল মাত্র অস্পষ্ট ভাবাবেগ দ্বারা উচ্ছল হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকেই গীতিনাট্য সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। আখ্যায়িকার একটি ক্ষীণ অবলম্বন ইহাদের মধ্যে থাকিলেও ইহারা প্রধানতঃ সুরপ্রাণ, এই সুরটিও একটি সুপরিণত রাগিণীযুক্ত নহে—তাহা কেবলমাত্র বিশিষ্ট হৃদয়-বেদনার এক একটি অসংযত অভিব্যক্তি মাত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কয়েকটি নাট্যরচনায় এই লক্ষণই অতিশয় প্রবল বলিয়া অনুভূত হয়। তাঁহার এই লক্ষণাক্রান্ত নাটকগুলি গীতিনাট্য বলিয়া অভিহিত করা হইল।

অনতিকাল ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর কয়েকখানি নাটক রচনা করেন এবং এই রচনাগুলির উপরই তাঁহার পরবর্তী সমৃদ্ধতর নাট্যরচনার ভিত্তি স্থাপিত হইল। 'রুদ্রচণ্ড', 'ভগ্নহৃদয়', 'কাল-মৃগয়া' 'বাল্মীকি-প্রতিভা', নলিনী', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি রচনা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে 'রুদ্রচণ্ড' হইতে 'নলিনী' পর্যন্ত রচনাগুলি ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর কালের মধ্যেই প্রকাশিত হয় এবং এই তিন বৎসর কালই তাঁহার এই গীতিনাট্য রচনার যুগ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই যুগ অতিক্রম করিয়া চারি বৎসর পর তাঁহার নাট্যরচনার পরবর্তী যুগে তিনি 'মায়ার খেলা' নামক আর একখানি এই শ্রেণীরই নাটক রচনা করেন সত্য, কিন্তু তাহার বিষয়-বস্তু তিনি তাঁহার এই গীতিনাট্য রচনার যুগ হইতেই গ্রহণ করেন; সেইজন্য তাঁহার 'মায়ার খেলা'র রচনাকাল তাঁহার গীতিনাট্য রচনার যুগের মধ্যবর্তী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

এই গীতিনাট্যগুলি রচনার সমসাময়িক কাল রবীন্দ্রনাথের কাব্যের জীবনে প্রধানতঃ 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' রচনার কাল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মধ্যে ভাব-প্রকাশের যে অস্পষ্টতা রহিয়াছে, এই গীতিনাট্যগুলিও তাহা হইতে মুক্ত নহে। তবে 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' হইতেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যস্রোত যে রকম ক্ষীণভাবে সুরু হইয়াছে, তাঁহার রচনা নিজের পথ ধরিয়াছে, তেমনই এই গীতিনাট্যগুলির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ পূর্ণতর নাট্যরচনার পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে —সাহিত্যিক বিচারে স্বাধীন ভাবে ইহাদের বিশেষ কোনও মূল্য না থাকিলেও রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আলোচনায় ইহাদিগকে কিছুতেই পরিত্যাগ করা চলে না।

'সন্ধ্যা-সঙ্গীত'-এর প্রধান সুর বেদনার সুর। এই বেদনা অতৃপ্তি ও অব্যক্তের বেদনা। অন্তরের উদ্বেল ও অস্পষ্ট ভাবরাশি সুপরিণত রূপের মধ্যে ধরা দিতেছে না বলিয়াই কবি-হৃদয় অস্বস্তিবোধ করিতেছে, অন্তরের এই অস্বস্তিবোধ হইতেই 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত'-এর বেদনার সুর জাগিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গীতিনাট্যগুলির সুরও এই বেদনার সুর—ইহাদের মধ্যেও অতৃপ্তি, অসম্পূর্ণতা ও নৈরাশ্যের বেদনা আসিয়া বারবার কবি-হৃদয় অভিভূত করিয়া দিতেছে। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত'-এর বেদনা-বোধের সঙ্গে ইহার মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্যে কবির ব্যক্তিমানসের পরিবর্তে তাঁহার কাব্যগুরু বিহারীলালেরই প্রভাব অধিকতর বলিয়া ইহার

প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র—এমন কি, ইহার অন্তর্নিহিত ভাবও অন্যান্য গীতি-নাট্য হইতে পৃথক্। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গীতিনাট্যগুলির মুখ্য উপজীব্য প্রেম, কিন্তু 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র তাহা নহে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মূল উপজীব্য করুণা। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলির আলোচনায় 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র একটু বিশেষ স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতেই হয়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অন্তরে বাহিরে বিহারীলালের প্রভাবজাত রচনা বলিয়া রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য রচনার যুগের বিশিষ্ট ভাবগত আদর্শ ইহার উপর কার্যকর হইতে পারে নাই।

এই গীতিনাট্যগুলিকে দুইটি স্থূল ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, আখ্যান-প্রধান ও সুর-প্রধান। 'আখ্যান-প্রধান রচনা 'রুদ্রচণ্ডে'র মধ্যে আনুপূর্বিক একটি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, এখানে কাহিনীটি সুরের মায়াজালে বাঁধা পড়ে নাই—পরিণতির দিকে অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সুর-প্রধান গীতিনাট্যগুলি হইতে সুরের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া কাহিনী উদ্ধার করা কঠিন। এখানে আখ্যান গৌণ, সুরই মুখ্য। বলাই বাহুল্য যে, এই শেষোক্ত শ্রেণীর গীতিনাট্যগুলির নাটকীয় মূল্য একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। আখ্যায়িকা বর্ণনা ইহাদের উদ্দেশ্যও নহে, কেবল মাত্র বিচ্ছিন্ন সঙ্গীতগুলি একটি স্তবকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য একটি ক্ষীণ কাহিনীসূত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই যুগ প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার প্রথম যগ। দেশীয় ও বিদেশীয় সুরের সংমিশ্রণে বাংলা গানে নূতন সুর যোজনার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তখন তিনি করিতেছিলেন, তাহারই অবলম্বন স্বরূপ কয়েকটি কাহিনী তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং গীতিই এই যুগে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছিল। নাটক নিতান্ত গৌণ হইয়াছিল মাত্র। সেইজন্য এই যুগের নাট্যরচনাগুলির মধ্যে গীতির স্বাদ যত পাওয়া যায়, নাটকের স্বাদ তাহার তুলনায় কিছুই পাওয়া যায় না।

১
'রুদ্রচণ্ড'

'রুদ্রচণ্ড' নাটিকাটিই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচিত গীতিনাট্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি ক্ষুদ্র কাব্য—চতুর্দশ দৃশ্যে বিভক্ত, অধিকাংশই অমিত্র পয়ার ছন্দে রচিত, মোট আট শত চরণে সম্পূর্ণ। এই কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, ইহা আদ্যোপান্ত ছন্দোবদ্ধ কথোপকথন দ্বারাই পূর্ণ। সেইজন্য ইহার আভ্যন্তরীণ প্রাণবস্তু কাব্যের উপাদানে গঠিত হইলেও বাহ্যতঃ ইহা নাটকের লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ ইহার পূর্বেও কয়েকটি আখ্যায়িকামূলক কাব্য ও গাথা রচনা করিয়াছিলেন। 'রুদ্রচণ্ড'ও প্রকৃতপক্ষে এই প্রকারই আখ্যায়িকামূলক কাব্য। কিন্তু ইহাই রবীন্দ্রনাথের নাট্যিক ভঙ্গিতে আখ্যায়িকা-মূলক কাব্য রচনা করিবার সর্বপ্রথম মৌলিক প্রয়াস। ইহার নাট্যিক গঠন-কৌশল অপরিণত ও অসম্পূর্ণ হইলেও রবীন্দ্রনাথের নাট্যিক পরিকল্পনার সর্বপ্রথম উন্মেষ ইহার মধ্যেই দেখা দিয়াছে। সেইজন্য ইহাকে নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

ইহার গল্পাংশ সংক্ষেপে এইরূপ,—হস্তিনাপুরের রাজা রুদ্রচণ্ড পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সপরিবারে বনবাসী হইয়াছেন। তিনি এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য কালভৈরব দেবতার নিকট শক্তি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজকন্যা অমিয়ার মনে পিতার পরাজয়ের গ্লানি স্পর্শমাত্র করিতে পারে নাই। অরণ্য-প্রকৃতির সাহচর্যে তাহার জীবন আনন্দেই কাটিতে লাগিল। তাহার পিতৃ-শত্রু পৃথ্বীরাজের একজন সভাসদ্ ছিলেন, তাঁহার নাম চাঁদকবি। চাঁদকবি অরণ্যে আসিয়া প্রায়ই অমিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন, তাহাকে সঙ্গীতে পারদর্শিনী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। শত্রুর সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া রুদ্রচণ্ড চাঁদকবিকে দেখিতে পারিতেন না। চাঁদকবি যাহাতে অমিয়ার সঙ্গে আসিয়া আর সাক্ষাৎ না করেন, সে বিষয়ে তিনি অমিয়াকে সাবধান করিয়া দিলেন। চাঁদকবির প্রতি পিতার এই মনোভাবে অমিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল। পর দিন চাঁদকবি যখন পুনরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তখন অমিয়া পিতার অত্যাচারের ভয়ে ভীত হইয়া চাঁদকবিকে অনুনয় করিয়া কহিল, 'তুমি পিতাকে বুঝাইয়া বল, তোমার ও আমার মধ্যে যে সম্পর্ক, তাহার মধ্যে কোন দোষ নাই, তুমি আমাকে ভালবাস, তাই মধ্যে মধ্যে

আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাও।' চাঁদকবি বলিলেন, 'আচ্ছা সে কথা বলিব, কিন্তু তাহার পূর্বে তোমাকে সেদিন যে গানটি শিখাইয়াছি, সে'টি গাহিয়া শোনাও।' অমিয়া গান গাহিল, তারপর চাঁদকবি নিজে আর একটি গান অমিয়াকে শিখাইতে গেলেন, এমন সময় রুদ্রচণ্ড আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রুদ্রচণ্ড চাঁদকবিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তিনি চাঁদকবির নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। ইহাতে চাঁদকবির উপর আক্রোশ তাঁহার আরও বাড়িয়া গেল। অমিয়ার জন্যই তাঁহাকে এই অপমান সহ্য করিতে হইল বলিয়া অমিয়ার উপরও তাঁহার বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল। অমিয়া পিতার নিকট ক্ষমাভিক্ষা চাহিল; কিন্তু রুদ্রচণ্ড তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া অমিয়া তাহার প্রণয়ী চাঁদকবির সন্ধানের জন্য রাজধানীর দিকে যাত্রা করিল। মহম্মদ ঘোরী তখন দিল্লী আক্রমণ করিয়াছেন। চাঁদকবি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। অমিয়া বহু সন্ধানেও চাঁদকবির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিল না। রাত্রিতে ঝড় উঠিল, অসহায় বালিকা দারুণ দুর্যোগে পথিপার্শ্বে আশ্রয় লইল। এক কাঠুরিয়া তাহাকে সেদিনের মত আশ্রয় দিয়া প্রাণরক্ষা করিল। হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করা অবধি চাঁদকবি অমিয়ার কথা মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। যুদ্ধে বহির্গত হইয়াও শিবিরে বসিয়া তাহারই কথা ধ্যান করিতে লাগিলেন। এদিকে মহম্মদ ঘোরী হস্তিনাপুর আক্রমণ করিবার আয়োজন করিয়া পৃথ্বীরাজের শত্রু রুদ্রচণ্ডের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রচণ্ড ভাবিলেন, পৃথ্বীরাজকে নিজ হস্তে দণ্ড দিবার সুযোগ হইতে মহম্মদ ঘোরী তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন। তিনি মহম্মদ ঘোরীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত চাঁদকবি মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিতে চলিয়াছেন, এমন সময় অতি পরিচিত কণ্ঠস্বরে এক অপূর্ব সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, সে এখানে কি করিয়া আসিবে? সৈন্যদল অগ্রসর হইয়া চলিল। অমিয়া পথিপার্শ্বে থাকিয়া চাঁদকবিকে চিনিতে পারিল, তাঁহাকে ডাকিল; কিন্তু অগণিত সৈন্যের পদ সঞ্চারণের শব্দে তাহা কেহই শুনিতে পাইল না; অমিয়া হতাশ হইয়া পথিমধ্যে বসিয়া পড়িল। অমিয়া যখন দেখিল, যাহার আশায় সে পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, সে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন সে পুনরায় পিতার সন্ধানে অরণ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ নিহত হইলেন। তাঁহার উপর

নিজে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিলেন না ভাবিয়া রুদ্রচণ্ড অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। এতকাল যে লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন, তাহা এমন ভাবে বিলুপ্ত হইয়া গেল দেখিয়া তিনি জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিলেন। একদিন নিজের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিলেন। এমন সময় অমিয়া পিতার সম্মুখে ফিরিয়া আসিল। পিতার রক্তাক্ত দেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত দেখিয়া তাঁহার পায়ের উপর কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। মৃত্যুর পূর্বে রুদ্রচণ্ড কন্যাকে ক্ষমা করিলেন ; অমিয়াকে সস্নেহে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজধানী হস্তিনাপুর অধিকার করিয়া লইলেন। রাজধানীর সহিত চাঁদকবিরও সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। তিনি অমিয়ার সন্ধান করিতে করিতে অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, পিতার মৃতদেহের পার্শ্বে তাহারও মুমূর্ষু দেহ ধূলায় লুটাইতেছে।

কাহিনীর দিক দিয়া বিচার করিলে ইহার বিষয়-বস্তু অতিনাট্যিকই (melodramatic) বলিতে হয় ; কিন্তু রচনার দিক দিয়া ইহা গীতিকাব্য। নাট্য-রচনায় উত্তর জীবনেও রবীন্দ্রনাথ এই ত্রুটির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন নাই। ইহা আখ্যায়িকা-প্রধান রচনা। 'রুদ্রচণ্ডে' কাহিনীই যেমন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তেমনি বর্ণনাত্মক রচনার (narration) ভিতর দিয়া সেই কাহিনীর বিষয়-বস্তুও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'রুদ্রচণ্ড' রচনার সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি গাথা রচনা করেন। গাথা আখ্যায়িকামূলক কাব্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই সময়কে 'গাথা রচনার যুগ' বলা হইয়াছে। অতএব 'রুদ্রচণ্ড'ও সেই যুগে রচিত বলিয়া ইহার উপর গাথারচনার প্রভাবও একান্তই স্বাভাবিক হইয়াছে।

সমসাময়িক কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যোপন্যাস 'বনফুল' ও 'কবি-কাহিনী'র সঙ্গে 'রুদ্রচণ্ডে'র ভাবগত ঐক্য আছে। আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া প্রেম মহিমান্বিত হইয়া থাকে, ইহাই প্রধানতঃ এই তিনখানি রচনারই মৌলিক বিষয়। নাগরিক জীবনের প্রতি কবির চিরন্তন বিতৃষ্ণার ভাবও ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। 'রুদ্রচণ্ডে'র রোমান্টিক ভাবধারার মধ্যেই রবীন্দ্র-নাট্যের যে প্রথম জন্ম হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পরবর্তী জীবনের সকল নাটকেরই বিশেষত্ব রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের নাট্যরচনার প্রয়াস বলিয়া কেবলমাত্র ঐতিহাসিক কৌতূহলই নিবৃত্ত করে না, রবীন্দ্র-নাট্যসাধনার ইহা এক অখণ্ড অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে।

'রুদ্রচণ্ডে' রবীন্দ্রনাথের নাট্যিক চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস সার্থকতা লাভ করিবার কথা নহে। কিন্তু ইহার মধ্যেই চরিত্রসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে নাট্যকাব্য রচনার যুগে তিনি যে শ্রেণীর চরিত্রসৃষ্টি করিয়া বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাহার সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের ধারা আলোচনায় 'রুদ্রচণ্ড' যে·বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রুদ্রচণ্ড এই গীতিনাট্যের নায়ক। নাট্যকার রুদ্রচণ্ডকে প্রকৃত বীর, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায় চরম দুঃখসহিষ্ণু ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। মহতের গুণ ক্ষমা—ক্ষমা সত্ত্বগুণ; কিন্তু ক্ষমা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে; সেইজন্য রুদ্রচণ্ড প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের মত প্রতিহিংসা-পরায়ণ। কবি তাঁহাকে তাঁহার নামের সঙ্গে চরিত্রের সাদৃশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্বদাই সতর্ক ছিলেন। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাঁহার চরিত্র সর্বতোভাবে বাক্‌সর্বস্ব। প্রকৃত কর্ম কিংবা বীরত্বের ক্ষেত্রে তাঁহাকে আমরা পাই নাই। প্রথমেই রাজ্যভ্রষ্ট অবস্থায় তাঁহার সহিত পাঠকের পরিচয় হয়, তারপর তাঁহার নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধারের কোন সুযোগ তাঁহাকে না দিয়াই তাঁহাকে আত্মঘাতী করা হয়। এই কাহিনীর মধ্যে প্রচুর কর্মের অবকাশ ছিল; কিন্তু কবি ইহার নায়ককে প্রকৃত কর্মের ক্ষেত্র হইতে সর্বদা দূরে রাখিয়াছেন। একবার মাত্র তাঁহাকে চাঁদকবির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার পরাজয় হয়। ইহার পর তাঁহার সকল বীরত্ব-ব্যঞ্জক উক্তিগুলি অসার দম্ভোক্তি ও শক্তিহীনের আস্ফালন বলিয়াই মনে হয়—তাহার উপর হইতে পাঠকের সকল শ্রদ্ধাই নষ্ট হয়। রুদ্রচণ্ডের জীবনের শেষ দৃশ্যটি অত্যন্ত করুণ। তাঁহা[র] চোখে সেই প্রতিহিংসা-পরায়ণ দৃষ্টি আর নাই—তাহা স্নেহে কোমল হইয়া আসিয়াছে; তাঁহার চরিত্রে এই স্নেহই ছিল সত্য এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণতা ছিল কৃত্রিম। সেইজন্য স্নেহের ভিতর দিয়াই রুদ্রচণ্ডের সহজ স্বরূপটি প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার কণ্ঠে তাঁহার নিষ্ফল দম্ভোক্তিগুলি অপেক্ষা স্নেহ-সম্বোধন অধিকতর স্বাভাবিক হইয়াছে।

অমিয়ার চরিত্রসৃষ্টিতে লেখক সাধারণতঃ রোমান্টিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেও, কোন কোন স্থলে যেখানে বাস্তবের স্পর্শ লাগিয়াছে, সেখানে তাহা অত্যন্ত মনোরম হইয়াছে। তাহার বিকাশোন্মুখ যৌবনের অনাস্বাদিত-পূর্ব বেদনা তাহাকে এক দুর্ভাগ্য হইতে অনবরত অন্য দুর্ভাগ্যের তরঙ্গ-চূড়ায়

উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে। কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য হইতে সে কোনদিন ভ্রষ্ট হয় নাই। বিয়োগান্তক কাহিনীর নায়িকাগণ যে সকল গুণের জন্য সাধারণতঃ পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়, তাহাদের সমস্তই তাহার মধ্যে ছিল। চরিত্রগত দৃঢ়তা তাহার ছিল না সত্য, কিন্তু কমনীয়তাই তাহার বিশেষ গুণ। এই চরিত্রটিই বিশেষ করিয়া এই নাট্যের গীতিরসের অনাবিল প্রবাহ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছে। রুদ্রচণ্ডের চরিত্রের পাশ্বে এই চরিত্রটির বৈপরীত্য প্রকাশ পাইয়াছে—যাহা এই ক্ষুদ্র গীতিনাট্যটির অন্যতম বিশিষ্ট গুণ।

এই গীতিনাট্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র চাঁদকবি; কিন্তু ইহার সৃষ্টিতে লেখক কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। অমিয়ার সঙ্গে তাঁহার যে প্রণয়ের কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা কেবল অসম্পূর্ণ বলিয়াই যে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না, তাহা নহে—তাহা একান্ত অস্বাভাবিক রোমান্টিক দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। মানব-মনের প্রণয়-বিকাশের যে এক স্বাভাবিক গতিপথের সন্ধান পাওয়া যায়, চাঁদকবি তাহা হইতে বহুদূরে বিচরণ করিয়াছেন। চাঁদকবি একদিকে কবি, আর একদিকে বীর যোদ্ধা, অন্য একদিকে কুমারীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—এই সকল নানা বিচিত্র গুণের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াসে তাঁহার চরিত্র-পরিকল্পনা নিষ্ফল হইয়াছে।

এই গীতিনাট্যের ভাষা সর্বতোভাবে নাট্যিক ভাষার প্রতিকূল। সেই জন্য রুদ্রচণ্ডের দীর্ঘ স্বগতোক্তিগুলি অত্যন্ত বৈচিত্র্যহীন ও নীরস বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় ভাষার তখনও জন্ম হয় নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের গাথা-রচনার যুগে এই গীতিনাট্যটি রচিত হয়। সেইজন্যই গাথার ভাষার প্রভাব ইহাতে সুস্পষ্ট। কিন্তু গাথার ভাষা হইতে ইহার ভাষা এক বিষয়ে নিকৃষ্ট। গাথার ছন্দ সর্বত্র মিত্রাক্ষর বলিয়া তাহার গীতিধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহার ছন্দ প্রকৃত অমিত্রাক্ষরও নহে, অথচ গাথার মিত্রাক্ষরও নহে—ইহা প্রায় আদ্যোপান্ত অমিত্র পয়ারে রচিত। ইংরেজি নাটক হইতে অমিত্রাক্ষরের বাহ্য প্রভাব ইহার উপর আসিয়া থাকিবে; কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের নাট্যিক ভাষার রূপ তখনও তাঁহার রচনায় ধরা পড়ে নাই। শুধু তাহাই নহে, 'রুদ্রচণ্ডে'র রচনায় রবীন্দ্রনাথের জন্মলব্ধ কাব্য-ভাষাও স্থান পায় নাই। ইহার ভাষার মধ্যে কোন ধ্বনি নাই, কোন ঝঙ্কার নাই, কিংবা কোন রসও নাই। একটু নিদর্শন দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে,—

বড় সাধ যায় এই নক্ষত্র মালিনী
স্তব্ধ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি !
মৃদুল সমীর এই চাঁদের জোছনা,
নিশার ঘুমন্ত শান্তি এর সঙ্গে যদি
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া !
আঁধার ভ্রূকুটিময় এই এ কানন,
সঙ্কীর্ণ হৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটীর
ভ্রূকুটির সমুখেতে দিন রাত্রি বাস,
শাসন-শকুনি এক দিনরাত্রি যেন
মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া।—১ম দৃশ্য

'রুদ্রচণ্ডে'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কোন নাটকের কোন যোগ আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হয়। এ' কথা সত্য, 'বাল্মীকি-প্রতিভা' হইতেই রবীন্দ্রনাট্যের একটি সুস্পষ্ট ধারা সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার পূর্বে বিভিন্ন গীতিধর্মী রচনার মধ্য দিয়া তাহারই সন্ধান করা হইতেছে মাত্র। যদিও শিশুকাল হইতে একটি নাটকের আবহাওয়ার মধ্যেই রবীন্দ্রমানস গড়িয়া উঠিতেছিল, তথাপি 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার কোন রচনাই গীতিভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাট্যে প্রেম একটি মুখ্য বিষয় হইবার পরিবর্তে করুণাই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। 'রুদ্রচণ্ডে'র মধ্যে রবীন্দ্রমানসে প্রেমবোধের বিকাশ দেখা গেলেও করুণাবোধের বিকাশ দেখা যায় না। সুতরাং ভাবের দিক দিয়া 'রুদ্রচণ্ড' পরবর্তী কোন নাটকের সঙ্গে কোন যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারে নাই। তবে অমিয়ার চরিত্রের মধ্যে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা রবীন্দ্র-নাট্যের পরবর্তী কোন কোন স্ত্রী চরিত্রের মধ্য দিয়া পূর্ণতরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। এই বিষয়ে 'রাজা ও রাণী'র সুমিত্রা এবং 'মালিনী'র মালিনী চরিত্রের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। যদিও ত্যাগের প্রেরণা ইহাদের বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়াছে—অমিয়ার ক্ষেত্রে প্রেমের দিক হইতে এবং সুমিত্রা ও মালিনীর ক্ষেত্রে করুণার দিক হইতে, তথাপি ইহাদের মধ্য দিয়া যে শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহা অভিন্ন। রুদ্রচণ্ড এক অতি শক্তিশালী পুরুষ চরিত্র। প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার শক্তি তাহার নির্মম। 'বিসর্জনে'র রঘুপতি এবং 'মালিনী'র ক্ষেমঙ্কর চরিত্রের পূর্বাভাস

ইহাদের মধ্যে সূচিত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। রঘুপতি যেমন শেষ পর্যন্ত জয়সিংহের করুণায় বিগলিত হইয়া তাহার কঠিন প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি বিসর্জন দিয়াছিলেন, রুদ্রচণ্ডের মধ্যেও অমিয়ার প্রতি তাহার স্নেহবোধ তাহাকে শেষ পর্যন্ত করুণায় বিগলিত করিয়াছিল। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের 'রুদ্রচণ্ড' নাটকের সঙ্গে পরবর্তী নাটকের যোগসূত্র সন্ধান করা যায়।

২

'ভগ্নহৃদয়'

রবীন্দ্রনাথ সতের বৎসর বয়সে প্রথম বিলাত যান এবং বিলাত প্রবাস-কালেই 'ভগ্নহৃদয়' নামে একখানি গীতি-নাট্য রচনার সূচনা করেন। 'রুদ্রচণ্ডে'র সঙ্গে ইহার সমসাময়িক গীতিনাট্য 'ভগ্নহৃদয়ে'র কিছু পার্থক্য আছে। 'রুদ্রচণ্ড' আখ্যায়িকা-প্রধান নাট্য। 'ভগ্নহৃদয়' আখ্যায়িকা-প্রধান নহে, ইহা গীতি-প্রধান। গীতি-কবিতার সূত্রে ইহাতে মূল আখ্যায়িকা অত্যন্ত শিথিলভাবে সংবদ্ধ হইয়াছে। 'রুদ্রচণ্ডে'র রচনা আখ্যায়িকা-প্রধান হওয়ার ফলে ইহার যে নাট্যিক গুণ কতকটা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, ভগ্নহৃদয় গীতি-প্রধান হওয়ার জন্য ইহাতে সেই গুণটুকুও সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। অতএব 'ভগ্নহৃদয়' রবীন্দ্রনাথের 'রুদ্রচণ্ডে'র সমসাময়িক রচনা হইলেও নাট্যিক বিচারে ইহার মূল্য তাঁহার 'রুদ্রচণ্ড' হইতে অনেক কম। লেখকও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। এই গীতিনাট্যটি যখন 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৮৭, কার্ত্তিক, পৃঃ ৩৩৬) প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন।

'নিম্নলিখিত কাব্যটিকে যেন কাহারো নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়। দৃশ্যকাব্য ফুলের গাছের মত ; তাহাতে ফুল ফুটে, কিন্তু সে ফুলের সঙ্গে শিকড়, কাণ্ড, শাখা, পত্র, কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা অনাবশ্যক। নিম্নলিখিত কাব্যটি ফুলের তোড়া। গাছের আর সমস্ত বাদ দিয়া কেবলমাত্র ফুলগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে।'

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাঁহার প্রায় সকল নাটক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। নাটকাকারে কাব্য রচনাই তাঁহার নাট্যিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার সাধনার সূচনাতেই তিনি এই বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিলেন।

এই গীতিনাট্যটির রচনা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—'ভগ্ন-হৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম, তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়স এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধে নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যেবেলাকার ছায়ার মত কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হ'য়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগুবি হ'য়ে

ওঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল, তা নয়—আমার আশেপাশে সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলে একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পলোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মত। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল নিজের মনটাই ছিল; তাই আপন মনে তিল তাল হ'য়ে উঠত।'

'ভগ্নহৃদয়ে'র অন্তর্নিহিত আদর্শবাদের ইহাই একমাত্র ব্যাখ্যা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

'ভগ্নহৃদয়ে'র কাহিনীভাগ অত্যন্ত জটিল এবং এতই শিথিলগ্রন্থি যে ইহার মূল সূত্রটি উদ্ধার করা এক রকম দুরূহ। সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে,—বনমধ্যে মুরলা একাকিনী আসীনা, সখী চপলা তাহার সন্ধানে আসিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, সেদিন অনিলের ফুল-শয্যা। তাহাতে তাহাদের সকলকেই উপস্থিত থাকিতে হইবে। মুরলাকে সকল বিষয়ে উদাসীনা দেখিতে পাইয়া চপলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বল্‌ত, কার কথা তুই দিবারাত্র ভাবিস্?' মুরলা বলিল, যার কথা সে ভাবে সে অতি মহান্, তার নাম পযন্ত সে মুখে লইবার যোগ্য নহে। চপলা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। মুরলা কবিকে দেখাইয়া দিল। কবি আসিয়া উপস্থিত হইল। চপলা চলিয়া গেল। কবিও মুরলার নিকট জানিতে চাহিল, সে কাহার জন্য সর্বদা এমন চিন্তা করে। কবির কথায় মুরলা ব্যথিত হইল; ভাবিল, তাহার মনোভাব এখনও তাহার অভীষ্ট প্রণয়ী জানিতে পারে নাই। তাহাকে তাহা জানিতে দিতেও তাহার পরম সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। মুরলার মনের কথা কবি জানিতে পারিল না। নলিনী অনিলের ফুলশয্যায় যাইবার জন্য ফুলবেশ পরিতেছে। তাহার সখীগণ তাহাকে মনের মতন করিয়া সাজাইয়া দিতেছে। তাহার এই ফুলবেশ ধারণের কারণ আর কিছুই নহে, সেদিন অনিল ও ললিতার ফুলশয্যা উপলক্ষে নলিনীর প্রণয়-প্রার্থীরা সকলেই উপস্থিত থাকিবে, তাহাদের মনোহরণ করিবার জন্যই নলিনীর এই আয়োজন। অনিল মুরলার ভ্রাতা। মুরলা তাহার ভ্রাতার নিকট কবির প্রতি তাহার অনুরক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছিল। কবি মুরলার প্রতি উদাসীন দেখিয়া সে কবিকে ভর্ৎসনা করিতে গেল; কিন্তু মুরলা তাহাতে বাধা দিল। কবি নলিনীর প্রণয়াসক্ত ছিল। এইজন্যই মুরলার প্রতি তাহার ঔদাসীন্য। নলিনীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর অভাব ছিল না। প্রত্যেককে লইয়া সে

হৃদয়হীন কৌতুক করিত, কাহারও প্রেমে সে ধরা দিত না—ইহাতেই ছিল তাহার আনন্দ। কবি মুরলাকে সখীর মতই জ্ঞান করে। কবির ম্লানমুখ দেখিয়া মুরলা তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কবি মনের কথা তাহার কাছে খুলিয়া বলিল। নলিনীকে কবি ভালবাসিয়াছে শুনিয়া মুরলার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু বাহিরে সে তাহা প্রকাশ করিল না। সে মনে মনে এই ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইতে গেল যে, নলিনীর মত সুন্দরীই কবির প্রিয় হইবার যোগ্য। কিন্তু নলিনী কবিকে উপেক্ষা করে। অবশেষে এই কৌতুকময়ী নলিনীও একদিন প্রেমের জালে ধরা দিল। সে কবিকে সত্যই একদিন ভালবাসিল। চাঞ্চল্যই ছিল যাহার স্বভাব, সে সহসা যেন কিসের স্পর্শে ভাবগম্ভীর হইয়া পড়িল; কবির সাক্ষাৎ লাভের জন্য পথের ধারে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কবি আর আসে না। অন্যান্য প্রণয়ীদের সে ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিল। কবি মুরলার কাছে আসিয়া নলিনীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের কথা খুঁটিনাটি করিয়া বলিতে লাগিল। একদিন কবি মুরলাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাকে নির্জনে বসিয়া বহুদিন কাঁদিতে দেখিয়াছি; বল, তুমি কাহাকেও ভালবাসিয়াছ কি না।' মুরলা মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিল না। মুরলা কবিকে যত্ন করিতে চাহিল, কিন্তু নলিনী কবির সঙ্গে যে আচরণ করে, তাহা কবি বারবার তাহার কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল। মুরলা অন্তরে অন্তরে আঘাত পাইল, কিন্তু তাহার সখীর সুখে নিজেকে সুখী মনে করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে মনে করিল, সে সর্বত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইবে। অনিল ললিতার কাছে প্রণয় নিবেদন করিয়া কোন সাড়া পায় নাই। ললিতা লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া সেদিন তাহার প্রণয়ীর নিকট আত্মসর্পণ করিতে পারে নাই। সেইজন্য অনিল সংসারত্যাগী হইয়া গিয়াছে। ললিতার প্রতি তাহার মন বিমুখ হইয়াছে। ললিতার এখন অনুতাপের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে প্রিয়তমকে সংসারে ফিরাইয়া আনিতে চায়, কিন্তু অনিলের প্রতি বিরূপতা কিছুতেই ঘুচে না। উভয়েই উভয়ের প্রতি অভিমানে উভয়কে আবার পরিত্যাগ করিল। সমগ্র রমণী জাতির উপর অনিলের বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল। এদিকে পথশ্রান্তিতে অবসন্ন মুরলা একাকিনী বসিয়া নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিতেছে। সংসার-ত্যাগী ভ্রাতা অনিলের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল—সে তাহাকে কবির উদ্দেশ্যে একবার পাঠাইল। মৃত্যুর পূর্বে একবার সে কবিকে দেখিয়া লইবে, ইহাই তাহার সাধ। নলিনীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষীরা তাহার কাছ হইতে উপেক্ষিত হইয়া

একে একে সকলেই বিদায় লইয়া গিয়াছে। কবিও তাহার উপেক্ষার কথা স্মরণ করিয়া তাহার কাছে আর যাইতে সাহস পায় না। বিগতপ্রায়-যৌবনা নলিনীর নিঃসঙ্গ জীবন হাহাকার করিয়া উঠিল। মুরলার শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে। তাহার পর্ণশয্যা-পার্শ্বে সখী চপলা, কবি ও অনিল আসীন। শেষ মুহূর্তে কবি সেদিন বুঝিতে পারিল যে, এতদিন এত কাছে ছিল বলিয়া মুরলার অন্তরের কথা সে বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। মুরলা তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে; কবিও নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, মুরলাকেই সে আন্তরিক ভালবাসিত। সেদিন সে মুমূর্ষু মুরলার কাছে সে'কথা স্বীকার করিল। মুরলার আবার বাঁচিয়া উঠিবার সাধ হইল। সে মৃত্যুশয্যায় কবির সঙ্গে ফুল-মালা বদল করিয়া অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। ললিতারও অন্তিম-কাল উপস্থিত। তাহার মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে অনিল আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ললিতার সব শেষ হইয়া গেল।

এই গীতনাট্যের মূল কাহিনীর নায়ক কবি ও নায়িকা মুরলা। ইহার মধ্যে অনিল ও ললিতার কাহিনী যেমন অপ্রাসঙ্গিক, তেমনই নলিনীর কাহিনীরও কোন সার্থকতা নাই। এই সকল কাহিনীর পারস্পরিক যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ বলিয়া কাহিনীর দিক দিয়া রচনাটি অনাবশ্যক জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ভাষা যদিও নাটকের ভাষা নহে, তথাপি গীতিকবিতার ভাষা হিসাবে মূল্যবান্। আদ্যোপান্ত রচনার মধ্যে কোথাও কোন জড়তা নাই, সুমার্জিত ও পরিপাটি ভাষার লাবণ্যে সমগ্র রচনাখানি উদ্ভাসিত। ইহার ছন্দে কোন কোন স্থলে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কোন কোন কবির বিশেষতঃ তাঁহার কাব্য-গুরু বিহারীলালের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। শুধু তাহাই নহে, ইহার ভিতর তাঁহার মৌলিক রচনা-শক্তির নিদর্শনও প্রচুর। ইহার মধ্যে গীতিকাব্যের লঘু ও চটুল ভাব এবং ভাষার যেমন অভাব নাই, তেমনই ইহাতে সুপরিণত ভাব-গাম্ভীর্যেরও আভাস রহিয়াছে

মুরলা। (চপলাকে)

একটি চুম্বন, সখি, বুঝি প্রাণ যায়
এই শেষ দেখা এই দুখের ধরায়!
আসিছে আঁধার ঘোর, কবি, কোথা তুমি মোর'
আরো কাছে, আরো কাছে, এস গো হেথায়!
আজ তবে বিদায়, বিদায়!

স্বামি, প্রভু, কবি, সখা, আবার হইবে দেখা,
আজ তবে বিদায় বিদায়!

এই কাব্য-নাটিকাটির মধ্যে মুরলার চরিত্রসৃষ্টি অনুপম হইয়াছে। যদিও আদ্যোপান্ত রোমান্টিক আদর্শে ইহা গঠিত, তথাপি ইহার মধ্যে মানবোচিত কমনীয়তারও স্পর্শ রহিয়াছে—তাহাতেই কাব্যটি সুখপাঠ্য হইয়াছে। অন্তরের উদ্যত প্রেম প্রণয়ীর পায়ে অঞ্জলি দিতে গিয়া কুমারী-হৃদয়ের সুকুমার লজ্জার দ্বারে বার বার মুরলা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। তারপর যখন সে শুনিতে পাইল যে, তাহার প্রণয়ী অন্যের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, তখনও তাহার অন্তরের সংযম অক্ষুণ্ণ রহিল। এই সংযমের মধ্যেই মুরলা-চরিত্রের সৌন্দর্য। দুঃখের অগ্নি-পরীক্ষায় তাহার চরিত্র বার বার পুড়িয়া পুড়িয়া উজ্জ্বল হইয়াছে। অন্তিম মুহূর্তে তাহার জীবনে যে পরিপূর্ণতা দেখা দিল, তাহা আদর্শলোকের কল্পনা হইলেও কাব্যের সমাপ্তির জন্য ইহার পরম ও সুসঙ্গত সার্থকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে নলিনীর চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। জীবনের যে একটা দিক তাহার চরিত্রের ভিতর দিয়া কবি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা যেমন বাস্তব, তেমনি করুণ। জীবনে যে বস্তু সহজ আয়ত্তের অধীন, তাহাকেই তাচ্ছিল্যের অপমান সহ্য করিতে হয়। অবহেলার অভিমানে সেই বস্তু যখন আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়, তখন তাহার সম্বন্ধে দুর্লভতার বোধ জন্মায়। কবি এই কথাটি তাঁহার বহু পরবর্তী রচনার মধ্যেও বলিতে চাহিয়াছেন। অতএব রবীন্দ্রনাথের সাধনার একটি মূল এবং মৌলিক সুর এই চরিত্রটির মধ্য দিয়া সর্বপ্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। পরব-, জীবনের বহু রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে সকল কথা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহাদের অনেকেরই পূর্বাভাস এই নাটকের কোন কোন স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন প্রকৃতির নারীচরিত্রের পরিকল্পনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নারী সম্পর্কিত বিশিষ্ট মনোভাবটির প্রথম অভিব্যক্তি করিয়াছেন। নারীর দুই রূপ—একটি বিলাসিনী, আর একটি কল্যাণী, এই উভয় রূপের প্রথম পরিচয় ইহাতে আছে। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরবর্তীকালে রচিত 'রাজা ও রাণী' নাটকের ইলা ও কুমার সেনের প্রেম-কাহিনীর পূব রাগিণী শুনিতে পাওয়া যাইবে।

৩

'বাল্মীকি প্রতিভা'

বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদা মঙ্গল' কাব্য প্রকাশিত হইবার পরের বৎসরই রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচিত হয় এবং সেই বৎসরই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে 'বিদ্বজ্জন-সমাগম সভা'য় সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাল্মীকির ভূমিকায় এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী সরস্বতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামের ইহাই ইতিহাস বলিয়া মনে হয়, নতুবা এই গীতিনাট্যের মধ্যে এই নামের আর কোন তাৎপর্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার কাহিনীভাগ এই—

দস্যুদলের অত্যাচারে অরণ্য শ্মশানে পরিণত হইল। বনদেবীর করুণ সঙ্গীতের ভিতর দিয়া অরণ্যের সেই ভয়ার্ত কাতরতা নিত্য প্রকাশ পায়। দস্যুদলের সর্দারের নাম বাল্মীকি। তাহার ইঙ্গিতে দস্যুরা বনমধ্যে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ায়। বাল্মীকি তান্ত্রিক মতে কালীর উপাসক, নরবলি সেই উপাসনার অঙ্গ। দস্যুরা তাঁহার আদেশে অরণ্যে বলির সন্ধান করিয়া বেড়ায়। সারাদিন বনভ্রমণে ক্লান্ত একটি বালিকাকে ধরিয়া লইয়া একদিন দস্যুদল বাল্মীকির পূজাস্থলে উপস্থিত করিল। বাল্মীকি তাহাকে দেবীর সম্মুখে বলি দিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় নেপথ্য হইতে বনদেবীর কণ্ঠে এক অতি করুণ সঙ্গীত ধ্বনিত হইল। ইহাতে বাল্মীকির ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি বালিকার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া উদাসীনের মত বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দস্যুরা ইহাতে দলপতির উপর বিরক্ত হইয়া বালিকাকে পুনরায় ধরিয়া আনিয়া কালী-প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বাল্মীকি আসিয়া পুনরায় বালিকাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। মনেব এই ভাবান্তর দূর করিবার জন্য বাল্মীকি দস্যুদিগকে লইয়া শিকারে বাহির হইলেন; কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া দলবলসহ এই দারুণ খেলাও পরিত্যাগ করিলেন; পূর্ববৎ উদাসভাবে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন দেখিলেন, এক ব্যাধ ক্রৌঞ্চমিথুনকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতেছে; তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও ব্যাধ বাণ নিক্ষেপ করিল, ফলে একটি ক্রৌঞ্চ শরাহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। বাল্মীকি আদিশ্লোক উচ্চারণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে

সরস্বতী আবির্ভূতা হইলেন, তাঁহার জ্যোতির্ময়ী করুণা-মূর্তি দেখিয়া বাল্মীকি অভিভূত হইলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই দেবী অন্তর্হিতা হইলেন; তখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইল; কিন্তু বাল্মীকি লক্ষ্মীকে বিসর্জন দিয়া সরস্বতীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। সরস্বতী পুনরায় আবির্ভূতা হইয়া বাল্মীকিকে বর দান করিলেন।

আদ্যোপান্ত সঙ্গীত দ্বারা কাহিনীর সূত্র রচনা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে 'সুরে নাটিকা' বলিয়াছেন। এই সকল সঙ্গীতের নাটকীয় উপযোগিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলিয়াছেন, 'যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা আশা করি একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সঙ্গীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসঙ্গত বা নিষ্ফল হয় নাই।' অভিনয়ের মধ্যে ইহা অসঙ্গত না হইবার একমাত্র কারণ, এই কাহিনীটির নাট্যিক গুণ। ইহা যে কেবল গীতাত্মক রচনা, তাহাই নহে—দৃশ্যাত্মক গুণও ইহার অন্যতম আকর্ষণ। দৃশ্যের পর দৃশ্যের মধ্য দিয়া ইহার ঘটনা এমন ভাবে নাটকীয় গতিতে অগ্রসর হইয়াছে যে, তাহা কোথাও রুদ্ধ হইয়া পড়িবার অবকাশ পায় নাই। বিচিত্র সুরের মধ্য দিয়া ইহার অভিনয় সেইজন্যই কতকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। দেশীয় গীতিসুরের সঙ্গে ইহার মধ্যে কতকগুলি বিদেশীয় সুরও আনিয়া যোজনা করা হইয়াছিল; সঙ্গীতের সুরবৈচিত্র্যও ইহার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলির মধ্যে ইহাই সর্বপ্রথম অভিনয়ের দিক দিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

এই গীতিনাট্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ববর্তী কাব্যোপন্যাসগুলির কাহিনীর ধারা পরিত্যাগ করিয়া আসিলেও, ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার মধ্যে বিহারীলালের নিকট ঋণ এত গভীর যে, ইহাকে রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হিসাবে কোন দিক দিয়াই বিচার করা সঙ্গত হয় না। তবে বিহারীলালের পরিকল্পনাটিকে এখানে নাটকীয় রূপ দেওয়া হইয়াছে, এই মাত্র এবং তাহাতেও যে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে। বাল্মীকির নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকে দুষ্যন্তের উদ্যত বাণের সম্মুখে কণ্ব মুনির আশ্রমের ঋষিগণ যে শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহারই ভাষানুবাদ মাত্র—

বাল্মীকি। রাখ রাখ ফেল ধনু ছাড়িসনে বাণ:
হরিণ শাবক দুটি, প্রাণ ভয়ে ধায় ছুটি
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়নে।

কোনো দোষ করেনি ত' সুকুমার কলেবর
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিব কঠিন শর।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই নাটকের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নামের কোন সার্থকতা নাই। বিশেষতঃ আদিকবির জীবনের যে অংশ কাহিনীর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাঁহার রত্নাকর নামীয় দস্যু-জীবনের কাহিনী; অতএব দস্যু-দলপতিকে এখানে বাল্মীকি বলিয়া উল্লেখ না করিয়া রত্নাকর বলিয়া উল্লেখ করাই সঙ্গত ছিল। কবি বাল্মীকি, কিন্তু দস্যু রত্নাকর; এখানে দস্যু রত্নাকরের মধ্যে সবে মাত্র কবিত্বের আশীর্বাদ লাভ ঘটিয়াছে—কবিত্বের বিকাশ হয় নাই; অতএব এখানে আমরা রত্নাকরকেই পাইয়াছি, বাল্মীকিকে পাই নাই।

ইহার মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্র বাল্মীকি। কাহিনীর অপরিসর ক্ষেত্রে ইহাও সম্যক্ বিকাশ লাভ করিবার অবকাশ পায় নাই। ইহাতে দস্যু-সর্দার রত্নাকর-চরিত্রের নির্মমতার রূপটি অপরিস্ফুট রহিয়াছে। কেবল মাত্র সঙ্গীতোক্তির মধ্য দিয়া তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট করাও সম্ভব নহে। সেইজন্য তাঁহার সত্যোপলব্ধির মধ্য দিয়া তাঁহার যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে তাঁহার পূর্বতন অবস্থার বাহ্যিক বৈপরীত্য সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই। শেষ দৃশ্যে লক্ষ্মীর আবির্ভাব ও তিরোধান উভয়ই আকস্মিক এবং কিছুতেই কাহিনীর অনিবার্য ধারায় আগত বলিয়া মনে হয় না। শুধু বিহারীলালেব প্রসিদ্ধ উক্তিটি 'যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়, এসো না এ যোগিজন তপোবন দ্বারে'—ইহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াই নাটকে ইহার স্থান দেওয়া হইয়াছে।

এই নাটকের মূল কথা হইতেছে করুণা। বিহারীলালের সারদাও এই করুণারূপিণী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিমন তখনও প্রেম-বিষয়ক রচনাতেই আসক্ত। প্রেমানুভূতিই তখন রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক কবি-অনুভূতি ছিল; সেইজন্য সেই যুগে প্রেমবিষয়ক গীতিনাট্যগুলির রচনার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ মানরিক বৃত্তিগুলি যত স্পষ্ট প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্য দিয়া এই করুণামূলক মানবিক বৃত্তি তত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই; প্রেম-বিষয়ক গীতিনাট্যগুলির মধ্যে এই অনুভূতির তীব্রতা নাই। বিহারীলালের অনুভূতি ইহা অপেক্ষা অনেক তীব্র ও কার্যকর। তখন পর্যন্ত করুণা-বিষয়ক ভাবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের তেমন কোন

আন্তরিকতা সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতে পারে না ; বিহারীলালের গীতিসুর তাঁহার সেই গীতিভাব-প্রভাবিত যুগে বিশেষভাবেই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া তিনি তাহারই অনুকরণে এই গীতিনাট্যখানি রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ বহু পরবর্তী কালে এই গীতিনাট্যটি সম্পর্কে যে 'মন্তব্য' করিয়াছেন, তাহা এখানে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, 'একটা সময় এসেছিল, যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চল্‌ছিল। তখন সংসারের দেউড়ী পার হয়ে সবে ভিতর মহলে পা দিয়েছি ; মানুষে-মানুষে সম্বন্ধের জাল বুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়েছিল। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'তে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হ'লো তার অন্তর্গূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তাহার স্বাভাবিক মানবত্ব, যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে (র-র ১)।'

অভ্যাসের কঠোরতা ভেদ করিয়া স্বাভাবিক মানবত্বের উদ্ধারই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের নাট্যকাব্যগুলির মুখ্য বিষয় ; কিন্তু পরবর্তী নাট্যকাব্যগুলিতে যে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া এই মানবত্বের উদ্ধার হইয়াছে, ইহার মধ্যে তখনও তাহার আভাস পাওয়া যায় না।

নাটক রচনার মৌলিক প্রেরণা হইতে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচিত হয় নাই। গ্রন্থের ভূমিকা-ভাগেই উল্লেখ করিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়া বিদেশী গানের যে সকল সুরের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন, বাংলা গানে তাহাদের প্রয়োগ করিয়া দেখিবার জন্য যে উৎসাহ বোধ করিতেছিলেন, তাহা হইতেই 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র জন্ম হইয়াছিল। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতিতে' যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও এখানে উদ্ধৃতি-যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, 'দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র জন্ম হইল। ইহার সুরগুলির অধিকাংশই দেশী।'

অবশ্য অধিকাংশ সুরগুলি দেশী বলিতে রবীন্দ্রনাথ ইহাদিগকে বাংলার লোক-সঙ্গীতের সুর বলিয়া মনে করেন নাই। কারণ, লোক-সঙ্গীতের সুর ইহাতে নাই। একটি মাত্র যে রামপ্রসাদী সুরের গান আছে, তাহাও প্রকৃতপক্ষে লোক-সঙ্গীত বলিয়া নির্দেশ করা যায় না, তাহা প্রকৃতপক্ষে মালসী বা মালশ্রী নামক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুরেরই একটি লৌকিক রূপ। সুতরাং দেশী সুর বলিতে তিনি মার্গ সঙ্গীতের সুর বলিয়াই মনে করিয়াছেন ; কারণ, দেখা

যায়, তিনি সিন্ধু, মিশ্র ঝিঁঝিট ইত্যাদি শাস্ত্রীয় সুরেরই নির্দেশ ইহাতে দিয়াছেন। তবে মিশ্র সুরের প্রয়োগ ইহাতে অনেক বেশি দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের বাড়ীতে আইরিশ কবি মুরের একখানি সচিত্র গীতিকাব্যের গ্রন্থ ছিল, ইহার নাম 'আইরিশ মেলডিজ'। বইখানিতে একটি বীণা আঁকা ছিল, ইহা দেখিয়াই তাহারও মনে হইল, তিনি আইরিশ সুর শিখিয়া তাহাতেই বাংলা সঙ্গীত রচনা করিবেন। তারপর তিনি যখন প্রথমবার বিলাত যান, তখন সেখানে গিয়া আইরিশ সুর শিখিয়া আসেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়াই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহযোগিতায় পিয়ানোর সুরে বাংলা গান রচনা করেন। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন,

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অনেকগুলি বৈঠকী গান ভাঙা—অনেকগুলি জ্যোতি-দাদার রচিত গতে বসানো এবং গুটি তিনেক গান বিলাতী সুর হইতে লওয়া। বিলাতী সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপ গানে বসাইয়াছি।' মিশ্র বাগেশ্রী রাগিণীতে রচিত এই গানটি বিলাতী সুরে বাঁধা—

ছাড়বো না ভাই, ছাড়বো না ভাই,
এমন শিকার ছাডবো না,
হাতের কাছে অম্নি এলো, অম্নি যাবে—
অম্নি যেতে দেবে কেরে।
রাজাটা ক্ষেপেছে রে, তার কথা আর মান্‌বো না।
আজ রাতে ধুম হবে ভারি,
নিয়ে আয় কারণ বারি,
জেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পুজো দেবো—
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে, রাজাটা ক্ষেপেছে রে,
তার কথা আর মান্‌বো না।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছেন যে, 'য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে 'অপেরা' বলে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য বিষয়টিকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।'

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি খুব স্পষ্ট নহে। 'সঙ্গীতই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করে নাই'—ইহার সম্পর্কে এইকথা বলিতে পারা যায় না। ইহা আদ্যোপান্ত সঙ্গীতেই রচিত। সঙ্গীত ব্যতীত ইহাতে আর কোন সংলাপ ব্যবহৃত হয় নাই। তবে ইহার কাহিনীর একটি সুস্পষ্ট ধারা আছে। সঙ্গীতের সুরের মধ্য দিয়া তাহা হারাইয়া যায় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বহু নাটকেরই প্রেরণা বর্তমান রহিয়াছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র দস্যু বাল্মীকি পরবর্তী যুগে 'বিসর্জন' নাটকের 'রঘুপতি' রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। বাল্মীকি যেমন শক্তি-সাধনায় ব্রতী ছিলেন, রঘুপতিও তাহাই ছিলেন। বাণবিদ্ধ ক্রৌঞ্চের রক্তাক্ত দেহ দেখিয়া বাল্মীকি যেমন করুণায় বিগলিত হইয়া নিজের সাধন-মার্গ পরিত্যাগ করিলেন, রঘুপতিও জয়সিংহের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়া নিজের সাধন মার্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 'বিসর্জন' নাটকের কালী প্রতিমা বিসর্জনের প্রথম প্রেরণা 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বাল্মীকির এই সঙ্গীতটির মধ্যেই প্রথম দেখা দিয়াছিল :

শ্যামা, এ'বার ছেড়ে চলেছি মা,
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা।
এতদিন কি ছল করে তুই, পাষাণ করে রেখেছিলি,
(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়ন জলে গলেছি, মা।
কালো দেখে ভাবিনে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন,
আমায় তুমি ছলেছিলে, (এবার) আমি তোমায় ছলেছি মা,
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার, মায়ের কোলে চলেছি মা।

তারপর করুণারূপিণী সরস্বতী নানাভাবে নানা নাটকের মধ্য দিয়া পরবর্তী কালে বারবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'বিসর্জনে'র অপর্ণা হইতে 'রক্ত-করবী'র নন্দিনী পর্যন্ত নানারূপে তাহাকে রবীন্দ্র নাটকের মধ্যে দেখিয়াছি। ইহার মধ্যেই রবীন্দ্রমানসে সর্বপ্রথম হৃদয়-ধর্মের জাগরণ অনুভূত হয়। দস্যুগণ পূজার উপকরণ লইয়া যখন কালী-প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছিল, তখনই বাল্মীকির মনে ভাবান্তর দেখা দিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,

আহা আস্পর্ধা এ কী তোদের নরাধম ?
তোদের কারেও চাহিনে আর, আর আর নারে—
দূর দূর দূর আমারে আর ছুঁস্‌নে।

এ সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,
আর না, আর না, ত্রাহি সব ছাড়িনু !

রবীন্দ্র-মানসে হৃদয়ধর্মের এই প্রথম জাগরণ। বিহারীলাল হইতে এখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম ব্যতিক্রম ; কারণ, বিহারীলালের মধ্যে যেখানে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক সৌন্দর্যানুভূতি, সেখানে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাহার পরিবর্তে মানবের কল্যাণ বোধের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে।

'কালমৃগয়া'

রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ বহু সার্থক নাট্যকবিতা রচনা করিয়াছিলেন, এই বিষয়ক সর্বপ্রথম যে গীতিনাট্যখানি রচনা করেন, তাহার নাম 'কালমৃগয়া।' রাজা দশরথ কর্তৃক সিন্ধু মুনি বধ উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কাব্যোপন্যাস এবং গীতিনাট্যগুলির মধ্যে প্রেমের পার্শ্বে করুণাবোধ যে জন্ম লাভ করিয়াছিল, ইহার মধ্যেও তাহার বিকাশ দেখা যায়। এমন কি, করুণরসাত্মক রচনার দিক দিয়া ইহা সর্বাগ্রগণ্য ছিল। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তেতালার ছাতে রঙ্গমঞ্চ তৈরী করিয়া যখন ইহার অভিনয় হইয়াছিল, তখন 'ইহার করুণ রসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন' বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। কাহিনী পরিকল্পনার মধ্য দিয়া কোন উৎকর্ষ সৃষ্টি করা এই গীতিনাট্যের উদ্দেশ্য ছিল না, ইহার মধ্য দিয়াও প্রধানতঃ 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মতই সুরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই ইহা রচিত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,

" 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কাল-মৃগয়া' গানের সূত্রে নাট্যের মালা।...এই দুইটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সঙ্গীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। একটা দস্তুর-ভাঙ্গা গীতি-বিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তালবেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি বাংলার বাছবিচার নাই।' " রবীন্দ্রনাথ এই দুইটি নাটকেরই অভিনয়ে প্রধান অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্যে কাহিনীর দিক দিয়া কোন মৌলিকতা ছিল না, 'কালমৃগয়া'র কাহিনী রামায়ণের আদিকাণ্ড হইতে গৃহীত হইলেও ইহাও অনেকটা 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র ধারাই অনুসরণ করিয়াছিল। সেইজন্য পরবর্তী-কালে ইহার অনেকটা অংশ 'বাল্মীকি-প্রভিতা'র অঙ্গীভূত করিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহার পুনঃ প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মনে সেযুগে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের স্বরে বাংলা গান রচনা করিবার যে আবেগ আসিয়াছিল, তাহাতে ভাষা সংযোগ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি যেমন 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই 'কাল-মৃগয়া'ও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, পরবর্তী কালে 'কাহিনী' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকটি রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী-ভিত্তিক নাট্য-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, 'কালমৃগয়া'র মধ্যে তাহার প্রথম সূচনা দেখা দিয়াছিল। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' হইতেই 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র কাহিনীর প্রেরণা আসিয়াছিল এবং 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়াই তিনি 'কালমৃগয়া' রচনা করিয়াছিলেন। গুরু বিহারী-লালের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র ভিতর দিয়া তিনি রামায়ণের রাজ্যে প্রথম পদার্পণ কবিলেন, তারপর 'কাল-মৃগয়া'র রচনাব মধ্য দিয়া তিনি পৌরাণিক কাহিনীমূলক প্রথম মৌলিক রচনা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কাহিনীটির মধ্যে উচ্চাঙ্গ নাট্যিক গুণ থাকা সত্ত্বেও ইহাকে সুস্পষ্ট কোন রূপ দিতে পারিলেন না। কারণ, নাট্যকাহিনী অপেক্ষা স্বরের পরীক্ষা সেদিন তাহার লক্ষ্য ছিল। ইহার কয়েকটি গানের মধ্যে তিনি আনুপূর্বিক পাশ্চাত্ত্য স্বর ব্যবহার করিয়ছেন। কোন গদ্য সংলাপ ইহাতে ব্যবহৃত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যটি বহুল প্রচারিত হয় নাই। এমন কি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলীতে'ও ইহা স্থান পায় নাই। বিশ্ব-ভারতী প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে)। সেইজন্য ইহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

'কালমৃগয়া' ছয়টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। আদ্যোপান্ত গীতিসংলাপে ইহা রচিত। তাহার ভিতর দিয়া ইহার কাহিনীর ধারা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ঋষিকুমার, তাহার ভগ্নী লীলা, বনদেবী, বনদেবতা, অন্ধঋষি, শিকারীগণ, দশরথ বিদূষক প্রভৃতি কয়টি চরিত্র আছে। ইহাতে ঋষিকুমারের ভগ্নী লীলার চরিত্রটি নূতন এবং অন্ধ মুনির পত্নীর চরিত্রটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঋষিকুমারের মৃতদেহ

স্কন্ধে করিয়া অন্ধমুনির সম্মুখে দশরথের আবির্ভাবের চিত্রটিই ইহাতে সর্বাপেক্ষা করুণ। অন্ধমুনি যখন পুত্রের জল লইয়া ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন দশরথ পুত্রের মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অন্ধ। এতক্ষণে বুঝি এলিরে।
হৃদিমাঝে আয়রে বাছারে।
কোথা ছিলি বনে এ ঘোর রাতে,
এ' দুর্যোগে অন্ধ পিতারে ভুলি !
আছি সারানিশি হায়রে
পথ চাহিয়ে, আছি তৃষায় কাতর—
দে মুখে বারি কাছে আয়রে।

দশরথ। অজ্ঞানে করহে ক্ষমা, তাত, ধরি চরণে—
কেমনে কহিব শিহরে আতঙ্কে !
আঁধারে সন্ধানি শর খরতর
করী-ভ্রমে বধি তব পুত্রবর,
গ্রহদোষে পড়েছি পাপপঙ্কে।

ইহার পর অন্ধমুনি রামায়ণ হইতে অভিশাপের মূল সংস্কৃত শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াছেন। অভিশাপ দিবার পর অন্ধমুনির 'কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে অবস্থান ও অবশেষে উঠিয়া দাড়াইয়া দশরথের প্রতি' বলিলেন—

শোকতাপ গেল দূরে,
মার্জনা করিনু তোরে।

ইহার অর্থ অবশ্য এই হয় যে, তিনি অভিশাপ প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু রামায়ণের অভিপ্রায় তাহা ছিল না। বহু পরবর্তীকালের কচ ও দেবযানীর কচ চরিত্রের যেন একটু ইঙ্গিত ইহাতে দেখা গেল।

৪

'নলিনী'

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগে রচিত গীতিনাট্যগুলির মধ্যে একখানি মাত্র নাটক গদ্যে রচিত হইয়াছিল—তাহার নাম 'নলিনী'। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের প্রধান আকর্ষণই তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীতগুলি; এই নাটকখানির মধ্যে কয়েকখানি গানের সন্নিবেশ করা হইলেও, আদ্যোপান্ত ইহার গদ্য রচনা সমসাময়িক পাঠক সমাজের রুচিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, এমন মনে হয় না। নাটকখানির গদ্যে রচিত হইবার একটি ইতিহাস আছে এবং তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের যোগ খুব নিবিড় নহে। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে এই গদ্যরচনার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক নহে, ইহা বাহ্যিক। বিশেষতঃ ইহার বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী গীতিনাট্য 'ভগ্নহৃদয়'-এর সমধর্মী এবং পরবর্তী গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'র অনুরূপ। অতএব গদ্যরচনার মধ্য দিয়া এই গীতিভাবের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই বাহিরের দিক হইতে ইহা রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম গদ্য-নাটক বলিয়া মনে হইলেও, ইহা তাঁহার পরবর্তী যুগের অন্যান্য গদ্য-নাটকের সঙ্গে কোন রকম ঐতিহাসিক যোগসূত্রে আবদ্ধ নহে, বরং ইহার প্রকৃতি বিচার করিয়া ইহাকে তাঁহার গীতিনাট্যেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ—নীরদ নবীন যুবক; সে নলিনী নাম্নী তাহার প্রতিবেশি-কন্যাকে ভালবাসে। কিন্তু নলিনীর যৌবন তখনও মুকুলিত হয় নাই—নীরদের প্রতি তাহার প্রণয়ের কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু তথাপি নলিনী তাহার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে—তাহা যে কিসের আকর্ষণ, তাহা সে বুঝিতে পারে না। নবীন নামে আর একজন যুবকও নলিনীর কাছে যাতায়াত করিয়া থাকে। সে নীরদের মত এত গম্ভীর প্রকৃতির নহে, সে নলিনীর সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিয়া কাটায় নলিনীর নিকট হইতে কোন প্রণয়াভাস না পাইয়া নীরদ একদিন দেশত্যাগী হইল। নীরদ চলিয়া গেলে নলিনীর চৈতন্য হইল; সে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সংবাদ জানিতে চাহিল। কিন্তু কেহই তাহার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিল না। নীরদ নিরুদ্দেশ হইবার পর নলিনীর মধ্যে যে

ভাবান্তর দেখা দিল, তাহা নবীন লক্ষ্য করিল; সে বুঝিল, নলিনী নীরদেরই যথার্থ অনুরাগিণী; তাহার সঙ্গে এতদিন সে যে চাপল্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে কোনরূপ প্রণয়ের স্পর্শ নাই। নলিনী নীরদের ধ্যানে সর্বদা নিঃসঙ্গ সময় কাটায়—সঙ্গিনীদের সহিত মিশে না, নবীনের আহ্বানে সাড়া দেয় না। বিদেশে গিয়া নীরদ নীরজা নাম্নী এক যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। নীরজাও নীরদকে ভালবাসিল, কিন্তু নীরদের ব্যথা কোথায় তাহাও তাহার বুঝিতে আর বাকি রহিল না। নীরদ নীরজাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে লইয়া দেশে ফিরিল। একদিন নলিনীদের বাড়ীতে বসন্তোৎসবে তাহার নিমন্ত্রণ হইল, সে নীরজাকে সঙ্গে লইয়া উৎসবে গিয়া উপস্থিত হইল; দেখিল নলিনী শীর্ণা হইয়া গিয়াছে, তাহার পূর্ব কান্তি আর নাই। নলিনী নীরদের কাছে আসিল; তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াই সে মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল; নীরজা নলিনীর সেবা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিল। নীরজা নলিনী ও নীরদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদের মধ্যে মিলন ঘটাইবার জন্য সঙ্কল্প করিল। শেষ দৃশ্যে মুমূর্ষু নীরজা নলিনীকে নীরদের হাতে তুলিয়া দিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

ইহার ভাষা গদ্য হইলেও নাটকীয় গদ্য সংলাপের স্বাভাবিক বলিষ্ঠতা ইহাতে নাই। ইহা সকরুণ গীতিভাব প্রকাশ করিবারই উপযুক্ত ভাষা। কবিত্বের স্পর্শে মধ্যে মধ্যে ইহা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়,

নীরদ। আজ থেকে তবে তুমি আমার বিষাদের সঙ্গিনী হলে, অশ্রুজলের সাথী হলে?

নীরজা। হাঁ প্রিয়তম!

'নীরদ। আমার বিষাদের গোধূলির মধ্যে তুমি সন্ধ্যের তারাটির মত ফুটে থাকবে। তোমাকে আমি কখনও হারাব না—চোখে চোখে রেখে দেব!'

এই নাটকখানির ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ইহা রচনার অনতিকাল ব্যবধানেই ইহার সংশোধিত রূপ তাঁহার পরবর্তী গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা' রচনা করিলেন।

৫

'মায়ার খেলা'

'নলিনী' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য রচনার যুগের অবসান হইয়া নাট্যকাব্য রচনার যুগের সূত্রপাত হয়; কিন্তু এই সময় বিশেষ প্রয়োজনের অনুরোধে তাঁহাকে আর একখানি গীতিনাট্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে হয়—তাহার নাম 'মায়ার খেলা'। নাট্যকাব্য রচনার যুগের সূচনাতেই যে তাঁহার গীতিনাট্য রচনার সমগ্র প্রেরণা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা এই গীতিনাট্যখানির রচনার ইতিহাস হইতেই জানিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ ইহা প্রয়োজনের অনুরোধে রচিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখি-সমিতি' নামক এক নারীহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহারই উদ্যোগে 'মহিলা-শিল্পমেলা'র অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইত। স্বর্গতা সরলা রায় এই 'মহিলা-শিল্পমেলা'য় অভিনয়োপযোগী একটি গীতিনাট্য লিখিয়া দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। তাঁহারই অনুরোধ রক্ষাকল্পে রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' রচনা করেন। গীতিনাট্য রচনার মৌলিক প্রেরণা তাঁহার মধ্যে যে তখন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার প্রমাণ—এই গীতিনাট্যখানি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পূর্ববর্তী নাটক 'নলিনী'রই একটি সংশোধিত রূপ মাত্র। অতএব রচনার কালানুসারে ইহা রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার যুগের অন্তর্গত হইলেও, ভাব এবং আঙ্গিকের দিক দিয়া ইহা তাহার পূর্ববর্তী যুগের রচনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ তখনও প্রকাশিত না হইলেও, 'মায়ার খেলা' প্রধানতঃ 'মানসী'র কবিতাগুলি যখন রচিত হইতেছিল, তখনই রচিত হয়; অতএব ইহা 'মানসী'র যুগের অন্তর্গত রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'কড়ি ও কোমল'-এর মধ্যে যৌবনের সৌন্দর্যানুভূতির যে আকৃতি প্রকাশ পাইয়াছে, 'মায়ার খেলাতে'ও তাহারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এই কবি-মনোভাব ইহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট। ইহা প্রেম-বিষয়ক নাট্যরচনাগুলির অন্যতম হইলেও রচনার দিক দিয়া অন্যান্য এই শ্রেণীর নাটকের অনুরূপ নহে—রচনার দিক দিয়া ইহা 'বাল্মীকি-প্রতিভার'ই অনুরূপ। অর্থাৎ ইহাও আদ্যোপান্ত সঙ্গীতের মধ্য

দিয়াই রচিত নাটক। এমন কি, বিচ্ছিন্ন গানের মধ্য হইতে ইহার আখ্যান সংগ্রহ করা পাঠকদের পক্ষে দুরূহ বোধ হইতে পারে বিবেচনায় নাটকের প্রথমেই ইহার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইতেছে ; তাহা এইরূপ—

মানব-হৃদয়ে মায়াকুমারীরা কুহক-শক্তিবলে হাসি, কান্না, মিলন, বিরহ, বাসনা, লজ্জা ও প্রেমের মোহ সৃষ্টি করিয়া থাকে। একদিন বসন্ত রাত্রিতে তাহারা প্রমোদপুরের যুবক-যুবতীদিগের মনে প্রেমের উন্মেষ করিবার বাসনা করিল। অমর নবযুবক, সে বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে আপনার মানসী-প্রতিমার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইতেছে না। শান্তা তাহার নবমুকুলিত কুমারী-হৃদয় অমরকে সমর্পণ করিয়াছে ; কিন্তু অতি-পরিচয়ের অবজ্ঞা-বশতঃ অমর শান্তার প্রতি আসক্ত হইতে পারে না। প্রমদা কুমারী, কিন্তু এখনও তাহার হৃদয়ে প্রেমের স্পর্শ লাগে নাই, সে বসন্ত বায়ু-হিল্লোলের মত ক্রীড়া-চঞ্চল, কোন বস্তুতেই তাহার হৃদয় আসক্ত হইতে পারে না, এই অনাসক্ত আনন্দই তাহার গর্ব, মায়াকুমারীগণ তাহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করিয়া তাহার গর্ব চূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিল। অমর প্রমদাকে দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইল, প্রমদাও তাহাকে দেখিয়া তাহার স্বাভাবিক চঞ্চলতা পরিহার করিয়া তাহার প্রতি কৌতূহলাক্রান্ত হইল, প্রমদার সখীগণ উভয়ের ভাবই লক্ষ্য করিল, তাহারা অমরের প্রতি বিরূপ হইয়া তাহাকে ভৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিল। ভগ্ন হৃদয়ে অমর এইবার আসিয়া শান্তাকে আশ্রয় করিল, অবসর মুহূর্তে শান্তার প্রেম নিজের প্রাণে অনুভব করিল এবং তাহার সঙ্গেই তাহার মিলনের আয়োজন করিতে লাগিল। প্রমদার সহচরীগণ মনে করিয়াছিল, অমর ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে ফিরিল না, প্রমদা হতাশায় দিন যাপন করিতে লাগিল। শান্তা ও অমরের মিলনোৎসবের দিনে অমর যখন শান্তার কণ্ঠে বরণ-মাল্য পরাইতে যাইতেছে, সেই মুহূর্তে মলিন ছায়ার মত প্রমদা আসিয়া প্রবেশ করিল ; অমরের হাত হইতে পুষ্পমাল্য খসিয়া পড়িয়া গেল। শান্তা বুঝিতে পারিল, অমর ও প্রমদা পরস্পর প্রণয়াবদ্ধ, তখন সে তাহাদের মিলন নিষ্পন্ন করিয়া দিতে চাহিল। কিন্তু প্রমদা বলিল, 'আমার বেলা গিয়াছে, খেলা ফুরাইয়াছে—তুমি এই মালা গলায় পর, তোমার নূতন সুখ পূর্ণ হউক।' অমর বলিল, 'আমারও সুখের সমাধি হইয়াছে, এখন আমার এই অশ্রুসিক্ত মাল্য আর কাহার গলায় পরাইব, কেই বা তাহা লইতে চাহিবে?' শান্তা বলিল, 'আমি লইব, আমার নিজের সকল দুঃখ গোপন করিয়া তোমার দুঃখের ভার

বুকে লইয়া বেড়াইব।' অমর ও শান্তার মিলন হইল। প্রমদা ম্লানমুখে বিদায় হইল।

ইহার গীতি-ভাষা অত্যন্ত শিথিল-বদ্ধ। সেইজন্য নাট্য-কাহিনীর যথার্থ উপযোগী নহে। এই প্রকার সঙ্গীতের মধ্য দিয়া নিতান্ত শিথিল ভাবে ইহার কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে—

শান্তা। যদি কেহ নাহি চায়, আমি লইব,
তোমার সকল দুখ আমি সহিব।
আমার হৃদয় মন সব দিব বিসর্জন,
তোমার হৃদয়-ভার আমি লইব।
ভুল-ভাঙা দিবালোকে চাহিব তোমার চোখে,
প্রশান্ত সুখের কথা আমি কহিব।

ইহার আখ্যানভাগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, 'ইহা কোন সমাজ-বিশেষে বদ্ধ নহে। সঙ্গীতের কল্পরাজ্যে সমাজ-নিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। কেবল বিনীতভাবে ভরসা করি, এই গ্রন্থে সাধারণ মানব-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কিছু নাই'—(প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন)।

এই দিক দিয়া ইহা বিশেষ ভাবেই কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত, নাটকের লক্ষণ ইহাতে কিছুমাত্র নাই। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র কাহিনীর মধ্যে যে একটি নাট্যিক গুণ ছিল, ইহাতে তাহাও নাই। একটি বিশিষ্ট ঘটনা-প্রবাহকে প্রাধান্য দিবার ফলে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মধ্যে নাট্যিক গুণের বিকাশ হইয়াছিল, কিন্তু হৃদয়াবেগকেই ইহাতে মুখ্য করার ফলে ইহার মধ্যে সেই গুণ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গীতিনাট্যের মধ্যে ভাবে ও বিষয়ে ইহাই সর্বাপেক্ষা গীতি-প্রবণ। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহা প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যরচনার যুগের অন্তর্ভুক্ত রচনা নহে, ইহা তাঁহার 'মানসী' কাব্য রচনার যুগের রচনা। সেইজন্য 'মানসী'র কবি-মনোভাব ইহার মধ্যে এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ভাবের দিক দিয়া কাব্যের দাবীই ইহাতে সমধিক। কিন্তু গঠনের দিক দিয়া ইহাতে কাব্যের কোন গুণ প্রকাশ পায় নাই। ইহাতে একদিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি-মনোভাব যেমন প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তেমনই ইহার মধ্যেই তাঁহার পরবর্তী নাট্যরচনার যুগের ইঙ্গিতও দেখা যায়। তবে এ কথা সত্য, 'মায়ার খেলা'র বিষয়-বস্তু প্রেম; 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় যে করুণাবোধের বিকাশ দেখা গিয়াছিল, ইহার মধ্যে তাহার

কোন অভিব্যক্তি দেখা যায় না। সুতরাং ভাবের দিক দিয়া ইহার সঙ্গে বরং পূর্ববর্তী গীতিনাট্যগুলির নিকটতর সংযোগ অনুভব করা যায়।

'মায়ার খেলা'র কোন চরিত্রই ব্যক্তিরূপ লইয়া প্রকাশ পায় নাই, ভাবরূপেই তাহারা প্রকাশমান। চরিত্রগুলির মধ্যে স্বভাব ও অভ্যাসের দ্বন্দ্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই চরিত্রগুলির যথাসম্ভব বিকাশ নির্দেশ করা হইয়াছে। 'মায়ার খেলা'য় অমরের হৃদয়ের মধ্যে যখন প্রেমের সঞ্চার হইল, তখন শান্তাকে সম্মুখে পাইয়াও সে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না—নিত্য সান্নিধ্যের অভ্যাসে তাহার প্রতি তাহার প্রেম বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইল না। আর প্রমদা 'আপনার স্বভাবকেই জান্‌তে পারেনি অহঙ্কারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজ্‌ল বেদনা, ভাঙ্‌ল মিথ্যে অহঙ্কার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী।' শান্তা অমরকে অন্যের প্রতি আসক্ত জানিয়াও, তাহাকে বরণ করিয়া লইয়া অভ্যাস দ্বারা স্বভাবকে জয় করিল। প্রমদার ব্যর্থতা এই গীতিনাট্যে অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিলেও, শান্তার ত্যাগ ইহার মধ্যে মহত্তর—তবে অপরিসর রচনায় তাহা সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই। 'নলিনী' নাটকের নবীন চরিত্রটি এই নাটকে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৬

'চণ্ডালিকা'

গীতিনাট্য রচনার যুগ উত্তীর্ণ হইবার বহুকাল পর রবীন্দ্রনাথ আর একখানি প্রায় এই শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়াছিলেন—তাহার নাম 'চণ্ডালিকা'। সেই যুগে মৌলিক বিষয়বস্তু লইয়া নাট্যরচনার ধারাও তাঁহার নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তুটি তিনি একটি প্রচলিত বৌদ্ধ আখ্যান হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া ইহা রবীন্দ্রনাথের নাট্য-কাব্যগুলির সমধর্মী, কিন্তু রচনার দিক দিয়া ইহাকে তাঁহার গীতিনাট্যগুলির পর্যায়ভুক্ত করিতে হয়—অবশ্য দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের জন্য ইহার সঙ্গে স্বভাবতঃই তাঁহার পূর্ববর্তী গীতিনাট্যগুলির রচনা-ভাব এবং ভাষাগত ঐক্য রক্ষিত হইতে পারে নাই।

'চণ্ডালিকা'র কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে এই প্রকার—

ভগবান বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীতে তাঁহার শিষ্য অনাথপিণ্ডদের জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। বুদ্ধশিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়ী হইতে পিণ্ডপাত গ্রহণ করিয়া বিহারে ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে তৃষ্ণার্ত হইয়া চণ্ডাল কন্যা প্রকৃতির নিকট তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করিলেন। প্রকৃতি বলিল, যে অস্পৃশ্যা, মাতঙ্গদারিকা, তাহার প্রদত্ত পানীয় গ্রহণযোগ্য নহে। আনন্দ বলিলেন, আমি তোমার জাতি কিংবা কুল জিজ্ঞাসা করিতেছি না, আমি তৃষ্ণার্ত, তোমার নিকট তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করিতেছি মাত্র। জল দাও, আমি পান করি।

প্রকৃতি আনন্দকে পান করিবার জল দিল, জল পান করিয়া আনন্দ নিজের পথে চলিয়া গেলেন। আনন্দের সুন্দর দেহ-কান্তি দেখিয়া প্রকৃতি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিল। তাহার জননী অভিচার তন্ত্রের মন্ত্র জানিত, সে মনে করিল, মাতার মন্ত্রের সাহায্যে সে আনন্দকে বশীভূত করিবে। তাহার জননী বৌদ্ধশ্রমণদিগকে জানিত, তাহারা যে ইন্দ্রিয়বিজয়ী এবং সকল কামনা-বাসনাকে জয় করিয়াছে, সে কথা কন্যাকে বুঝাইয়া বলিল। কিন্তু কন্যা কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইতে চাহিল না; আনন্দকে লাভ করিতে না পারিলে সে জীবন ত্যাগ করিবে প্রতিজ্ঞা করিল।

শুনিয়া জননী আর আপত্তি করিল না। মন্ত্র দ্বারা আনন্দকে আকর্ষণ করিয়া আনিবার সঙ্কল্প করিল।

জননী অভিচার তন্ত্রের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। মন্ত্রের শক্তিতে আনন্দের হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডাল-কন্যার গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জননী তাহাকে দেখিতে পাইয়া কন্যাকে শয্যা প্রস্তুত করিবার জন্য বলিলেন। আনন্দ চণ্ডাল-গৃহে পৌঁছিয়া এক বেদীর উপর আসনস্থ হইয়া অবিরাম অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপের সৃষ্টি হইল। ভগবান বুদ্ধ নিজ শিষ্যকে সেই অবস্থা হইতে আসিয়া উদ্ধার করিলেন। আনন্দ নিজের আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রকৃতি পুষ্পমাল্য ও শুচিবস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রাবস্তী নগরীর প্রাচীরের দ্বারে আনন্দের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আনন্দ ভিক্ষায় বাহির হইলে প্রকৃতিও তাহার পিছন পিছন যাইতে লাগিল। আনন্দ আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া ভগবান বুদ্ধের নিকট সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন এবং প্রকৃতির দৃষ্টি হইতে তাহাকে পরিত্রাণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভগবান বুদ্ধ প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আনন্দকে তোমার কিসের জন্য প্রয়োজন ?

প্রকৃতি বলিল, আনন্দ আমার স্বামী, সেইজন্য তাঁহাকে আমি পাইতে ইচ্ছা করি। ভগবান বুদ্ধ প্রকৃতির মাতাপিতাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান, তোমাদের কন্যা ভিক্ষু আনন্দের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে ? তাহারা বলিল, তাহারা ইহা জানে।

তারপর ভগবান বুদ্ধ প্রকৃতিকে বলিলেন, আনন্দকে বিবাহ করিতে হইলে তাহার মত ভিক্ষুর পোষাক পরিতে হইবে। প্রকৃতি বলিল, তাহা আমি পরিব। প্রকৃতি মস্তক মুণ্ডন করিল, কাষায় বস্ত্র পরিধান করিল। আনন্দের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। ভগবান তাহাকে তখন বলিলেন, তুমি ভিক্ষুণী হইলে, এখন ব্রহ্মচর্য পালন কর। ভগবান বুদ্ধ তাহাকে দীক্ষা দান করিলেন, তাঁহার প্রভাবে প্রকৃতির হৃদয় হইতে সকল প্রকার কামনা-বাসনা দূর হইয়া গেল। সে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে স্থান লাভ করিল।

ইহার কাহিনীর মধ্যে কয়েকটি অলৌকিক আচরণের কথা থাকিলেও আপাত-অলৌকিক আচরণগুলিকে এখানে সার্থক রূপক বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যায়। আনন্দের দুর্দশার কারণ আনন্দ নিজেই। প্রকৃতির নিকট হইতে তৃষ্ণার জল প্রার্থনার মধ্যে তাঁহার অন্তরের অবচেতন কিংবা অচেতন স্তর হইতে কোন

প্রচ্ছন্ন কামনা বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল কি না তাহা কে বলিবে? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে নিজের অজ্ঞাতেই নিজের হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি সে যে আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে, তাহার মানসিক প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপই তাহার উপর অভিচার মন্ত্রের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং ইহা রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। চৈতন্যদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে প্রকৃতি-সম্ভাষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এই অপরাধে ছোট হরিদাসের বাক্য দণ্ড হইয়াছিল। এখানে ভিক্ষু আনন্দের প্রকৃতি-সম্ভাষণ জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র করিতে হইয়াছে, প্রকৃতি-সম্ভাষণের মধ্যে তাহার গোপন মনের কোন অপরিজ্ঞাত অভিলাস ব্যক্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার কঠিন প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন ছিল।

আনন্দই প্রকৃতির নিকট হইতে জল গ্রহণ করিয়া তাহার মনেও নিজেকে প্রকৃতির নিকট প্রাপনীয় এই সম্ভাবনা জাগাইয়া দিয়াছিল। তাহা হইতে আনন্দের প্রতি প্রকৃতির এই মনোভাবের জন্ম হইয়াছিল। প্রকৃতির এই মনোভাব সৃষ্টির জন্যও আনন্দই দায়ী।

রবীন্দ্রনাথ তাহার 'চণ্ডালিকা'র কাহিনীতে ইহার শেষাংশ ব্যতীত সকল অংশই গ্রহণ করিয়াছেন। কাহিনীর শেষাংশে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক আনন্দের সঙ্গে প্রকৃতির বিবাহ এবং প্রকৃতির ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশের কথা পরিত্যক্ত হইলেও বৌদ্ধ কাহিনীর মূল বক্তব্যের কোন পরিবর্তন হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় আনন্দের চরিত্র অধিকতর নির্মল ও পবিত্র হইয়াছে। প্রকৃতির চরিত্র উভয় ক্ষেত্রেই সমান বাস্তব।

নাটক হিসাবে 'চণ্ডালিকা'র প্রধান ত্রুটি এই মনে হইতে পারে যে, ইহার কাহিনীর পরিণতি একটি অলৌকিক ক্রিয়া অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রের আকর্ষণের উপর নির্ভর করিয়াছে। তবে অলৌকিক ক্রিয়াটি রূপক বলিয়া ধরিয়া লইলে এই ত্রুটি অনুভূত হয় না। বিশেষতঃ ইহার মধ্যে যে দ্বন্দ্বের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা মানসিক, তাহা প্রত্যক্ষগোচর নহে, অপ্রত্যক্ষ বর্ণনার বিষয়ীভূত। ইহার মধ্যেও উচ্চাঙ্গের নাট্যিক গুণ আছে। তাহা রসস্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই, ইহার দুইটি দৃশ্যের মধ্যে মাত্র দুইটি চরিত্র—চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি ও তাহার জননী; তৃতীয় চরিত্র বুদ্ধশিষ্য আনন্দ কাহিনীতে অপ্রত্যক্ষ হইয়া রহিয়াছে। অথচ কেবলমাত্র এই দুইটি চরিত্রের ভিতর দিয়া একটি অতি দ্বন্দ্বসঙ্কুল কাহিনী প্রকাশ পাইবার ফলে ইহার

মধ্যে রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি হইবার অবকাশ পায় নাই। 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'য় এই দোষটি নাট্যকার খণ্ডন করিয়া লইয়াছিলেন। 'চণ্ডালিকা'র কাহিনীর সমাপ্তিটি অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহা দর্শক কিংবা পাঠকের মনে কোন কার্যকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'য় এই সকল ত্রুটি কিছু কিছু সংশোধিত হইয়াছিল। তবে 'চণ্ডালিকা' সম্বন্ধে একটি কথা এখানে উপেক্ষা করা যায় না—তাহা ইহার ভাষা। সঙ্গীত ব্যতীত ইহার অন্যান্য অংশ রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন গদ্যে রচিত, এই গদ্য যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনই সতেজ—নাটকীয় ভাষার যথার্থ রূপ ইহাতে আছে, কিন্তু 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'য় এই বিশেষ গুণটির অভাব আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাট্যকাব্য

গীতিনাট্য রচনার যুগের অবসান হইলে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার যুগের সূত্রপাত হয়। গীতিনাট্য রচনার যুগের সঙ্গে কতকগুলি বিষয়ে ইহার সুস্পষ্ট পার্থক্য অতি সহজেই অনুভূত হইতে পারে। প্রথম পার্থক্য কাহিনী-পরিকল্পনার দিক দিয়া। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, গীতিনাট্যগুলির মধ্যে গীতিসুরের প্রাবল্যে কাহিনীর বাঁধ সর্বত্রই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—বিশেষতঃ রোমান্স-প্রবণতায় সেই অস্পষ্ট কাহিনীও ধরণীর ধূলিমাটি হইতে এত ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে যে, তাহার ফলে সেই অকিঞ্চিৎকর কাহিনীও পাঠকের অন্তরের সঙ্গে কোন যোগ স্থাপন কবিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে কাহিনী দৃঢ়সংবদ্ধতা লাভ করিয়াছে, ধূম্র ও বাষ্পরাশি হইতে সুপরিণত জলবিন্দুর সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহা আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া ধরিত্রীর সর্বাঙ্গে স্নেহসিক্ত কল্যাণস্পর্শ বুলাইয়া দিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অন্তরের একান্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া এই সর্বপ্রথম বিশ্বসংসারের দিকে চোখ মেলিয়া তাকাইয়াছে। নাট্যকাব্য রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথের যে কেবল শ্রেষ্ঠ কয়খানি নাটকই রচিত হয়, তাহা নহে—এই যুগই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমৃদ্ধতম যুগ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কাব্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথ তখন 'মানসী'র ভিতর দিয়া 'সোনার তরী'তে পৌছিয়াছেন, তাহারই সমসাময়িক কালে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'গল্পগুচ্ছে'র ছোট গল্পগুলিও রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিস্তৃতি, বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য সেই যুগেই চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্র-সাধনার এই যুগের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি তাঁহার সমগ্র জীবনের মধ্যে একমাত্র সেই সময়ই বাস্তব সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শিলাইদহে বাসকালীন বাংলার যে বিচিত্র জীবন তিনি সেদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষাৎ প্রেরণা দ্বারাই তাঁহার সে যুগের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তখনও আধ্যাত্মিকতার জগতে প্রবেশ করেন নাই। প্রত্যক্ষ জগৎ ও প্রত্যক্ষ জীবনই তখনও তাঁহার নিকট চরম ও পরম সত্য। মানুষের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ,

নৈরাশ্যই সেদিন তাঁহার ধ্যানদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতিভার সেই মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত সেই বাস্তব চৈতন্যের মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাট্যরচনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, নাট্যকাব্য কয়খানি রচনা করিয়াছেন।

'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা'র পটভূমিকায় প্রধানতঃ এই নাট্যকাব্যগুলি রচিত। সেইজন্যই মানব-প্রীতিই এই নাটকগুলির অন্যতম প্রধান উপজীব্য। এই নাট্যকাব্যগুলির মধ্যেও কবির আত্মসচেতনতার ভাব খুব প্রখর বলিয়া অনুভূত হয়। কাব্য ও নাট্য-রচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যক্তিচৈতন্য সমানভাবেই কার্যকর হইয়াছে, নাট্য-রচনার মধ্যে আত্মবিলুপ্তির যে একটা দাবী আছে, তাহা এখানে স্বীকৃত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী গীতিনাট্যগুলির মধ্যে কবির এই আত্মসচেতনতার ভাব এত প্রখর ছিল না বলিয়া তাহাদের দুই একটির মধ্যে কাহিনীগত গুণের যে বিকাশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে তাহার অভাব আছে। ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্যটি বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; ইহা দ্বারা ইহাদের নাট্যগুণ বহুলাংশে যে খর্ব হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

গীতিনাট্যগুলির মধ্যে যে একটি বিষাদের সুর শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে তাহা নাই। গীতিনাট্যগুলির কাহিনীর মধ্যে আদ্যোপান্ত একটি বেদনার রাগিণী বাজিয়া গিয়াছে, নাট্যকাব্যগুলির সুরে সেই বিষণ্ণভাবের যে অভাব আছে, তাহা নহে—কিন্তু তাহা সংসারের বিচিত্র রাগিণীর সঙ্গে একাকার হইয়া আছে—তাহা স্বতন্ত্র করিয়া অনুভব করা যায় না।

কাব্য রচনার ক্ষেত্রে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র পর 'প্রভাত-উৎসব' রচনার ভিতর দিয়া কবি আত্মস্ফূর্তি এবং বিশ্বজগতের সঙ্গে একাত্মবোধের যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনে অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে নাই—জীবনের নশ্বরত্ব এবং মনুষ্য চরিত্রের দুর্বলতা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া তাহা ছায়াচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। এই মনোভাবের ভিতর হইতেই নাট্যকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের প্রায় সব কয়খানিই বিয়োগান্তক রচনা, একখানিও যথার্থ মিলনান্তক হইতে পারে নাই।

নাট্যকাব্যগুলির অন্যতম বিষয়—গীতিনাট্যগুলির মত কেবলমাত্র প্রেমের জন্যই প্রেম নহে, কল্যাণের জন্য প্রেম। যে প্রেম কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ

স্বীকার করে না, সেই প্রেম ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-বিষয়ক যে দৃষ্টি গীতিনাট্যগুলির মধ্যে কেবলমাত্র স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ হইয়াছিল, নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে তাহাই সহস্র ধারায় যেন বিশ্বের কল্যাণের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিল। এই প্রেম কথাটিকে এখানে কিছু ব্যাপক অর্থে, বিশেষ বুঝিতে হইবে।

ধর্ম সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট একটি মনোভাব সর্বপ্রথম এই নাট্য-কাব্যগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। যে ধর্মপালনের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক নাই, সেই ধর্ম সত্য ধর্ম নহে—হৃদয়ধর্মই প্রকৃত সত্যধর্ম। এই সম্পর্কে তিনি নিজেও লিখিয়াছেন,—'আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসে নি'। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি'। সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এ'র যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে (র-র-৪)।'

এই নাট্যকাব্যগুলির দুই একখানির মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্ব-সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালব্ধ একটি বিশিষ্ট ধারণাও বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে—ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ তাহার সম্মুখে কতকটা বিপর্যস্ত হইলেও ইহার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ নারীত্বের যে একটা নূতন কল্যাণ-রূপের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবপ্রবুদ্ধ সামাজিক চৈতন্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়াছিল বলিয়াই বিবেচিত হইতে পারে।

১

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্রনাথের রচিত সর্বপ্রথম মৌলিক নাট্যকাব্য। ইহার পূর্বে তাঁহার একজন গৃহশিক্ষকের সহায়তায় তিনি সমগ্র 'ম্যাকবেথ' নাটকের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ অনুবাদটি হারাইয়া যায়। ষোলটি দৃশ্যে বিভক্ত অমিত্র পয়ার ও গদ্যের সংমিশ্রণে রচিত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' একটি নাটিকা। ইহার আকার ক্ষুদ্র হইলেও নাট্যকাব্যের আদর্শেই ইহা রচিত হইয়াছে। এই নাটিকাটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলিয়াছেন, 'এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিক বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানারূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাটিক বলা যেতে পারে (র র ১, 'কবির মন্তব্য')।' এই নাটকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস দেখা যায়, তাহা সর্বতোভাবেই অন্তর্মুখী। তাহা অন্তরাশ্রিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই বাহিরের কোলাহলপূর্ণ জনতাকে কবি তাহার পার্শ্বেই আনিয়া স্থান দিয়াছেন। বাহিরের বিচিত্র সংসার-জীবনের বিরুদ্ধে নায়কের আত্মকেন্দ্রিক জীবন যে সংঘাতের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই ইহার একমাত্র নাট্যিক গুণ। কাহিনীর দিক দিয়া নাটকটি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইলেও, ইহার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্যের বীজ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যটি রচনা করিবার অব্যবহিত পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রভাত-সঙ্গীত' এবং 'ছবি ও গান' নামক কাব্যগ্রন্থ দুইটি প্রণয়ন করেন। বস্তুতঃ এই দুইটি কাব্যের প্রেরণাই কবি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্য-কাব্যেও রূপায়িত করিয়াছেন। অতএব ইহার পরিকল্পনার মূলে যে প্রেরণা, তাহা প্রকৃতপক্ষে কাব্যেরই প্রেরণা, নাটকীয় প্রেরণা ইহার মুখ্য নহে। এখানে কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে,—

এক সন্ন্যাসী অন্ধকার গুহার মধ্যে বসিয়া তপস্যায় মগ্ন হইয়া আছেন। একদিন তাঁহার মনে হইল, তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রকৃতির মায়াজাল

ছিন্ন করিয়া আত্মকেন্দ্রিক সাধনায় সিদ্ধির আনন্দে সন্ন্যাসীর হৃদয় সে'দিন পরিপূর্ণ। সংসারের তুচ্ছ খেলাধূলা দেখিবার জন্য তিনি রাজপথে বাহির হইলেন। দেখিলেন, কৃষক-বালকেরা গান গাহিয়া গোঠে যাইতেছে, পিতা পুত্রের হাত ধরিয়া ঠাকুরের পূজা দিবার জন্য পথে বাহির হইয়া পুরোহিত ঠাকুর ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে নানা তুচ্ছ গল্পগুজবে মন দিয়াছে, নাগরিকদিগের মধ্যে নগণ্য স্বার্থ লইয়া দ্বন্দ্ব বাঁধিয়াছে, কোথাও পাণ্ডিত্যের অভিমান চলিয়াছে, কোথাও যুবতীদের রঙ্গরস চলিয়াছে, নিরন্ন ভিক্ষুক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছে, চতুর্দোলায় চড়িয়া মন্ত্রিপুত্র চলিয়াছে। সন্ন্যাসী এই সব বিচিত্র জনকোলাহল হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিবেচনা করিয়া ইহাদের একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

সেই পথিমধ্যে এক অনার্য কন্যাকে দেখিয়া পথিকগণ ঘৃণায় দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, মন্দির-রক্ষক মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে তাহাকে দূর করিয়া দিল। সন্ন্যাসী বালিকাকে কাছে ডাকিয়া আনিলেন। মাতৃপিতৃহীনা অনাথাকে সঙ্গে করিয়া বালিকার ভগ্ন কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকা সন্ন্যাসীকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিল। সন্ন্যাসী নিজের অন্তরে এক অভূতপূর্ব পুলক অনুভব করিতে লাগিলেন। আবার প্রকৃতির মায়াজালে জড়াইয়া পড়িতেছেন, এই আশঙ্কায় সন্ন্যাসী ভীত হইলেন। শেষে একদিন বালিকাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরের যে স্নেহ-প্রবৃত্তি এতকাল রুদ্ধ হইয়াছিল, এই অনাথা বালিকার সংস্পর্শে আসিয়া তাহা মুক্ত হইয়া গিয়াছে, তিনি পথিপার্শ্বে সর্বত্র এই স্নেহপ্রেমের লীলাভিনয় দেখিতে পাইলেন। বালিকা তাঁহার সন্ধান করিতে করিতে আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী পুনরায় বালিকাকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জন অরণ্যে পলাইয়া গেলেন। সেখানে এক ঝড়ের রাত্রে যেন বালিকার করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন। সন্ন্যাসী অরণ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। আবার সেই জনকোলাহলমুখর রাজপথের উপর দিয়া বালিকার সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার নিজের পরিত্যক্ত আশ্রয়ের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বালিকার প্রাণহীন দেহ তাঁহারই সম্মুখে ধূলায় লুটাইতেছে। সন্ন্যাসী যে সংসার-প্রকৃতিকে মায়া জ্ঞানে তুচ্ছ বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহাই আজ তাঁহার কাছে পরম সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইল।

নাট্যসাহিত্যের যাহা বিশিষ্ট গুণ অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিকতা তাহা ইহাতে আদৌ

নাই। ইহা অতিমাত্রায় কবির আত্মভাব-প্রধান রচনা। যে আত্মভাব-প্রধান গীতি-কবিতার স্বর কবির তখনকার জীবন আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, তাহার সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার পক্ষে নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্যসৃষ্টি তখন সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। অতএব 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্য বলিয়া আখ্যাত হইলেও, ইহা যে গীতি-কবিতারই সহোদর, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবির মনোভূমির যে অংশ হইতে তাঁহার সমসাময়িক গীতিকাব্যগুলির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতেই এই নাট্যকাব্যখানিও জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া ইহাও বিশেষ করিয়াই গীতিধর্মী হইয়া আছে। তথাপি ইহাকে গীতিনাট্য বলিবার উপায় নাই; কারণ, ইহার মধ্যে অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বসংঘাত ও বহির্মুখী ঘটনা বৈপরীত্যের যে চিত্র-সমাবেশ করা হইয়াছে, তাহাও নাট্যিক-গুণ-বর্জিত নহে। ইহাকে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার সবপ্রথম সার্থক প্রয়াস বলিয়া স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা যায়।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যটি আরও একটি কারণে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে রচিত সমগ্র নাট্যকাব্যগুলির ইঙ্গিত ইহাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। গীতিনাট্যের প্রভাব ইহার উপর থাকা সত্ত্বেও কিংবা ইহার বিষয়-বস্তু প্রধানতঃ বিশ্লেষণ বা তর্কমূলক হইলেও ইহার কাহিনীর পরিণতি একটু অতি-নাটিক (melo-dramatic)। কাহিনীর পরিণতিতে অতি-নাটিক ঘটনার সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে রচিত সমগ্র নাট্যকাব্যেরই বিশেষত্ব। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' অনাথা বালিকা যেমন করিয়া আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া সন্ন্যাসীকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গেল, তাহার পরবর্তী রচনা 'রাজা ও রাণী'তেও দেখিতে পাই, কুমারসেনের আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া রাজা বিক্রমদেব সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার তৎপরবর্তী রচনা 'বিসর্জনে'ও রঘুপতি জয়সিংহের আত্মত্যাগে সত্যের সন্ধান পাইলেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের যে স্বর সর্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার পরবর্তী জীবনেও অনেক দূর পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে। কেবল আদর্শ ও অন্তর্বস্তুর দিক দিয়াই নহে, 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র গঠন-কৌশলও তাঁহার পরবর্তী উপরোক্ত প্রধান দুইটি নাট্যকাব্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

চরিত্র-সৃষ্টিতে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' কোন বৈচিত্র্য নাই। ইহার প্রধান কারণ, নাটকটি পূর্ণাঙ্গ নহে। পরিপূর্ণ কোন চরিত্র-সৃষ্টির অবকাশও ইহাতে

ছিল না। ইহার মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্র সন্ন্যাসীর। তাঁহার চরিত্রও একান্ত অন্তর্মুখী করিয়াই দেখান হইয়াছে। কর্মবিমুখ অন্তর্মুখী চরিত্র নাট্যরস সৃষ্টির কতখানি অন্তরায়, সেই তর্ক এখানে তুলিতে চাহি না; কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সন্ন্যাসীর এই চরিত্র একান্ত ভাবপ্রধান হইবার ফলে তাহাতে নাটকীয় ক্রমবিকাশের নির্দেশ সুস্পষ্ট হয় নাই। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এমন চরিত্রের অভিনয় যেমন সার্থক হইতে পারে না, তেমনি সাধারণ পাঠকের নিকটও ইহার তর্কমূলক দার্শনিক স্বগতোক্তিগুলি বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারে। সন্ন্যাসীর উক্তি অধিকাংশই স্বগত। তাহাতে তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব বুঝিবার পক্ষে সহায়তা হইলেও, অনেক সময় বৈচিত্র্যের অভাবে তাহা একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। তবে সন্ন্যাসীর দীর্ঘ স্বগতোক্তিগুলি নাট্যিক গুণ অনেকাংশেই খর্ব করিলেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের উপর অসঙ্গত বাহ্যিক কর্মতৎপরতা আরোপ করিয়া লেখক ইহা অস্বাভাবিক করিয়া তুলেন নাই। নাটকের ক্ষেত্রে এমন চরিত্রের পরিকল্পনা অসমীচীন হইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনের অনুরোধে এমন চরিত্রের অবতারণা করিয়া নাটকীয় আদর্শের মর্যাদা রক্ষাকল্পে ইহার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যে নষ্ট করা হয় নাই, এই চরিত্রটি সম্পর্কে ইহাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অনাথা বালিকার চরিত্রটি একটি অবাস্তব রূপক চরিত্রের মত। 'বিসর্জন' নাট্যকাব্যের 'অর্পণা' চরিত্র ইহারই সম্পূর্ণ অনুরূপ। পূর্ববর্তী নাটক 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র সরস্বতী চরিত্রেরই ইহা সমধর্মী। সন্ন্যাসীর সম্পর্কে ইহাকে সংসার-প্রকৃতির প্রতীক্ বলা হইয়াছে। নাটকের মধ্যে ইহার কোন ব্যক্তিত্ব নাই। অতএব ইহা নাট্যিক চরিত্র-সমালোচনার বিষয়ীভূত নহে। প্রাত্যহিক সংসারের যে বিভিন্ন জনমণ্ডলীর দৃশ্য ইহাতে পরিবেষণ করা হইয়াছে, তাহা এই সংক্ষিপ্ত নাট্যকাব্যটি সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোক-চরিত্রে কবির বিচিত্র এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় এখান হইতেই পাওয়া যায়। যদিও চিত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত, তাহা হইলেও ইহাদের দ্বারাই নাট্যিক বৈপরীত্য সুপরিস্ফুট করিয়া তোলা সার্থক হইয়াছে। এই চিত্রগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম কৌতুকরস পরিবেষণের যে নিপুণতা রহিয়াছে, তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের আর কোন নাট্যকাব্যে সংসারের বিচিত্র জনতার এমন সুপরিস্ফুট চিত্র পাওয়া যায় না। তাঁহার পরবর্তী রচনা 'রাজা ও রাণী'

এবং 'বিসর্জনে'র মধ্যেও জনতার প্রায় অনুরূপ চিত্র আছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার এই অপরিণত বয়সের রচনার সঙ্গে তাহাদের তুলনাই হইতে পারে না।

এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্যটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয়ে আলোচনার উপসংহার করিব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—" 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্বন্ধে শেষ কথাটা এই দাঁড়াল শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হ'য়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায়, সেই যথার্থ পায়।" (র-র ১, ঐ)

তাহার পূর্বপিতামহ রাজা ছিল, মাতামহবংশ তখনও রাজত্ব করে। কিন্তু এই নাটকের কোন স্থানে তাহার কোন কার্য ও চিন্তার ধারায় তাহার এই পরিচয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। রঘুপতিও জয়সিংহের এই পরিচয় সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখিতেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে ধূর্ত রঘুপতি রাজ-রক্ত সম্বন্ধে কোন অস্পষ্টতা রাখিতেন না। জয়সিংহ গুরুর আদেশ এবং রাজার প্রতি ভক্তি এই উভয়ের বিরোধ মিটাইবার জন্যই এখানে তাহার বিস্মৃত জীবনের বিলুপ্ত ইতিহাসের শরণাপন্ন হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত তাহার চরিত্রের মধ্যে তাহার কুলপরিচয়ের কোন নিদর্শন নাই। রাজপুত ক্ষত্রিয় যুবকের যেমন নিঃসংশয়চিত্ত ও গুরুর আদেশ কিংবা নিজের কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ থাকা উচিত, জয়সিংহের মধ্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব সে যে রাজপুত, এই পরিচয় তাহার নিতান্ত মুখের পরিচয়, ইহা নাট্যিক কাহিনীর অঙ্গীভূত পরিচয় নহে। নাটকের একটি বিশিষ্ট গুণই এই যে, প্রত্যেক চরিত্রেরই প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ইহার নাট্যিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে হইবে, কেবল মুখের কথার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিলে তাহা কার্যকর হইয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং জয়সিংহেরও এই পরিচয় অর্থহীন। কেবলমাত্র কাহিনীর প্রয়োজনীয়তার জন্যই লেখক শেষ মুহূর্তে জয়সিংহের এই পরিচয়ের অবতারণা করিয়াছেন। অতএব জয়সিংহের চরিত্রের আলোচনা সম্পর্কে তাহার এই পরিচয়ের অংশ পরিত্যাগ করিয়াই লইতে হয়।

জয়সিংহের চরিত্রের মধ্যে দৃঢ়তার অভাব সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সে নিজের অন্তরকে বিশ্বাস করিতে পারে না, কেবলই এক সংশয় হইতে নূতন সংশয়ের তীরে উৎক্ষিপ্ত হয়। গুরুর প্রতিও সে তাহার সন্দেহ গোপন করিয়া চলে না, অথচ নিজের চক্ষে গুরুর ভণ্ডামি দেখিয়াও অভিভূতের মত গুরুর নির্দেশে দেবীর চরণ স্পর্শ করিয়া কঠিন শপথ করে। শপথ করিয়াও শপথ পালন করিবার সময় আবার সে সংশয়ের অধীন হইয়া পড়ে। তারপরও সেই শপথ হইতে পরিত্রাণের কৌশল অবলম্বন করে। ইহা দ্বারা তাহার গুরু কিংবা দেবী কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না। কারণ, রাজ-রক্ত বলিতে রঘুপতি কাহার রক্ত মনে করেন, তাহা নিশ্চিত বুঝিয়াও সে গুরুর সম্মুখে আত্মহত্যা করিয়া গুরুর উদ্দেশ্যই যে শুধু ব্যর্থ করে, তাহা নহে—তাঁহাকে কঠিন আঘাতও দেয়।

জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্রমবিকাশের দিকটা নাটকে সুকৌশলে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহা নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'জয়সিংহ রঘুপতিকে পিতার মত ভক্তি করত, সে বাল্যকাল থেকে মন্দিরের সকল অনুষ্ঠান ও পশুবলি দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই, যেখানে ভালোবাসা সেখানে রক্তপাত চলে না—এই উপলব্ধি তার মনে সম্পূর্ণরূপে স্থান পেতে দেরী হয়েছিল। অপর্ণার ক্রন্দনেই প্রথমে তার পূর্ববিশ্বাস সম্বন্ধে সংশয় হতে সুরু হলো।' (ঐ)

নক্ষত্রমাণিক্যের চরিত্র এই নাটকের মধ্যে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, এই চরিত্রটি এই নাটক অপেক্ষা 'রাজর্ষি' উপন্যাসে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। তথাপি নাটকেও ইহার পরিকল্পনা সার্থকই হইয়াছে বলিতে হইবে। নক্ষত্র ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, তাঁহার চরিত্রে কোন দৃঢ়তা নাই; সহজেই তিনি অন্যের ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইয়া উঠেন। সিংহাসনের প্রতি তাঁহার লোভও দুর্নিবার, অথচ রাজার প্রতি ভক্তিও অসীম। রঘুপতিকে তিনি ভয় করেন, গুণবতীর সান্নিধ্যও তিনি এড়াইয়া চলেন। তিনি প্রকৃত যাহা নহেন, অনেক সময় গোলেমালে তাহাই হইয়া উঠেন। তিনি ভীরু, নিজের ছায়া দেখিয়া নিজেই শিহরিয়া উঠেন। নাটকের মধ্যে এই চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা বাস্তব।

গুণবতীকে এই নাটকের মধ্যে একটি তত্ত্বের বাহন হিসাবেই নাট্যকার উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার বাস্তবরূপ তত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তিনি নিঃসন্তানা, তাঁহার সন্তান-কামনার অভিব্যক্তির মধ্যে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আছে। শুধু একটা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই নাট্যকার এই নারীচরিত্রকে অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর প্রকৃতির করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত রক্তমাংসের পরিচয় কিছু নাই; তাহা হইলে রাজার প্রতি তিনি এত নিষ্ঠুর হইতে পারিতেন না। রাজার প্রতি তাহার প্রেম নাই, বিদ্বেষ আছে; অথচ ইহার যে কারণ দেখা যায়, তাহা স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। এতটুকু ক্ষুদ্র প্রাণের অনিশ্চিত সম্ভাবনায় তিনি অগণিত অসহায় জীবের প্রাণ বলি দিতে চাহেন, অসহায় শিশুকে মন্দিরে লইয়া বলি দিবার জন্য নক্ষত্রকে প্ররোচিত করেন। রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নক্ষত্রকে সিংহাসন দিবার ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত হন। সন্তানকামী মাতৃহৃদয়ের এই নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। তবে তাঁহার চরিত্রের মধ্য দিয়া

রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিতে চাহেন, তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই বলি,—'একটুখানি যে প্রাণ, প্রেমের কাছে তার মূল্য কত বেশি! একদিকে রাণী মানত করছেন যে বিশ্বমাতার কাছে ছাগশিশু বলিদান দেবেন, অন্যদিকে তিনি সেই বলির পরিবর্তে এইটুকু প্রাণের কণার জন্য তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভালবাসাটুকু ভোগ করতে চান। একদিকে তিনি প্রাণহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ, অন্য দিকে প্রাণের প্রতি প্রাণের মমতা যে কত বড় জিনিস তা বুঝেছেন।' এই বিষয়টির উপর প্রাধান্য দিবার জন্যই গুণবতীর চরিত্রের একটা দিক অতিরিক্ত নিষ্ঠুর করিয়া অঙ্কিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা তত্ত্বমূলক, বাস্তব নহে।

চাঁদপাল ও নয়ন রায় রাজ্যের সেনাপতি ও দেওয়ান; কিন্তু কথাবার্তায় তাহারা ভাঁড়ের অনুরূপ; বরং মন্ত্রীর মধ্য ধীরতা ও স্থৈর্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহারা পদমর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। নয়ন রায়ের পুনঃপ্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত এই দুইটি চরিত্রের কথাবার্তা ও কার্যাবলীর মধ্যে সুস্পষ্ট নাট্যিক পার্থক্য অনুভব করা যায় না।

তারপর অপর্ণা। অপর্ণা কোন নাট্যিক চরিত্র নহে, ইহা একটি ভাব বা 'আইডিয়া'। সত্য যেন প্রেমের রূপ ধরিয়া অপর্ণার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অপর্ণা প্রেমরসাশ্রিত সত্যের রহস্যমূর্তি। সেইজন্য এই চরিত্রটির কোন ক্রমবিকাশ কিংবা কোনও সুস্পষ্ট পরিণতি-নির্দেশ নাই। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সে যেমন জয়সিংহকে বলিয়াছিল,

এসো তুমি,
এ' মন্দির ছেড়ে এসো—১।১

তেমনই শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে সে রঘুপতিকেও বলিল,

পিতা চলে এসো।—৫।৪

তাহার আকর্ষণ সত্যের আকর্ষণ বলিয়াই অত্যন্ত প্রবল এবং সত্য বলিয়াই ধ্রুব। অসত্যের অচলায়তনের মধ্যে প্রেমের পথে বালিকার রূপ ধরিয়া সত্যের রসমূর্তি গিয়া প্রবেশ করিল এবং তাহার ভিতর হইতে বন্দী জীবন দুইটি উদ্ধার করিল। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র অনাথা বালিকার সম্পর্কে অপর্ণার উল্লেখ করিয়াছি। উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; তথাপি অপর্ণার প্রভাব নাট্যকাহিনীর উপর প্রবলতর। সত্যের প্রতিষ্ঠায় অনাথা বালিকা হইতে অপর্ণা অধিকতর সচেষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়।

নিতান্ত অবাস্তব একটি কাব্যধর্মী চরিত্রকে এই নাটকের মধ্যে ব্যাপক স্থান

দেওয়ার ফলে অনেকস্থলেই নাটকের গতি প্রতিহত হইয়াছে। অপর্ণার বাণীর মধ্যে বৈচিত্র্য নাই, কর্মে ক্ষিপ্রতা নাই, এমন কি দৃশ্যত তাহার কোন সুস্পষ্ট রূপও নাই; সেইজন্য নাটকে তাহার স্থান অধিকতর সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হইত। এই একটি চরিত্রই প্রধানত এই নাটকটিকে গীতিধর্মী করিয়া তুলিয়াছে।

এই নাটকের প্রকৃত ট্রাজেডি কি, সে' বিষয়ে একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। পূর্বেও বলিয়াছি যে, রঘুপতির পক্ষে মন্দিরের দেবী সত্য ছিল না, জয়সিংহের প্রতি স্নেহই সত্য ছিল। দেব-মন্দিরের পরিবেশের মধ্যে সেই স্নেহ পুষ্টিলাভ করিতেছিল বলিয়া মন্দির সম্বন্ধে রঘুপতির বাহ্য একটা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল। জয়সিংহের আত্মহত্যায় রঘুপতির হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল, সংসারে অবলম্বন করিবার কোন বস্তুই আর তাঁহার অবশিষ্ট রহিল না। পূর্বেই বলিয়াছি, দেবী তাঁহার কাছে সত্য ছিল না; সেইজন্য দেবমূর্তির দিকে চাহিয়া জয়সিংহের শোক বিস্মৃত হইবার তাঁহার কোন উপায় ছিল না। অতএব জয়সিংহের মৃত্যুতেই রঘুপতি অন্তরের দিক দিয়া একেবারে অবলম্বনহীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই উক্তি যথার্থই আন্তরিক—

> জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দয়, নিষ্ঠুর!
> এ কী সর্বনাশ করিলি রে? জয়সিংহ
> অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,
> স্বেচ্ছাচারী? জয়সিংহ, কুলিশ-কঠিন!
> ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
> প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা ধন
> জয়সিংহ, বৎস মোর গুরুবৎসল!
> ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
> কিছু নাহি চাহি; অহঙ্কার অভিমান
> দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক্। তুই আয়—৫।৪

রঘুপতির অন্তরের একমাত্র অবলম্বন ছিল জয়সিংহের প্রতি স্নেহ। তাহার অন্তরের সেই স্থানটি যে মুহূর্তে শূন্য হইয়া গেল, সেই মুহূর্তেই এই নাটকের ট্র্যাজেডি দেখা দিল। কারণ, রঘুপতির জীবনের মর্মমূল কক্ষচ্যুত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবনের অন্যান্য অলীক বস্তু—যেমন, শক্তির দম্ভ, ব্রাহ্মণের অধিকার, দেবতায় ভক্তি—স্বপ্নের মত অদৃশ্য হইয়া গেল।

গোমতীর জলে প্রতিমা বিসর্জন বাহিরের একটা লৌকিক ব্যাপার মাত্র, অন্তরের বেদীতে রঘুপতি কোনদিনই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন নাই। অতএব তাঁহার পক্ষে বিসর্জনের প্রসঙ্গই আসে না। নাটকের মধ্যে এই অংশটি পরিত্যক্ত হইলেও কোন ক্ষতি ছিল না।

এখন এই নাটকের 'বিসর্জন' নামকরণের তাৎপর্য কি, তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। কালী প্রতিমার বিসর্জন দিয়া এই নাট্যকাহিনীর উপসংহার হইয়াছে, সেই অর্থে নাটকের নাম 'বিসর্জন' হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। বিশেষত রঘুপতি কর্তৃক কালী প্রতিমার বিসর্জন কেবলমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক আচার পালন নহে, অর্থাৎ রঘুপতি কেবলমাত্র পূজাচার পালন সূত্রেই প্রতিমা বিসর্জন করেন নাই, তাঁহার ধ্যানধারণা এবং ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্র হইতেও চিরতরে তাঁহাকে বিসর্জন করিয়া দিয়াছেন। যে পূজাচার ঘিরিয়া রঘুপতির প্রাত্যহিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে চিরতরে তিনি প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্জন করিয়া দিলেন। রঘুপতির দিক হইতে এই প্রতিমা বিসর্জনের যে মূল্য, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই নাটকের এই নামকরণ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

কিন্তু নাটকের মধ্যে আর একটি মহত্তর বিসর্জনও ঘটিয়াছে, তাহা জয়সিংহের আত্মবিসর্জন। বিশেষতঃ জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের ভিতর দিয়াই রঘুপতির সত্যোপলব্ধি এবং তাহার ফলে তাহা কর্তৃক দেবী প্রতিমার বিসর্জন সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং ইহাই এই নাটকের 'বিসর্জন' নামকরণের যে মূল উদ্দেশ্য, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না এবং এই নামকরণ যে সার্থক তাহাও স্বীকার করিতে হয়। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের মধ্যে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল বলিয়া ইহার 'রাজর্ষি' নামকরণ সার্থক হইয়াছিল, কিন্তু 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তাহার ফলে ইহার 'বিসর্জন' নামকরণই সার্থক হইয়াছে।

'চিত্রাঙ্গদা'

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী নাট্যকাব্য 'চিত্রাঙ্গদা'। ইহা তাঁহার তত্ত্বমূলক রচনার অন্তর্গত। কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে তাঁহার সবে মাত্র 'মানসী'র যুগের অবসান হইয়াছে, তথাপি 'মানসী'র বিশিষ্ট কবি-মানসের প্রভাব তখন পর্যন্তও যে সুস্পষ্টভাবে তিরোহিত হয় নাই, এই নাট্য-কাব্যটির মধ্যে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। বরং ইহাকে 'মানসী' যুগের শেষ রচনা বলিয়া নির্দেশ করাই সমীচীন। এতদ্ব্যতীত তাহার পূর্ববর্তী নাট্য-রচনা 'রাজা ও রাণী'র আদর্শগত প্রভাবও ইহার উপর অনুভূত হয়। 'রাজা ও রাণী'র সুমিত্রা এবং 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যের চিত্রাঙ্গদা ইহাদের উভয়ের ভিতর দিয়াই কবি নারীর আত্মবোধের পরিচয় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। তথাপি 'চিত্রাঙ্গদা'র তত্ত্বগত পরিকল্পনা সুমিত্রা হইতে অধিকতর স্পষ্ট এবং ইহাতে কবির বক্তব্য বিষয় অধিকতর প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ইহার আখ্যান-ভাগ এই প্রকার—

মণিপুরের অপুত্রক রাজা তাঁহার একমাত্র কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে পুত্র-নির্বিশেষে পালন করিতেন। চিত্রাঙ্গদাও আশৈশব পুরুষের বিদ্যাই শিক্ষালাভ করিয়াছেন; পুরুষের বেশে পুরুষোচিত শৌর্য-বীর্যের সাধনা করিয়া নিজের নারীত্বের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। মণিপুর রাজ্যের নির্জন অরণ্যে অর্জুন ব্রহ্মচর্য সাধনায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলেন। মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া চিত্রাঙ্গদা একদিন তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, তাঁহার মধ্যে প্রকৃত পৌরুষের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের কপট পৌরুষের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। প্রকৃত পুরুষের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার অন্তর্লীন শাশ্বত নারী-প্রকৃতি বাহিরে জাগিয়া উঠিল। তিনি অর্জুনের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু এতকাল পৌরুষের সাধনায় চিত্রাঙ্গদার দেহ নারীসুলভ-কোমলতা-বর্জিত; অতএব তিনি কুৎসিত; অর্জুন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই প্রত্যাখ্যানের বেদনা চিত্রাঙ্গদাকে আঘাত করিল। তিনি অর্জুনের দুর্লভ প্রণয়ের অভিলাসে রূপ ও যৌবন লাভ করিবার জন্য মদন এবং বসন্তের তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপস্যায় প্রীত হইয়া মদন ও বসন্ত চিত্রাঙ্গদাকে মাত্র এক বৎসরের জন্য অনন্ত রূপ ও যৌবনের অধিকারিণী হইবার বর প্রদান করিলেন। এইবার চিত্রাঙ্গদা সহজেই অর্জুনের হৃদয় জয় করিলেন। অর্জুন তাঁহার রূপমোহে

আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মচর্যের সাধনায় জলাঞ্জলি দিলেন। চিত্রাঙ্গদার রূপযৌবনে অর্জুন আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইলেন। ক্রমে দৈহিক ভোগে তাঁহার অবসাদ দেখা দিতে লাগিল, তিনি চিত্রাঙ্গদার দেহোত্তীর্ণ অন্তরের পরিচয় পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। চিত্রাঙ্গদাও ছদ্মবেশ দিয়া অর্জুনকে আর ভুলাইতে চাহিলেন না, প্রকৃত রূপ প্রকাশ করিয়া নিজের পরিচয় দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। অর্জুনের হৃদয় হইতে ভোগ-লালসা অন্তর্হিত হইয়া গেল, চিত্রাঙ্গদাকে তিনি ভোগোত্তীর্ণলোকে লাভ করিতে চাহিলেন। এক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল, মদন ও বসন্তের বরের অবসান হইল, চিত্রাঙ্গদা নিজের প্রকৃত রূপ লইয়া অর্জুনের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার বাহ্যরূপ অন্তর্হিত হইল, কিন্তু মাতৃত্বের সম্ভাবনায় নারীত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করিল। অর্জুন এইবার চিত্রাঙ্গদার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন।

কাহিনীটি বাহ্যতঃ মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও, ইহাতে নাট্যকার নিজস্ব কল্পনার স্পর্শও দান করিয়াছেন। মহাভারতের আদিপর্বে পাওয়া যায়, অর্জুন মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া তাহাকে লাভ করিতে চাহেন; মণিপুররাজের নিকট গিয়া তিনি তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মণিপুররাজ এই বিষয়ে তাঁহার বংশে একটি রীতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহাকে কেহ বিবাহ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, বিবাহের পরও তাহাকে এখানেই থাকিতে হইবে, ইহার গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সেই ভবিষ্যতে মণিপুরের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে। অর্জুন ইহাতেই সম্মত হইয়া চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের এক পুত্রের জন্ম হয়, তাহার নাম বভ্রুবাহন। অর্জুন কয়েক বৎসর সেখানে বাস করিয়া পত্নীপুত্রকে সেখানে রাখিয়াই চলিয়া আসেন। মহাভারতের কাহিনীতে ইহার অতিরিক্ত আর কিছু নাই।

কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা নাট্য-সম্মত নহে, ইহা কাব্য-সম্মত। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি-জীবনের সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ চিত্র ইহা নহে, ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তি-চরিত্রের ক্রমবিকাশও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইখানেই 'রাজা ও রাণী'র সুমিত্রার সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার স্থূল পার্থক্য। সুমিত্রা সুসম্পূর্ণ নাট্যিক চরিত্র; কিন্তু চিত্রাঙ্গদা বিশেষ একটি তত্ত্বের বাহন। শাশ্বত নারীত্বের চিরন্তন আদর্শের প্রতীকরূপে এখানে চিত্রাঙ্গদাকে উপস্থিত করা

হইয়াছে। অর্জুনও তাহাই, অর্জুনও শাশ্বত পুরুষের আদর্শ। ইহাদের কাহারও কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপ নাই। সেইজন্য ইহাদের চরিত্রের ক্রমবিকাশও নাই। এই দুইটি আদর্শ চরিত্রের সহায়তায় কবি বিশেষ একটি তত্ত্বকথা ইহার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকৃতপক্ষে একটি কাব্য, ইহার নাট্যকাব্য আখ্যাও সমীচীন নহে। এইজন্য 'চিত্রাঙ্গদা'র অনেক সমালোচকই ইহাকে কাব্যের ক্ষেত্রে আনিয়া বিচার করিয়াছেন, নাট্যের ক্ষেত্রে ইহাকে স্থান দেন নাই।

কতকগুলি আদর্শ চরিত্রের সহায়তায় একটি তত্ত্বকথাকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে যে ইহার নাট্যিক মূল্য খর্ব হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার প্রধান চরিত্র দুইটির মধ্যে অন্তরের যে সূক্ষ্ম ভাব-বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার নাট্যিক মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার মধ্যে কামনার উদ্দামতা, আশাভঙ্গের নৈরাশ্য, মিলনের আনন্দ, লালসার তৃপ্তি, ভোগের অবসাদ এবং পরিপূর্ণ আত্মনিমজ্জনেও আত্মসচেতনতার যে মানসচিত্র পাওয়া যায়, তাহা পাঠকের নাটকীয় ঔৎসুক্য কখনও শিথিল হইতে দেয় না। এই সকল অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে যে মানবীয় অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ইহাকে এক অপরূপ নাট্যিক গৌরবও দান করিয়াছে।

এখন 'চিত্রাঙ্গদা'র তত্ত্বগত উদ্দেশ্যের কথা রবীন্দ্রনাথেরই অননুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করা যাউক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'অনেক বছর আগে রেলগাড়ীতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কল্‌কাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগুনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরু-প্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রস-সঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফল-সম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল, সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে, তা'হলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে বাতিল বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া

বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্র-শক্তি থাকে, তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ; যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলি-প্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চরিত্র-শক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।' (র-র-৩, 'চিত্রাঙ্গদা', সূচনা)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার ভিতর দিয়া সর্বত্র সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতারই সন্ধান করিয়াছেন; খণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁহার দৃষ্টি কোথাও সীমাবদ্ধ হয় নাই। এই নাট্যকাব্যের মধ্য দিয়াও তিনি নারী-সৌন্দর্যের চরম সার্থকতার কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন, নারীসৌন্দর্যের স্বরূপ কি, ইহার উদ্দেশ্যই বা কি এবং ইহার সার্থকতাই বা কোথায়—মুখ্যত এই বিষয়ই এই নাট্যকাব্যের বক্তব্য। নারীর সৌন্দর্য ও নারীর অন্তর ইহারা তুইটি পৃথক্ বস্তু। অন্তরের কামনার সার্থকতার পথে তাহার বাহিরের সৌন্দর্য সহায়ক মাত্র, কিন্তু তাহা তাহার শাশ্বত সম্পদ নহে, প্রয়োজনীয়তার অবসানে এই সৌন্দর্য অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। নারী-সৌন্দর্যের বিশেষ জৈব উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই নাই এবং এই জৈব উদ্দেশ্যের ভিতর দিয়াই নারী-জীবনের চরম সার্থকতা বা মাতৃত্ব প্রকাশ পায়। অতএব নারীর সঙ্গে তাহার সৌন্দর্যের শুধু এই ক্ষণিকের সম্পর্ক, তাহার বহিরঙ্গগত এই ক্ষণ-সৌন্দর্য তাহার অন্তরের কোন পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে না, অন্তরের সঙ্গে তাহাব কোন যোগই নাই; সেইজন্য তাহার অন্তর ও বাহির তুই স্বতন্ত্র জগৎ হইয়া দাঁড়ায়। অন্তরই চিরন্তন ও সত্য, বাহিরের রূপ ক্ষণিক বলিয়াই মিথ্যা, অথচ অন্তরের ইহাই তুর্গতির কথা যে, সে সত্য হইয়াও এক অসত্য বস্তুর আবরণে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে, নহিলে সে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, জীবনের আকাঙ্ক্ষিত চরম সার্থকতা অর্জন করিতে সক্ষম হয় না। এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনতিকাল পূর্বে রচিত 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের কবিতার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে 'মানসী'র অন্তর্গত 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি', 'ব্যক্ত প্রেম', 'গুপ্ত প্রেম', 'সুরদাসের প্রার্থনা', প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

মূলতঃ 'মানসী'র কবিতাগুলির ভাবই 'চিত্রাঙ্গদা'য় নাটকের আকারে প্রকাশ করা হইয়াছে।

'চিত্রাঙ্গদা'র মধ্যে যে এক নির্ভীক সত্যভাষণের দুঃসাহসিকতা আছে, তাহা একদিন রক্ষণশীল মনোভাবকে আঘাত করিয়াছিল। কেহ কেহ ইহার মধ্যে অশ্লীলতার সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিত্বে, কল্পনায়, অনুভূতিতে ও প্রকাশ-ভঙ্গির রস-বৈচিত্র্যে এই নাট্যকাব্যখানি এতই সমৃদ্ধ যে, ইহার সম্পর্কে কোন নৈতিক প্রশ্ন রসগ্রাহী পাঠকের মনে উদিত হইবার অবকাশই পায় না। কারণ, ভাষাগত অশ্লীলতা ত ইহাতে নাই-ই, এমন কি, অর্থগত অশ্লীলতা যেখানে যেটুকু আছে, কাব্য হিসাবে তাহা নিন্দনীয় নয় বলিয়াই অনুভূত হয়। অতএব নৈতিক আপত্তির যাহা মুখ্য অর্থাৎ ভাষা ও অর্থগত অশ্লীলতা, তাহা ইহাতে নাই। এই নাট্যকাব্যের সমগ্র পরিবেশটি এত রস-পুষ্ট ও কল্পনা-সমৃদ্ধ যে ইহা দ্বারাই রসিক মন গভীরভাবে চরিতার্থ হয়। ইহা তত্ত্বমূলক রচনা হইয়াও রস-প্রধান সৃষ্টি। তবে ইহাও সত্য যে, এই নাটকের বহিরঙ্গগত সুসমৃদ্ধ কাব্যরূপ ইহার অন্তরগত তত্ত্বকথার সহিত সহজ সংযোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। যদি তাহা পারিত, তবে ইহার সম্বন্ধে কোন নৈতিক আপত্তির কথা উঠিবার অবকাশ পাইত না; রবীন্দ্র-প্রতিভার ইহা একটি সাধারণ ত্রুটি। কারণ, যেখানেই রবীন্দ্রনাথ কাব্যের পাত্রে তত্ত্ব পরিবেশন করিতে গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার এই ত্রুটি ঘটিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। তবে এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, প্রায় সর্বত্রই তাহাদের কাব্যাংশই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং তত্ত্বাংশ গৌণ স্থান অধিকার করিয়া আছে মাত্র। 'চিত্রাঙ্গদা'র কাব্যাংশই মুখ্য, তত্ত্বাংশ গৌণ মাত্র; অতএব ইহাদের মধ্যে সহজ সংযোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই বলিয়া অন্তত কাব্য-রসিকের মন অতৃপ্তি বোধ করিতে পারে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, 'চিত্রাঙ্গদা'য় নাট্যিক চরিত্র-সৃষ্টির কোন প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য ইহার কাহিনীর সুসঙ্গত নাট্যিক পরিণতির অভাব লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ পরিতাপ করিয়াছেন। ইহার নায়ক অর্জুন কোন ব্যক্তি-চরিত্র নহে; মহাভারত হইতে এই চরিত্রের নামটি গৃহীত হইলেও মহাভারতের বীর অর্জুন চরিত্রের সঙ্গে তাহার কোনই সম্পর্ক নাই; অর্জুন চিরদিনের পুরুষ এবং চিত্রাঙ্গদাও চিরন্তনী নারী, তবে নারীসুলভ কোমলতা বর্জিত 'আপনাতে আপনি অটলমূর্তি'। পুরুষের মনে নারী-সম্পর্কিত যে ধারণা চিরন্তন, তাহাই অর্জুনের ভিতর দিয়া

ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ভোগের তৃষ্ণা আছে, কৃত্রিম আদর্শের সাধনা দ্বারা তাহা সাময়িক ভাবে রুদ্ধ হইলেও অনুকূল অবসরে তাহা সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। নারীর সৌন্দর্যই পুরুষের ভোগতৃষ্ণা জাগ্রত করিয়া দেয়; নারীর অন্তরগত যে নারীত্ব তাহা প্রথম দৃষ্টিতে পুরুষের অগোচরেই থাকিয়া যায়। কিন্তু নারী-সৌন্দর্যভোগই পুরুষের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু নহে, সুতরাং এই ভোগে তাহার অবসাদ আসে। পৌরুষের সাধনাই তাহার জীবনে সত্য, তবে জৈব ধর্ম পালনের ভিতর দিয়া কল্যাণের পথে সে সেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

চিত্রাঙ্গদাও এমনি শাশ্বতী নারী (eternal woman)। নারীর নারীত্ব বিসর্জন দিয়া পুরুষকারের সাধনা বৃথা। প্রকৃত পুরুষের প্রতি তাহার আকর্ষণ দুর্নিবার। তাহার এই আকর্ষণকে সফল করিয়া তুলিবার পথে রূপই তাহার একমাত্র সহায়। পুরুষের সঙ্গে নারীর মিলন মাতৃত্বলাভের ভিতর দিয়া চরম সার্থকতা লাভ করে।

নারী রক্ত-মাংসে গঠিতা সুখদুঃখ আশানৈরাশ্যের অনুভূতিময়ী—সে দেবী নহে। সে পুরুষের শক্তি আয়ত্ত করিতে পারে না সত্য, কিন্তু নিজের স্বভাবজ শক্তি দ্বারা পুরুষের সাধনার পথে সহায়ক হইতে পারে। নারী পুরুষের অবহেলার বস্তু নহে। নারী-সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের এই ধারণার মূলে পাশ্চাত্ত্য প্রেরণাই যে কার্যকারী হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীজাতি সম্পর্কিত নানা প্রগতিশীল আন্দোলনের ফলে নারীর আত্মবোধ সম্পর্কে যে ধারণা এদেশে সৃষ্টি হইয়াছিল, 'চিত্রাঙ্গদা' চরিত্রে তাহাই স্থান লাভ করিয়াছে। এ কথা সত্য, মধুসূদনের Ovid-অনুসারী রচনা 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'ই বাংলা সাহিত্যে এই ভাবের প্রথম প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহারই ধারা অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতে পারে। তবে এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গেও যোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথ যে কালিদাস-রচিত 'কুমারসম্ভবম্' কাব্য দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, নানা সূত্র হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যেও তাহার প্রভাব আছে। তবে 'কুমারসম্ভব কাব্যে'র উমার তপস্যার পরিবর্তে এখানে যে মদন ও বসন্তের বর লাভ করিবার কথা আছে, তাহাতে কুমারসম্ভবের তুলনায় ইহার কাব্যগুণ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। প্রকৃত তপস্যার মধ্য দিয়া উমা-চরিত্র যেভাবে বিকাশ লাভ করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, বরলাভের অলৌকিক উপায়ের মধ্য দিয়া চিত্রাঙ্গদার চরিত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই।

দুইটি রূপক চরিত্র এই নাট্যকাব্যের মধ্যে আনিয়া অপরূপ কৌশলে স্থান দেওয়া হইয়াছে—তাহা মদন ও বসন্ত। ইহাতে 'চিত্রাঙ্গদা'র কাব্যগুণ বৃদ্ধি. পাইতে পারে নাই। মদন চিত্রাঙ্গদার মনোভাবের রূপক, প্রকৃতপক্ষে মদন চিত্রাঙ্গদারই অন্তরের প্রসারিত রূপ। বসন্ত বাহিরের লীলাচঞ্চল সৌন্দর্যের প্রতিনিধি। চরিত্র দুইটি এই নাট্যকাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে।

সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য এই নাট্যকাব্যের ভাষা। রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার ইহা সমৃদ্ধতম নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাট্যকাব্যে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব; তাঁহার এই নিজস্ব অমিত্রাক্ষর ছন্দ স্থষ্টির মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা'র ভাষাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহার স্বচ্ছন্দ গতি, সাবলীল ভঙ্গি, ও অপরূপ রসব্যঞ্জনা কাব্যের দিক দিয়া ইহাকে অপূর্ব গৌরব দান করিয়াছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের ভাষা এই 'চিত্রাঙ্গদা'র মধ্যে আসিয়া সার্থক পরিণতি লাভ করিয়াছে। যদিও তাঁহার বহু নাট্যকবিতা ইহার পরও এই অমিত্রাক্ষর ছন্দেই রচিত হয়, তথাপি 'চিত্রাঙ্গদা'র মধ্যেই তাহার স্থপরিণত রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্য-রচনার ক্ষেত্রেও এই যুগেই রবীন্দ্র-প্রতিভা ভাষার দিক দিয়া চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

'মালিনী'

'বিসর্জন' নাটকের যে সকল ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা অনতিকাল ব্যবধানে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু লইয়া রচিত 'মালিনী' নাটকেই অনেকাংশে সংশোধন করা হইয়াছে। 'বিসর্জন'-এর পর 'মালিনী'ই রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ নাট্য রচনা। শুধু তাহাই নহে, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার যে ধারার সূত্রপাত হইয়াছিল, 'মালিনী'র ভিতরই তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। কবি নিজেও বলিয়াছেন, 'মালিনী'র মধ্যে যে ভাবটি বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার অঙ্কুর আপনা আপনি দেখা দিয়াছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার যুগের একদিকে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও আর একদিকে 'মালিনী'।

'মালিনী' প্রধানত প্রেম-বিষয়ক নাটক নহে, ইহার মধ্যে প্রেমের কথা থাকিলেও, তাহার সুপরিণত বিকাশের কথা নাই। এমন কি, 'বিসর্জন'-এর মধ্যে অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রেম মূল নাট্যকাহিনীর যতটুকু অংশ অধিকার করিয়াছে, 'মালিনী'র প্রেম-বিষয় মূল কাহিনীর মধ্যে ততখানিও অংশ অধিকার করিতে পারে নাই। 'মালিনী'তে প্রেম-বিষয় সুদূর গৌণ, ইহার মুখ্য বিষয়টি স্বতন্ত্র। তাহা পরে আলোচিত হইতেছে। পূর্বে কাহিনীটি বর্ণনা করা যাউক।

রাজকন্যা মালিনী বৌদ্ধ ধর্মগুরু কাশ্যপের নিকট হইতে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ ইহাতে কুপিত হইয়া রাজার নিকট রাজ-কন্যার নির্বাসন দাবি করিলেন। রাজা মালিনীকে তাঁহার নূতন ধর্মগ্রহণের জন্য ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। মহিষী রাজাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন ; কিন্তু মালিনী নিজেই রাজার নিকট নিজের নির্বাসন প্রার্থনা করিলেন। কেবল মহিষী রাজকন্যাকে রাজা ও প্রজাদের রোষ হইতে আড়াল করিয়া রাখিতে লাগিলেন। একদিন ব্রাহ্মণগণ রাজকন্যার নির্বাসনের দাবি লইয়া রাজপ্রাসাদের দ্বারে আসিয়া সমবেত হইলেন। তাঁহাদের নায়ক দুই ব্রাহ্মণ যুবক—ক্ষেমঙ্কর এবং সুপ্রিয়। ক্ষেমঙ্কর দৃঢ়চিত্ত ও আচার-বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ এবং প্রকৃত সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণদিগের প্রতিনিধি, কিন্তু সুপ্রিয় আজন্ম কল্যাণধর্মে দীক্ষিত—নির্দোষের নির্বাসন তাহার অন্তঃকরণ কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিল না। বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ সুপ্রিয়কে

পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন; কিন্তু সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের আশৈশব বন্ধু, ক্ষেমঙ্কর তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ধর্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ শক্তিদেবীর উদ্বোধন করিতে লাগিলেন, এমন সময় মালিনী আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন; তাঁহার পরিচয় এবং তাঁহার নিকট হইতে সদয় ব্যবহার লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রতি দ্রোহবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন, মাতৃ-সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিয়া লইলেন এবং সকলে মিলিয়া তাঁহাকে পুনরায় রাজপ্রাসাদে রাখিয়া আসিলেন। সুপ্রিয় মালিনীকে দেখিয়া তাহার প্রতি নিজের অলক্ষ্যেই আকৃষ্ট হইল, ক্ষেমঙ্কর তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন; ব্রাহ্মণগণও যে মালিনীকে দেখা মাত্র তাঁহাদের সঙ্কল্প বিসর্জন দিয়াছেন, তাহাও ক্ষেমঙ্কর বুঝিলেন। তিনি মালিনীকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য সুপ্রিয়র নিকট বিদায় লইয়া গেলেন।

প্রজারা নিত্য রাজপ্রাসাদে আসিয়া মালিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁহার শিষ্ট আচরণে নিজেরা কৃতার্থ হয়। সুপ্রিয় মালিনীর সঙ্গে নিত্য সাক্ষাৎ করে, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার গৃহের কথা, তাহার বন্ধু ক্ষেমঙ্করের কথা মালিনী বিস্তৃত করিয়া জানিয়া লন। সুপ্রিয়র সহিত ক্ষেমঙ্করের সম্পর্কের কথা, তাঁহাদের বন্ধুত্বের সকল বৃত্তান্ত, ক্ষেমঙ্করের সঙ্কল্পের কাহিনী সুপ্রিয় সমস্তই মালিনীর কাছে ব্যক্ত করে। ক্রমে প্রজাগণ বাহির হইতে ফিরিয়া যায়, সুপ্রিয়র সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মালিনী তাহাদিগকে দর্শন দান করিবার অবসর পান না।

সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্করের নিকট হইতে গোপনে একদিন সংবাদ পাইলেন যে, তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া মালিনীর পিতৃরাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। মালিনীর প্রতি অনুরাগ বশতঃ সুপ্রিয় এই সংবাদ রাজার নিকট প্রকাশ করিয়া দিল। রাজা সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া গিয়া ক্ষেমঙ্করকে পথিমধ্য হইতে বন্দী করিয়া আনিলেন। রাজা সুপ্রিয়কে এই সংবাদ দানের জন্য পুরস্কার দিতে চাহিলেন। সুপ্রিয় তাঁহার আশৈশব বন্ধুত্ব বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু তাহার জন্য পুরস্কার লইতে চাহিল না। এমন কি, রাজার ইঙ্গিত সত্ত্বেও মালিনীর পাণিপ্রার্থনা পর্যন্ত করিলেন না। রাজা ক্ষেমঙ্করের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। মালিনী পিতার নিকট তাঁহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রাজা ভাবিলেন, ক্ষেমঙ্করের জীবন রক্ষা

করিয়াই তিনি সুপ্রিয়র কার্যের পুরস্কার দিবেন; কিন্তু তাহার পূর্বে তিনি ক্ষেমঙ্করকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিলেন। শৃঙ্খলবদ্ধ বন্দীকে রাজার সম্মুখীন করা হইল। রাজা তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু ক্ষেমঙ্কর বিদ্রোহাচরণ পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। বিশ্বাসঘাতক সুপ্রিয় তাঁহার নিকটবর্তী হইলে তিনি ঘৃণায় তাহার আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করিলেন। সুপ্রিয় এই অপমান নিঃশব্দে সহ্য করিল। মালিনীর প্রণয়কেই সে ধর্ম বলিয়া জানিয়াছে, কিন্তু ক্ষেমঙ্কর মৃত্যুকেই ধর্মরাজ বলিয়া জানেন। মৃত্যুর মধ্যেই ধর্মের চরম পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য ক্ষেমঙ্কর বন্ধু সুপ্রিয়কে তাঁহার নিকটে আহ্বান করিলেন। সুপ্রিয় সেই আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে নিকটবর্তী হইবা মাত্রই ক্ষেমঙ্কর শৃঙ্খল দ্বারা সুপ্রিয়র মস্তকে আঘাত করিলেন, সুপ্রিয় তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ক্ষেমঙ্কর তাহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া ঘাতককে আহ্বান করিলেন, রাজাও সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিয়া খড়্গ লইয়া আসিবার আদেশ দিলেন। সেই মুহূর্তে মালিনী ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করিবার জন্য রাজার নিকট আবেদন জানাইয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

কাহিনী এবং বক্তব্য বিষয়ের দিক দিয়া এই নাটকখানির 'বিসর্জন'-এর সহিত সাদৃশ্য আছে। 'বিসর্জন'-এর রঘুপতি 'মালিনী'র ক্ষেমঙ্কর, 'বিসর্জন'-এর জয়সিংহ, 'মালিনী'র সুপ্রিয়, 'বিসর্জন'-এর অপর্ণা 'মালিনী'র মালিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। 'বিসর্জন'-এ নাট্যকাহিনীর পরিণতি যে ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে, 'মালিনী'র মধ্যেও তাহাই করা হইয়াছে। বক্তব্য বিষয়ও উভয় নাটকের মধ্যে অভিন্ন। উভয় নাটকেই চিরাচরিত সামাজিক প্রথা এবং আচারের উপর হৃদয়ধর্মকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। পূর্বের আলোচনা হইতেও দেখা গিয়াছে যে, সংস্কার-ধর্ম কিংবা ব্যক্তিধর্মের উপর রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে কল্যাণধর্মকে স্থান দিয়াছেন।

বাহ্য ও অন্তরগত এই সকল সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে অনৈক্যও নিতান্ত অল্প নহে। 'বিসর্জনে'র কাহিনী-বিন্যাস বিস্তৃততর, 'মালিনী'তে তাহা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। 'মালিনী'র কাহিনীগত এই সংক্ষিপ্ততা ইহার একটি বিশিষ্ট কাব্যগুণ বলিয়াই অনুভূত হয়; নাটক হিসাবে ইহা বিশেষ ত্রুটিমূলক বিবেচিত হইতে পারে। রঘুপতি নাট্যিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া নিজের চরিত্র যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, নিষ্ক্রিয় এবং বাক্-সর্বস্ব ক্ষেমঙ্কর তাহা

সেইভাবে পারেন নাই। সেইজন্য ক্ষেমঙ্কর অপেক্ষা রঘুপতির মধ্যে নাট্যিক গুণ অধিক। অনাবশ্যক ঘটনা, অতিরিক্ত চরিত্র-সমাবেশ 'মালিনী'তে কৌশলে পরিবর্জন করা হইয়াছে। ইহার কাহিনী প্রথম হইতেই যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, কোথাও শ্লথ হইয়া পড়িবার অবকাশ পায় নাই; এই ভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়া কাহিনীর পরিণতি মুহূর্তটিকে অপূর্ব নাট্যিক গৌরব দান করিয়াছে। অতিভাষণ এবং দীর্ঘ স্বগতভাষণ 'বিসর্জন'-এর একটি বিশিষ্ট ত্রুটি, 'মালিনী' প্রায় এই ত্রুটি-বর্জিত। চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়াও 'মালিনী' অধিকতর সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সংস্কার ধর্মের প্রতিনিধিরূপে কল্পনা করিয়াও 'বিসর্জন'-এর রঘুপতিকে কি ভাবে যে নাট্যকার তাঁহার চরিত্রগত দৃঢ়তা দ্বারা সৃষ্টি করিতে ব্যর্থকাম হইয়াছেন, তাহার কথা আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু 'মালিনী'র সম্পর্কে এই কথা বলিতে পারা যায় না। রঘুপতি প্রথম হইতেই তাঁহার আচার-ধর্মের উপর তাঁহার হৃদয়-ধর্মকেই স্থান দিয়াছিলেন; কিন্তু ক্ষেমঙ্করের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুপ্রিয়র প্রতি স্নেহ তাঁহার আন্তরিক হইলেও, তাহা তাঁহার ধর্মবিশ্বাসকে জয় করিতে পারে নাই। রঘুপতির জীবনে যেমন তাঁহার ধর্মবিশ্বাস সত্য ছিল না, জয়সিংহের প্রতি স্নেহই সত্য ছিল, ক্ষেমঙ্করের মধ্যে একমাত্র ধর্মবিশ্বাসই সত্যরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। এইজন্য রঘুপতি অপেক্ষাও ক্ষেমঙ্করের মধ্যে চরিত্রসৃষ্টি অধিকতর সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কারণ, উভয় নাটকেই আদর্শের বিরোধের ভিতর দিয়া দ্বন্দ্বের অবতারণা করা হইয়াছে। অতএব যে দুইটি আদর্শ লইয়া প্রকৃত দ্বন্দ্বের উৎপত্তি, তাহাদের পারস্পরিক বিরোধ অনমনীয় দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে নাট্যিক বিক্ষোভ তত উচ্চগ্রামে পৌঁছিতে পারে না। কারণ, ইহার মধ্যেই নাটকের করুণ পরিণতির বীজ সমাহিত হইয়া আছে। এই বিচারে রঘুপতি ক্ষেমঙ্কর অপেক্ষা দুর্বল, যে নিঃস্বার্থ আদর্শ-নিষ্ঠা ক্ষেমঙ্করের চরিত্রকে অপূর্ব গৌরব দান করিয়াছে, রঘুপতির তাহার অভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে ক্ষেমঙ্করের পরিকল্পনাই সর্বাপেক্ষা সার্থক। বাহিরের অটুট গাম্ভীর্যের সঙ্গে অন্তরের অবিচল দৃঢ়তার সংযোগে ক্ষেমঙ্করের চরিত্র এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

সুপ্রিয়র চরিত্রও 'বিসর্জন'-এর জয়সিংহ চরিত্র হইতে অধিকতর সার্থক। সুপ্রিয় প্রথম হইতে কল্যাণধর্মে দীক্ষিত। এই দীক্ষা তাঁহার অন্তরের

স্বাভাবিক প্রেরণা হইতে জাত, ইহাতে বাহিক কোন প্রভাব নাই। তাঁহার এই বিশ্বাসের মধ্যে কোন সংশয়ও নাই। যে সন্দেহ এবং সংশয় জয়সিংহের জীবনকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার লেশ মাত্র স্পর্শ সুপ্রিয়র উপর অনুভব করিতে পারা যায় না। তবে সে দুর্বল-চিত্ত—নিজের বিশ্বাসকে সত্য বলিয়া জানিলেও, তাহা অবলম্বন করিয়া থাকিবার দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রে নাই। এইজন্য সে কল্যাণধর্মে দীক্ষিত হইয়াও তাহাই তাহার জীবনের একান্ত ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। শুভবুদ্ধির প্রেরণা তাহার অন্তরের মধ্যে উদিত হইত, কিন্তু তাহা জীবনে কাযকরী করিয়া লইবার মত সচেষ্টতার অভাব তাহার ছিল। ক্ষেমঙ্করের বিরোধী চরিত্র হিসাবে তাহাকে কল্পনা করা হইয়াছে। ক্ষেমঙ্কর আচারধর্মের দাস, সুপ্রিয় হৃদয়ধর্মের অধীন। সাধারণ কল্যাণবুদ্ধি দ্বারাই সে মালিনীর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়, তারপর মালিনীর জন্য তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগের সঞ্চার হয়, মালিনীর প্রতি এই অনুরাগই তাহাকে আশৈশব বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতায় প্ররোচিত করে। তারপর আবার যখন সে বন্ধুর সম্মুখীন হইল, তখন বন্ধুর হাত হইতে মৃত্যু বরণ করিয়া আত্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। অতএব হৃদয়ধর্মবোধ তাঁহার সবত্রই অত্যন্ত প্রবল এবং তাহাই তাহার জীবনের শোচনীয় পরিণতির একান্ত স্বাভাবিক কারণ। হৃদয়ধর্মের স্রোতোবেগে সে যেন এই পরিণতির পথে তাঁহার অজ্ঞাতেই অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। সেইজন্য ক্ষেমঙ্করের হাত হইতে মৃত্যুবরণ তাহার এত সহজ বলিয়াই অনুভূত হয়। 'বিসর্জন'-এর জয়সিংহের পরিণতি এবং 'মালিনী'র সুপ্রিয়র পরিণতি অভিন্ন। তথাপি সুপ্রিয়র পরিণতি যত সহজ ভাবে সম্ভব হইয়াছে, জয়সিংহের পরিণতি তত সহজ ভাবে নিষ্পন্ন হয় নাই। গ্রীক্ ট্র্যাজিডির মত এক অলক্ষ্যগোচর নির্মম পরিণতির দিকে সুপ্রিয় সে ভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই। জয়সিংহের চরিত্রের পরিণতির মধ্যে যে আকস্মিকতা রহিয়াছে, সুপ্রিয়র মধ্যে তাহা নাই। সহস্র শুভ প্রেরণা সত্ত্বেও মানুষ যে-নিয়তিকে কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না, সুপ্রিয় তাহারই অমোঘ দণ্ড নিঃশব্দে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কবল হইতে পরিত্রাণের যেমন কোন উপায়ও ছিল না, তিনি তাহার প্রয়াসও করে নাই; হৃদয়ধর্মের স্রোতোবেগে সে কেবল ভাসিয়াই চলিয়াছে, ক্ষুদ্রতম তৃণখণ্ড তাঁহার হাতের কাছ দিয়া ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াও তাহা অবলম্বন করিবার জন্য কখনও হস্ত প্রসারণ

করে নাই। ট্র্যাজেডির উপাদান হিসাবে এই চরিত্রের পরিকল্পনাই সমধিক সার্থক।

মালিনীর চরিত্র অপর্ণারই প্রসারিত রূপ। অপর্ণা নাট্যিক চরিত্ররূপে সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, ইহার ভাব-সর্বস্ব পরিকল্পনা অনেক স্থলেই নাটকের মধ্যে পীড়াদায়ক। কিন্তু মালিনী সার্থক নাট্যিক চরিত্ররূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে। কল্যাণধর্মের প্রতীকরূপে মালিনীকে কল্পনা করা হইলেও, তাঁহার মানবিক চরিত্রের বিকাশ কোন ক্ষেত্রেই ব্যাহত হয় নাই। তবে মুখ্যত ধর্ম অবলম্বন করিয়া তাঁহার চিত্তের বিকাশ হইয়াছে বলিয়া, তাহাতে সাধারণ মানব-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেকখানি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মানবিক চরিত্র-বিকাশ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ না হইলেও, ইহার মধ্যে কোন মৌলিক অসঙ্গতি নাই।

মালিনী কল্যাণধর্মে দীক্ষিতা। আনুষ্ঠানিক ধর্মের উপর যে কল্যাণ-ধর্মের স্থান, নাট্যকার তাহা তাঁহার ভিতর দিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের প্রধান কথা এই যে, বিরোধের মধ্য দিয়া তাঁহার সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, বরং প্রেম এবং ক্ষমার মধ্য দিয়াই তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কাহাকেও প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করিয়া তাঁহার সত্য প্রচারিত হয় নাই, বরং নিজের দুঃখের দহনে তিনি সত্যের প্রদীপ জ্বালিয়াছেন। কল্যাণমন্ত্রে দীক্ষিত 'বিসর্জন'-এর গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে মালিনীর ইহাই মৌলিক পার্থক্য। মালিনীর দুঃখের মহিমার মধ্যেই কাব্যরস ব্যক্ত হইয়াছে। লৌকিক বিচারে মালিনীর দুঃখ, দুঃখ বলিয়া বিবেচিত হইলেও, এই নাট্যকাহিনীর যে আরও একটা মহত্তর দিক আছে, তাহার বিচারে দেখা যায় যে, এই দুঃখের মধ্য দিয়াই মালিনীর পরম গৌরব ঘোষিত হইয়াছে। মালিনী-চরিত্রের লৌকিক দিকটা নিতান্ত গৌণ বলিয়া লৌকিক দুঃখ অপেক্ষা তাহার মহত্তর ক্ষমার গৌরবই এই নাটকের মধ্যে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে এবং মনে হয় প্রকৃত কাব্যরস তাহাই।

মালিনী চরিত্রের লৌকিক দিকটির প্রতি অধিকাংশ সমালোচকই অতিরিক্ত জোর দিয়াছেন বলিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহার চরিত্র অনেকেই ভুল বুঝিয়াছেন, কেহ বা ইহা অস্পষ্ট বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। বিষয়টি একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনার যোগ্য। সুপ্রিয়কে চোখের সম্মুখে হত্যা করিতে দেখিয়াও ক্ষেমঙ্করকে কেন যে মালিনী ক্ষমা করিবার জন্য রাজার নিকট প্রার্থনা

জানাইলেন, তাহা অধিকাংশ সমালোচকই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ, মালিনীর চরিত্রটি তাঁহারা নিতান্ত লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, সাধারণ লৌকিক ধারার অনুবর্তন করিয়া মালিনীর চরিত্রের বিকাশ হয় নাই; গুরু কাশ্যপের নিকট হইতে ত্যাগ ও ক্ষমার যে আদর্শ তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অনুভূতিতে কোথাও তাঁহার আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তাঁহার জীবনের আদর্শ ও জীবনের আচরণ উভয়ের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই। সুপ্রিয়র সান্নিধ্যে তাঁহার কুমারী-হৃদয়ের প্রথম বিকাশ অনুভূত হইলেও, তাহা কখনই সুপ্রিয়কে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করে নাই। সুপ্রিয়র সান্নিধ্য তিনি কামনা করেন সত্য, কিন্তু এই কামনা যেমন কখনও মুখ্য হইয়া উঠে নাই, তেমনই সুপ্রিয়র জন্যই যে বিশেষ ভাবে এই কামনা, তাহাও অনুভব করা যায় না। তাঁহার সেই অনুভূতি তখনও প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ কোনও ব্যক্তিকে অবলম্বন করিতে পারে নাই; প্রেম এবং ক্ষমা দ্বারা তিনি বিরুদ্ধ মতকে জয় করিয়াছেন, সুপ্রিয়র বন্ধু ক্ষেমঙ্করের বিরুদ্ধতাকেও স্বভাবতই তিনি এই কল্যাণমন্ত্রেই জয় করিতে চাহিলেন, শেষ দৃশ্যে মহত্তর ক্ষমার মধ্য দিয়া তিনি প্রকৃতই ক্ষেমঙ্করকে বা ক্ষেমঙ্করের আদর্শকে জয় করিয়াছেন। তাঁহার মানবিক নারী-মনের যে বিকাশটুকুর প্রতি নাট্যকার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা শেষ পর্যন্ত অপরিস্ফুটই রহিয়া গেল, তাহা পূর্ণতম বিকাশের সুযোগ পাইল না। অতএব দেখা যাইতেছে, মালিনী সুপ্রিয়কে যে ভাল-বাসিয়াছিলেন, তাহা নহে—ক্ষেমঙ্করকেও যে ভালবাসিতেন, তাহাও অস্পষ্টই রহিয়াছে এবং তাঁহার শেষ দৃশ্যের শেষ কথা, 'মহারাজ, ক্ষম ক্ষেমঙ্করে' যে 'অভিভূত চৈতন্যের এক মুহূর্তের অপূর্ব অভিব্যক্তি' তাহাও মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এই নাট্যকাহিনীর সূচনা হইতেই তাঁহার যে ক্ষমাগুণে দীক্ষা হইয়াছিল, নির্বাসনকামী প্রজাগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সুপ্রিয়র হত্যাকারী ক্ষেমঙ্করের মধ্যে পর্যন্ত তাহারই অভিন্ন অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, মালিনীর জীবনের একান্ত মানবিক প্রেমই এই নাটকে মুখ্য নহে, তাহার আদর্শনিষ্ঠাই মুখ্য। সেই জন্য ইহা মুখ্যত প্রেমবিষয়ক নাটক নহে; মালিনীর অপরিস্ফুট প্রণয়াভাসকে ইহাতে মুখ্যস্থান দিলে ইহার মূল বক্তব্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, নাট্যকাব্য রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকে প্রেম অপেক্ষা করুণাকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন, প্রেম-বিষয়ক গীতি-নাট্য রচনার যুগ অতিক্রম করিয়াই তিনি করুণা-বিষয়ক নাট্যকাব্য রচনার যুগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই যুগে প্রেমের সংস্কার কতকটা অবশিষ্ট থাকিলেও তাহাই মুখ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই—করুণাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য মালিনীর জীবনে প্রেমের সংস্কার অপেক্ষা করুণার সংস্কারই অধিকতর শক্তিশালী হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই প্রেরণায় তাঁহার এই সর্বশেষ উক্তি 'ক্ষম ক্ষেমঙ্করে' সম্ভব, সঙ্গত এবং স্বাভাবিক হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধসাহিত্যের অন্তর্গত 'মহাবস্তু অবদান' গ্রন্থের 'মালিন্যাবস্তু' হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মালিনী নাটকের কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। মূল কাহিনীটি এই প্রকার ঃ

একদিন প্রত্যেকবুদ্ধ গ্রামে ভিক্ষার্থ বাহির হইলেন ; কিন্তু কোন ভিক্ষা না পাইয়া গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া যখন ভিক্ষার্থ অন্যত্র যাইবার উদ্যোগ করিয়াছেন, তখন একজন ভক্তিপরায়ণ সমৃদ্ধ গ্রামবাসী তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধ গ্রামান্তরে যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। এই গ্রামবাসীর কন্যা পবিত্র চিত্ত ও শুচি বস্ত্র পরিহিতা হইয়া তাঁহার সেবা কার্য করিতে লাগিলেন। এই সৎকর্মের পুরস্কার স্বরূপ সেই গ্রামিকের কন্যা স্বর্গলোকে অপ্সরারূপে জন্মগ্রহণ করেন, তারপর সেখান হইতে পুনরায় কাশীতে কৃকি রাজার কন্যারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। রাজকন্যার নাম মালিনী। রূপে এবং গুণে তিনি সকল রাজকন্যাদিগের মধ্যে অতুলনীয়া হইলেন।

কাশীরাজ পরম ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কৃকি ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি করিতেন। তিনি কন্যাকে ব্রাহ্মণদিগের সেবা কার্যে নিযুক্ত করিলেন ; মালিনী ব্রাহ্মণদিগকে পরম যত্নে সেবা করিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন, তাঁহারা রাজকন্যার রূপ লাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং তাহাকে লাভ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, ইহারা কেহই ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই। রাজকন্যা ইহা বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিরক্ত হইলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহারা সেবার অযোগ্য।

এমন সময় একদিন মালিনী পিতার প্রাসাদ-শিখর হইতে পথিমধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বিগতপাপ এবং শেষবারের মত শরীর ধারণ করিয়া নির্বাণলাভের যোগ্য হইয়াছেন। রাজকন্যা তাঁহাদিগকে

প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানাইলেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি তাঁহাদিগকে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ তাঁহার আমন্ত্রণে রাজপ্রাসাদে আগমন করিয়া তাঁহার প্রদত্ত ভোজ্য গ্রহণ করিলেন। রাজকন্যা লোকনাথ কাশ্যপকে আমন্ত্রণ জানাইলেন, তিনিও আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া রাজকন্যার নিকট হইতে সেবা ও পরিচর্যা গ্রহণ করিলেন। ভগবান কাশ্যপ তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দিয়া বিদায় হইলেন।

বিশ হাজার ব্রাহ্মণ প্রতিদিন কৃকিরাজের প্রাসাদে আহার্য ও সেবা লাভ করিতেন। তাঁহাদের পরিবর্তে ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি মালিনীর আকর্ষণ দেখিতে পাইয়া তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজকন্যার প্রতি ইহার প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিলেন। রাজাকে তাঁহারা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি রাজকন্যা মালিনীর পক্ষ-পাতিত্বের কথা জানাইলেন এবং রাজকন্যাকে দণ্ড দিবার জন্য তাঁহাদের হাতে সমর্পণ করিবার দাবী করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণদিগের বিদ্রোহের ভয়ে রাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং তাঁহাকে ব্রাহ্মণদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া স্থির করিলেন।

মৃত্যুর জন্য মালিনী ব্রাহ্মণদিগের নিকট এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল, সপ্তাহান্তে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া স্থির হইল। এই এক সপ্তাহ কালকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য মালিনী নানা আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রথম দিবসে তিনি ভগবান কাশ্যপসহ ভিক্ষুসঙ্ঘকে আহার করাইলেন। আহারান্তে তাঁহারা রাজপরিবারের সকলকে ধর্মকথা শুনাইলেন। দ্বিতীয় দিবসে ভগবান কাশ্যপ পাঁচশত রাজপুত্রকে দীক্ষা দিলেন, তৃতীয় দিন রাজার পরিজনগণ ধর্মকথা শুনিল, চতুর্থ দিন রাজার মন্ত্রিগণ, পঞ্চম দিনে রাজ্যের সেনাপতিগণ, ষষ্ঠ দিনে রাজার আচার্য গুরু স্বয়ং এবং সপ্তম দিবসে নগরের অধিবাসিগণ সকলেই ভগবান কাশ্যপের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। সাতদিনের মধ্যে কাশীর রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রজা পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল। তাহারা সকলেই ভাবিল, মালিনী আমাদিগের চক্ষু খুলিয়া দিলেন, আমাদিগকে কল্যাণমার্গে অগ্রসর হইবার সাহায্য করিলেন। সকলে সমবেত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের হাত হইতে মালিনীর প্রাণরক্ষায় ব্রতী হইল। ব্রাহ্মণগণ ভয় পাইয়া গেলেন, তাঁহারা মালিনীর উপর হইতে মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। এইবার তাঁহারা ভগবান্ কাশ্যপকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে তাঁহাকে

বধ করিবার জন্য তাঁহার নিকটে গেল, ভগবান কাশ্যপ তাহাকেই মৈত্রী দ্বারা বশ করিয়া নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। ব্রাহ্মণগণ নিবৃত্ত হইলেন না, অবশেষে ভগবান কাশ্যপ পৃথিবী দেবতাকে আহ্বান জানাইলেন, পৃথিবী দেবতা একটি বৃহৎ তালগাছ কাঁধে লইয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাড়া করিয়া গেলেন, ব্রাহ্মণেরা বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

এই মূল কাহিনীটিকে কি ভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মালিনী' নাটকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। বৌদ্ধ কাহিনী মাত্রেই একটি সম্প্রদায়গত (Sectarian) মনোভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে, এখানেও তাহা পাইয়াছে। সেবাপরায়ণা রাজকন্যার প্রতি ব্রাহ্মণদিগের কামাসক্তির কথা বৌদ্ধ সাহিত্যের সাম্প্রদায়িক (Sectarian) মনোভাব প্রকাশের নিদর্শন। তারপর রাজকন্যার শিক্ষার ফলে রাজপরিবারের সকলেরই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ, কাশ্যপকে বধ করিবার নিমিত্ত যে সকল ব্রাহ্মণ প্রেরিত হইত, তাহাদের সকলেরই ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ এবং শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধদিগের দ্বারা ব্রাহ্মণ-দিগের বিনাশ ইত্যাদি পরিকল্পনার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রচারমূলক মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মালিনী' নাটকে বৌদ্ধ কাহিনীটিকে প্রথমেই এই সাম্প্রদায়িক এবং প্রচারমূলক মনোভাব হইতে মুক্ত করিয়াছেন। 'মালিনী' নাটকের ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারা সংস্কারধর্ম রক্ষায় বদ্ধপরিকর মাত্র। ইহার জন্য তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, রাজকন্যার নির্বাসন প্রার্থনা করিয়াছেন ; কিন্তু মালিনী আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার দেহে পুণ্যের জ্যোতি দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে দেবী ও জননী বলিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রচারধর্মী কাহিনীকে এখানে সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংঘাতের কথা উভয় কাহিনীতে আছে, এই কথা সত্য ; তথাপি বৌদ্ধধর্মের করুণা এবং মৈত্রীর আদর্শের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ মানবিকতাবাদের সন্ধান করিয়া কাহিনীটিকে যুগোপযোগিতা দান করিয়াছেন। বৌদ্ধ কাহিনীর মধ্যে যে সকল অলৌকিকতার কথা ছিল, তাহাও রবীন্দ্রনাথ সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করিয়া 'মালিনী'র কাহিনীকে একটি শাশ্বত সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়াছেন।

মালিনী এবং কাশ্যপ এই দুইটি নামই রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ কাহিনী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু ক্ষেমঙ্কর এবং সুপ্রিয় চরিত্র এবং ইহাদের নাম দুইটি

রবীন্দ্রনাথ নিজেই উদ্ভাবন করিয়া তাঁহার কাহিনীর মধ্যে আনিয়া সংযুক্ত করিয়াছেন। তাহার ফলে বৌদ্ধ কাহিনীর মধ্যে যাহা নির্বিশেষরূপে অবস্থান করিয়াছিল, তাহাই 'মালিনী'তে বিশেষ এক একটির চরিত্রের রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বৌদ্ধ কাহিনীর মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের বিনাশের কথা আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী'র কাহিনী সেই পথে অগ্রসর হইয়া যায় নাই ; কোনও ধর্ম-সম্প্রদায়ের পরাজয়-বিজয়ের কথার পরিবর্তে ইহাতে ব্যক্তিচরিত্রের শাশ্বত গুণের বিকাশ দেখা যায়। 'মালিনী' নাটকে প্রেমের যে একটি সংযত সুন্দর রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, কিংবা প্রেমের আকর্ষণ বশত বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে বিশ্বাসঘাতকার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, বৌদ্ধ কাহিনীতে তাহার ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কাহিনীটির মধ্যে একদিক দিয়া যেমন বহিরঙ্গগত রূপকর্ম সার্থক করিয়াছেন, আর এক দিক দিয়া তেমনই ইহাতে অন্তর্মুখী প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন ; একটি পুরাণ-কাহিনীকে কাব্যের কাহিনীতে পুনর্গঠন করিয়াছেন।

বৌদ্ধ কাহিনীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কথা আছে, 'মালিনী' নাটকেও ধর্মের কথা আছে সত্য, তবে রবীন্দ্রনাথ এই ধর্মকে বলিয়াছেন নবধর্ম। নবধর্ম বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি মনে করিয়াছেন, বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ইহার পার্থক্যই বা কোথায়, তাহাও এখানে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য মাত্রেরই বিষয় হৃদয়-ধর্মের সঙ্গে আচার-ধর্মের সংঘাত এবং পরিণামে হৃদয়-ধর্মেরই প্রতিষ্ঠা। এই হৃদয়-ধর্মই মালিনীর নবধর্ম। এই ধর্ম শাস্ত্রের শাসন মানে না, কেবলমাত্র হৃদয়ের শাসন মানে। সুপ্রিয়র মধ্যেও এই নবধর্মের চেতনা দেখা দিয়াছিল। সে ব্রাহ্মণ-দিগকে বলিতেছে,

আমি নহি একজন
তোমাদের ছায়া। প্রতিধ্বনি নহি আমি
শাস্ত্র বচনের। —২য় দৃশ্য

তারপর ক্ষেমঙ্করকে বলিতেছে,

যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ব্রত উপবাস
এই শুধু ধর্ম বলে করিবে বিশ্বাস
নিঃসংশয়ে ? বালিকারে দিয়া নির্বাসনে

সেই ধর্ম রক্ষা হবে? ভেবে দেখো মনে
মিথ্যারে সে সত্য বলি' করেনি' প্রচার;
সেও বলে সত্য ধর্ম দয়া ধর্ম তার—
সর্বজীবে প্রেম—সর্বধর্মে সেই সার,
তার বেশি যাহা আছে প্রমাণ কি তার?—২য় দৃশ্য

এই নবধর্মের কথা স্বপ্রিয় আরও সুস্পষ্ট ভাষায় এখানে প্রকাশ করিয়াছে,

স্বর্গ আছে কোন দূরে,
কোথায় দেবতা—কেবা সে সংবাদ জানে।
শুধু জানি, বলি দিয়া আত্ম অভিমানে
বাসিতে হইবে ভালো, বিশ্বের বেদনা
আপন করিতে হ'বে—যে কিছু বাসনা
শুধু আপনার তরে তাই দুঃখময়।
যজ্ঞ যাগে তপস্যায় কভু মুক্তি নয়,
মুক্তি শুধু বিশ্বকাজে। —চতুর্থ দৃশ্য

ইহার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম নহে, শাশ্বত মানব-ধর্মের কথা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর ধর্মচেতনায় যে যুক্তিবাদী মনোভাবের প্রথম বিকাশ দেখা গিয়াছিল, ইহার মধ্যে তাহারই প্রেরণা দেখা যায়। ইহাই মালিনীর নবধর্ম। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এই ভাবের প্রেরণা থাকিলেও ইহাই বৌদ্ধধর্মের সর্বস্ব নহে, ইহার অতিরিক্ত আরও অনেক কিছু লইয়া বৌদ্ধধর্ম। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্ম হইতে কেবলমাত্র ইহার করুণা ও মৈত্রীর আদর্শটুকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন, যুক্তি-বহির্ভূত আচার কিংবা ইহার নির্বাণ এবং বৈরাগ্যের ভাবকে তিনি গ্রহণ করেন নাই। এখানেও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধ কাহিনীতে যেমন মালিনী বৌদ্ধধর্মাচারের মধ্যে নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার সিদ্ধি সন্ধান করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের মালিনী তাহা করে নাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ মানবিকতার চেতনায় তাঁহার নবধর্ম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মানবিকতাবাদের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আছে।

মালিনীর নবধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মেরও অনেকখানি যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' নাটকের সূচনায় সে কথা উল্লেখও করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

'আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষার পুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসেনি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি। সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্ম জটিলতা ভেদ ক'রে তবেই এ'র যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে। আমার ঐ মতের সত্যাসত্য আলোচ্য নয়। বক্তব্য এই যে, এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে, এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা, সেইটেই এ'র কাব্যরস। এইভাবের অঙ্কুর আপনা আপনি দেখা দিয়েছিল "প্রকৃতির প্রতিশোধ"-এ, সে-কথা ভেবে দেখবার যোগ্য। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে" হয়তো তারও আগে এ'র আভাস পাওয়া যায়।'

'প্রভাত-উৎসব' কাব্যগ্রন্থ রচনার সময় হইতে রবীন্দ্র কবি-মানসে বিশ্বের সঙ্গে যোগ অনুভব করিবার যে প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, মালিনীর নবধর্মবোধের মধ্যেও সেই ভাবের বিকাশ দেখা যায়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' যেমন নির্ঝর পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া উদ্দাম আবেগে বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া বিশ্বের সঙ্গে যোগ স্থাপনের উল্লাস অনুভব করিয়াছিল, মালিনীও অন্তঃপুরের শাসন ও বন্ধন অস্বীকার করিয়া বহির্বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছুটিয়া আসিয়াছে। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার ভিতর দিয়াও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সঙ্গে যে যোগ অনুভব করিতে চাহিয়াছেন, মালিনীর নবধর্ম-চেতনার মধ্য দিয়াও তাহারই বিকাশ দেখা যায়—

মালিনী। জন্ম লভিয়াছি রাজকুলে,
রাজকন্যা আমি—কখনো গবাক্ষ খুলে
চাহিনি বাহিরে, দেখি নাই এ' সংসার
বৃহৎ বিপুল—কোথায় কি ব্যথা তার
জানি না তো কিছু। শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের নব পরিচয়
তোমাদের সাথে। —২য় দৃশ্য

সমসাময়িক 'চিত্রা' কাব্য রচনার যুগ পর্যন্ত রবীন্দ্র কবিমানসে নানাভাবে এই ভাবেরই বিকাশ দেখা গিয়াছে। রবীন্দ্র কবিমানসের বিশ্বানুভূতির মত মালিনীও অনুভব করিয়াছে, 'আজ আমি হয়েছি সবা'র '(তৃতীয় দৃশ্য) ।' 'আমি যেন এ' বিশ্বের প্রাণ' (ঐ)। এইখানে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের সঙ্গে মালিনীর নবধর্ম একাকার হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ কাহিনীতে যেমন বৌদ্ধ ধর্মের মহিমা প্রচার করিয়া পরিণামে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মকে প্রতিষ্ঠা করিবার কথা বলা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী'তে পরিণামে নবধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার কোন কথা নাই। নবধর্মের প্রচারক সুপ্রিয় এবং আচার-ধর্মের প্রতিনিধি ক্ষেমঙ্কর উভয়ের মৃত্যুর ভিতর দিয়াই কাহিনী সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধ কাহিনীর মত 'মালিনী' নাটকের কাহিনীর বিশেষ কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ্য ছিল না। ধর্ম উপলক্ষ মাত্র হইয়া ইহার মধ্যে মানব-চরিত্রের কয়েকটি শাশ্বত গুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিহিংসা, বাৎসল্য, ভক্তি ইত্যাদি মানবিক গুণই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া 'মালিনী'র কাহিনীকে উচ্চ কাব্যমূল্য দিয়াছে। সুপ্রিয়র দিক দিয়াই হোক কিংবা মালিনীর দিক দিয়াই হোক, নবধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কাহারও দ্বারা কাহিনীর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই।

সুপ্রিয়র মনের মধ্যে নবধর্মের চেতনা তাহার মালিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্বেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল; সুতরাং ইহা মালিনীর প্রতি সুপ্রিয়র প্রেমের পথ ধরিয়া বিকাশ লাভ করে নাই। মালিনী এবং সুপ্রিয় উভয়েই পরস্পর স্বাধীন ভাবেই আজন্ম নবধর্মের প্রেরণা অনুভব করিয়া আসিয়াছে। ইহার সঙ্গে সুপ্রিয়র কোন স্বার্থের সম্পর্ক জড়িত হইয়া ছিল না। ইহা তাহার আন্তরিক প্রেরণার ফল; তারপর সে যখন মালিনীর মধ্যে ইহার সমর্থন লাভ করিয়াছে, তখন তাহার মনে ইহার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র, ইহার ভিতর দিয়া মালিনীর প্রতি তাহার আকর্ষণ প্রবলতর হইয়াছে। মালিনীর রূপ-যৌবনের আকর্ষণই সুপ্রিয়র একমাত্র অবলম্বন ছিল না; এমন কি, তাহা হয়তো কিছুই ছিল না। কেবল মাত্র সুপ্রিয় আজীবন যে মন্ত্রে দীক্ষিত, মালিনীর মধ্যে তাহারই সমর্থন লাভ করিয়া তাহার প্রতি তাহার প্রথম আকর্ষণ সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তারপর তাহা প্রেমে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। নবধর্ম শেষ পর্যন্ত কাহারও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হইলেও সুপ্রিয়র দ্বারাই ইহার অধিক প্রচার হইয়াছে, কাহিনীর শেষ ভাগে মালিনী সুপ্রিয়র কর্মের মধ্যে প্রেরণা

সঞ্চার করিয়াছে মাত্র। বৌদ্ধ কাহিনীতে মালিনী বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, 'মালিনী' নাটকে মালিনী দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহার তাহা লক্ষ্যও ছিল না।

মালিনীর আচরণ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন এখানে মনে হইতে পারে। মালিনীর চরিত্রের মধ্যে যে ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার বিশ্বাসঘাতক সুপ্রিয়কে বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাহার সঙ্গে কতদূর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার একটি উত্তর হইতে পারে যে, ক্ষেমঙ্করেব প্রতি সুপ্রিয় যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহা জানিবার পূর্বেই মালিনী সুপ্রিয়র প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তথাপি দেখা যায়, যে-মুহূর্তে সে সুপ্রিয়র ক্ষেমঙ্করের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবার কথা সুপ্রিয়র নিজের মুখ হইতেই শুনিতে পাইল, সেই মুহূর্তেও সুপ্রিয়র প্রতি তাহার কোন বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইল না। সুপ্রিয়র প্রতি প্রেম কি তাহাকে সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিল? কিন্তু কদাচ তাহা নহে, কারণ, শেষ মুহূর্তেও সে যে সুপ্রিয়কে হত্যা করিবার পরও ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করিবার জন্য পিতার নিকট অনুরোধ জানাইয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মালিনী সুপ্রিয়র প্রেমে অন্ধ হইয়া গিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যায় নাই। যদি তাহাই হয়, তবে সুপ্রিয়কে বন্ধুর প্রতি নির্মম বিশ্বাসঘাতক জানিয়াও সে তাহাকে ভালবাসিল কি করিয়া?

মালিনী সুপ্রিয়কে যে প্রকৃতই ভালবাসিয়াছিল, তাহার খুব সুনির্দিষ্ট প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। সুপ্রিয় ভক্তের মত মালিনীর নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছে, মালিনীর স্বার্থ রক্ষার জন্য বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে; কিন্তু মালিনীর নিকট হইতে তাহার কি কোনও প্রত্যক্ষ প্রতিদান পাইয়াছে? একদিন মাত্র রাজার মুখে যখন সুপ্রিয়র বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার হাতে রাজকন্যাকে সমর্পণ করিবার কথা শুনিতে পাইল, তখন মুহূর্তের জন্য মালিনীর কুমারী-হৃদয়ে লজ্জার স্পর্শ দেখা দিল,

কোথা হতে আজ
অশ্রু বাষ্পে ছল ছল কম্পমান লাজ—
যেন দীপ্ত হোমহুতাশনশিখা ছাড়ি
সদ্য বাহিরিয়া এল স্নিগ্ধ সুকুমারী
দ্রুপদদুহিতা। —৪র্থ দৃশ্য

রাজা অনুভব করিলেন,

বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে
বিকশি উঠিল—দেবী না রে, দয়া না রে,
ঘরের সে মেয়ে। —ঐ

এতদ্ব্যতীত সুপ্রিয়র প্রতি মালিনীর প্রেমানুভূতি অভিব্যক্তির আর কোন নিদর্শন দেখা যায় না। বরং সুপ্রিয়র নিকট হইতে ক্ষেমঙ্করের কথা সে যত খুঁটিনাটি করিয়া জানিতে চাহিয়াছে, সুপ্রিয়র নিজের কথা তত জানিতে চাহে নাই। সুপ্রিয়র সঙ্গে মালিনীর নিভৃত আলাপনের যে একটি মাত্র দৃশ্য আছে (চতুর্থ দৃশ্য), তাহাতে ক্ষেমঙ্করের প্রসঙ্গই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নিজে হইতেই সুপ্রিয়র প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষেমঙ্করের কথা মালিনী জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—'ক্ষেমঙ্কর বান্ধব তোমার?' ক্ষেমঙ্করের সঙ্গে তাহার আবাল্য বন্ধুত্বের কথা যতই আবেগপূর্ণ ভাষায় সুপ্রিয় মালিনীকে বলিয়াছে, মালিনী তাহা ততই তদ্‌গত চিত্ত হইয়া শুনিয়াছে এবং যেন আরও শুনিতে চাহিয়াছে। তাহার কুমারী-হৃদয়ে সুপ্রিয় অপেক্ষা ক্ষেমঙ্করের প্রতি যে অধিকতর কৌতূহল প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং পিতার মুখে সুপ্রিয়র সঙ্গে তাঁহার বিবাহের সম্ভাবনার কথা শুনিতে পাইয়া তাহার কুমারী-হৃদয়ে সর্বপ্রথম যে লজ্জার স্পর্শ দেখা দিল, তাহার যে একান্তভাবে সুপ্রিয়ই লক্ষ্য ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। ক্ষেমঙ্করকে প্রথম দর্শনের দিন হইতেই মালিনীর মনে তাহার প্রতি এক সুগভীর আকর্ষণ সৃষ্টি হইয়াছিল, সুপ্রিয়র সান্নিধ্যে ক্ষেমঙ্করের কথাই সেইজন্য সে বারবার শুনিতে চাহিয়াছে। সুতরাং সুপ্রিয়র প্রতি তাহার কুমারী-হৃদয়ের আন্তরিক ভালবাসার কোনদিন সৃষ্টিই হইতে পারে নাই। এই মর্মেই নাটকের শেষ দৃশ্যে ক্ষেমঙ্করকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার প্রার্থনার ব্যাখ্যা করা যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি, 'মালিনী' মুখ্যত প্রেম-বিষয়ক নাটক নহে; কিন্তু তথাপি প্রেম ইহার মধ্যে নিজের অধিকার স্থাপন করিতেও ব্যর্থকাম হয় নাই। মালিনীর চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ ইহার মধ্যে কেবলমাত্র একটি করুণা-পুত্তলি রূপে পরিকল্পনা করিয়া তাহাকে সকল দিক হইতে আদর্শায়িত করিয়া তুলেন নাই, তাহার মধ্যে স্বাভাবিক রক্ত-মাংসের অনুভূতিরও সন্ধান করিয়াছেন। নাট্যিক চরিত্ররূপে এখানেই মালিনী চরিত্রের সার্থকতা। সুপ্রিয়কেও এখানে

নবধর্ম প্রচারের যান্ত্রিক বাহনরূপে নাট্যকার উপস্থিত করেন নাই, তাহারও মানবিক অনুভূতির ক্ষেত্রটিকে সন্ধান করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এ' কথা সত্য, এই কথাই ইহার মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিতে পারে নাই। নাট্যকাব্য রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথের কোন রচনাতেই এই কথা প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।

সুপ্রিয় মালিনীকে ভালবাসিয়াছিল এ'কথা সত্য, এই ভালবাসার জন্যই সে আজীবন বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহার দণ্ডও শেষ পর্যন্ত মাথা পাতিয়া লইয়াছিল; কিন্তু তথাপি এমন সন্দেহ করিবার কারণ আছে যে, মালিনীও কি সুপ্রিয়কে সত্যই ভালবাসিয়াছিল? একমাত্র আদর্শগত ঐক্য ব্যতীত পুরুষের যে গুণ নারীকে তাহার দিকে আকৃষ্ট করে, সুপ্রিয়র মধ্যে তাহার কি কিছু পরিচয় পাওয়া যায়? সুপ্রিয়র সঙ্গে নিভৃত আলাপনের সুযোগ লাভ করিয়াও মালিনী যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—'ক্ষেমঙ্কর বান্ধব তোমার?' তারপর পরম ধৈর্যভরে সুপ্রিয়র মুখ হইতে ক্ষেমঙ্করের যে প্রশস্তিবাচন মুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছে, তাহার মধ্যে কি তাহার কুমারী-হৃদয়ের গোপন অভিলাষ তাহার দিকেই ধাবিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতে পারে না? তাহার প্রতি সুপ্রিয় চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ঐ কথা শুনিয়া মালিনী যে পরম সংযত ভাষায়ও বলিয়াছে,

হায়, কেন তুমি তারে
আসিতে দিলে না হেথা মোর গৃহদ্বারে
সৈন্যসাথে? এ'ঘরে সে প্রবেশিত আসি
পুজ্য অতিথির মতো, সুচির প্রবাসী
ফিরিত স্বদেশ তার। —৪র্থ দৃশ্য

ইহার কি কোন নিগূঢ় অর্থ নাই?

তারপর উৎকণ্ঠিত হইয়া ক্ষেমঙ্করের কি দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তাহা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিবার কালে সে বলিয়াছে—

ওরে রমণীর মন,
কোথা বক্ষোমাঝে ব'সে করিস ক্রন্দন
মধ্যাহ্নে নির্জন নীড়ে প্রিয়-বিরহিতা
কপোতীর প্রায়?—কী করেছো বলো, পিতা,
বন্দীর বিচার?

তারপর পিতা যখন বলিলেন,—'প্রাণ দণ্ড হবে তার,' তখন সে যে পিতার নিকট তাহার হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল,

ক্ষমা করো একান্ত এ প্রার্থনা আমার
তব পদে।

তাহা কি কেবলমাত্র সুপ্রিয়র বন্ধু বলিয়া? এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। ক্ষেমঙ্করকে প্রথম দর্শনের মুহূর্ত হইতেই মালিনীর কুমারী-হৃদয় তাহার দিকে আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল, সুপ্রিয় তাহারই বন্ধু বলিয়া তাহার সান্নিধ্যের মধ্য দিয়া তাহার স্মৃতিকে জাগ্রত রাখিবার সে প্রয়াস পাইয়াছে; সেইজন্য সুপ্রিয়কে চোখের সম্মুখে হত্যা করিতে দেখিয়াও মালিনী ক্ষেমঙ্করকে ক্ষমা করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইল। মালিনীর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য, তাহা হইতে সে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতক সুপ্রিয়কে যে জীবনে গ্রহণ করিতে পারে, তাহা কল্পনাও করা যায় না। ক্ষেমঙ্করের প্রতিই তাহার প্রেম সজাগ হইয়াছিল, তবে অটুট সংযমের মধ্য দিয়া তাহার প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া বাহিরের দিক হইতে তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না।

তবে এখানে বলা যাইতে পারে, রাজার নিকট হইতে মালিনীর সঙ্গে সুপ্রিয়র বিবাহের সম্ভাবনার কথা শুনিতে পাইয়া মালিনীর মধ্যে যে কুমারী-জনোচিত লজ্জার বিকাশ হইয়াছিল, তাহা বিবাহের কথা বলিয়াই, বিশেষ করিয়া সুপ্রিয়র সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

নাট্যকবিতা

'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যের বন্দনা গান গাহিয়া তাহার অব্যবহিত কাল পরেই ভারতের অতীত সৌন্দর্য-লোকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তাহারই ফলে অনতিকাল ব্যবধানেই তাঁহার 'কথা', 'কাহিনী' ও 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থ রচিত হইল। 'কথা' এবং 'কল্পনার' ভিতর দিয়া কাব্যাকারে তিনি যে ভারতের ঐশ্বর্যলোকের সন্ধান করিয়াছেন, সমসাময়িক কালে রচিত 'কাহিনী'র মধ্য দিয়া তিনি তাহারই কয়েকটি বিষয় বাহ্যত নাট্যাকারে পরিবেশন করিয়াছেন। 'কথা', 'কাহিনী' ও 'কল্পনা' একই বৎসরে (১৯০০খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। কাহিনী এবং বচনার বাহ্যত একটু রূপবৈচিত্র্য ছাড়া এই তিনটি গ্রন্থের সমগ্র রচনার মধ্যেই ভাবগত এক অখণ্ড ঐক্য সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। 'কাহিনী' গ্রন্থখানি রবীন্দ্র কাব্য-সাধনার সমৃদ্ধতম যুগে রচিত বলিয়া ইহার কয়েকটি কবিতায় বাহ্যত নাট্যের লক্ষণ অনুভূত হইলেও অন্তঃপ্রকৃতির দিক দিয়া ইহারা প্রধানতঃ কবিতাই, নাটক নহে। সেইজন্য ইহাদিগকে নাট্য-কবিতা সংজ্ঞা দেওয়া যায়, ইহাদের নাম 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরক-বাস', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' এবং 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'।

নাটকের ধর্ম গতি,—বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকীয় বিষয় ক্রমাগত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে, কেবল মাত্র একটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া ভাবের আবর্ত রচনা করিবে না। কবিতার ধর্ম স্থিতি, ইহাতে একটি মাত্র ভাবকে কেন্দ্র করিয়া একটি স্বপ্নের যাদু-পুরী রচিত হইবে, বাহিরের কোন আঘাতেই ধ্যানাসীন এই ভাববিগ্রহটি বিচলিত হইবে না,—নাটক গতিপ্রবাহে ভাসমান, কবিতা এক অভিন্ন ভাবাশ্রিতা, স্থিতিশীল,—উভয়ের প্রকৃতিগত এই পার্থক্য সহজেই অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে পরস্পরবিরোধী এই দুইটি ধর্ম কি কৌশলে আসিয়া যে একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহারা কবিতা হইয়াও যে নাটকের ধর্ম রক্ষা করিয়াছে এবং নাটক হইয়াও যে কবিতার ধর্ম বিসর্জন দেয় নাই, ইহাই এই

রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য। এই দিক দিয়া ইহারা কতখানি সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

কতকগুলি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই নাট্যকবিতাগুলি রচিত হইয়াছে; ঘটনার একটি পটভূমিকাকে যখন এখানে স্বীকার করা হইয়াছে, তখন ঘটনামাত্রেরই যে বৈশিষ্ট্য তাহাই কতক পরিমাণে ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া এই রচনাগুলিকে যে কতকটা নাট্যিক গৌরবদান করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। বাহিরের বিক্ষোভ সৃষ্টি করাই যে নাটকের একমাত্র লক্ষ্য, তাহা নহে—মানসিক দ্বন্দ্ব বা মানসিক ভাবের উত্থান-পতনও উচ্চাঙ্গ নাট্যিক গুণ সৃষ্টি করিবার অধিকারী। এই নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে এই মানসিক দ্বন্দ্ব ও বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন মানব-মানবীর জটিল মনোভাবের উত্থান-পতনের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারাও কবিতাগুলি বহুলাংশে নাট্যিক গুণের অধিকারী হইয়াছে। বাহ্যিক ঘটনা অপেক্ষা এই গুণেই ইহারা অধিকতর নাট্যলক্ষণাক্রান্ত, কবিতাগুলির আলোচনা সম্পর্কেই ইহা প্রমাণিত হইবে। এই কবিতাগুলির আর একটি প্রধান নাট্যিক গুণ এই যে, ইহাদের মধ্যে আদর্শের যে বিরোধ সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর শক্তির সমতা রক্ষা করা হইয়াছে। চরিত্রগুলি নিজেদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তাহার ফলেই ইহাদের ভিতর দিয়া যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার শক্তিও খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

এই নাট্যকবিতাগুলির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণই ইহাদের রচনাগুণ। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার সমৃদ্ধতম যুগের রচনা এই নাট্য-কবিতাগুলি। সেইজন্য ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার সমৃদ্ধতম কাব্যরচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। নাট্যকাব্য যুগের রচনাগুলির মধ্যে রসের উচ্ছলতা একটু বেশী, কিন্তু নাট্য-কবিতাগুলির মধ্যে ভাবোচ্ছলতার দিক দিয়া রবীন্দ্রকাব্য যে অপূর্ব সংযমগুণ লাভ করিয়াছে, তাহা রবীন্দ্ররচনার এক দুর্লভ সম্পদ। রচনার পরিমিতি ও সংযমের ভিতর দিয়া দীপ্ত লাবণ্যের বিকাশ ইহাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়—ইহা তাঁহার পরবর্তী যুগের রসোজ্জ্বল রচনার কমনীয়তার তুলনায় অনেক হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু রচনার দিক দিয়াই এই সংযম-গুণের কথা বলিতেছি, ভাবের দিক দিয়া নহে। এই নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে পাত্রপাত্রীর দীর্ঘ সংলাপে যে ভাব-প্রকাশের অসংযম কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে তাহাও

তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যরচনাগুলির তুলনায় যে অনেকটা সংযত, তাহাও অনুভূত হইবে। আদ্যোপান্ত মিত্রাক্ষরে রচিত হইলেও একঘেয়ে গীতিসুরের পরিবর্তে ইহাদের মধ্যে ছন্দোগত যে দৃঢ়বদ্ধতার সৃষ্টি হইয়াছে,তাহা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার মত, নাট্যকাব্যগুলির রচনা ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর গীতিসুর-প্রবণ, অথচ নাট্যকাব্যগুলি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ; কিন্তু মিত্রাক্ষরে রচিত হইয়াও কেবলমাত্র রচনার গুণে এই নাট্যকবিতাগুলি যে বহুলাংশে গীতিসুরবর্জিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। কেবলমাত্র মিত্রাক্ষর যোজনার দ্বারাই যে কবিতার গীতিসুর বর্ধন করা যায় না এবং অমিত্রাক্ষরের মূল তত্ত্ব যে অন্যত্র নিহিত আছে, রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য এবং নাট্যকবিতাগুলি পরস্পর তুলনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

উল্লিখিত নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে একমাত্র 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ব্যতীত আর বাকি চারখানি রচনাই অভিন্ন প্রকৃতির। সেইজন্য রচনার কালানুসারে ইহার স্থান চতুর্থ হইলেও ইহার বিষয় সর্বশেষে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যাইবে।

'গান্ধারীর আবেদন'

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে 'গান্ধারীর আবেদন'ই সর্বপ্রথম রচনা, ইহা ১৩০৪ সালে রচিত হয় এবং একমাত্র 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' ব্যতীত অন্য সকল নাট্যকবিতা এই বৎসরে নিতান্ত অল্পদিনের ব্যবধানেই রচিত হয়; সেইজন্য ইহাদের অধিকাংশের মধ্যেই রচনাগত সুনিবিড় ঐক্য অনুভূত হয়। নাট্যকবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পদ্যনাট্য রচনার যুগের অবসান হয়। ইহার পর তিনি নাট্যরচনায় এক সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গীর প্রবর্তন করিলেন, তাহার মধ্যে সঙ্গীতের অবকাশ থাকিলেও তাহা আদ্যোপান্ত গদ্যেই রচিত হইয়াছে। এই হিসাবে এই নাট্যকবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার একটি বিশেষ প্রান্ত সীমায় অবস্থান করিতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে 'গান্ধারীর আবেদন' সর্বপ্রথম রচনা। ইহার আখ্যানভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও ইহার খুঁটিনাটি পরিকল্পনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াছেন—কিন্তু ইহাতে কাহিনীর পৌরাণিক মর্যাদা বিন্দুমাত্র বিনষ্ট হয় নাই, ইহাতে প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নাট্যকার নিজস্ব বুদ্ধির আলোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অথচ ইহাদের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া নৈর্ব্যক্তিকতার দাবীও যথার্থই পূর্ণ করিয়াছে।

সংস্কৃত মহাভারতের সভাপর্ব এবং উদ্যোগপর্ব হইতে ইহার কাহিনী গ্রহণ করা হইয়াছে। সভাপর্বে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা যখন চরমে পৌঁছিয়াছিল, তখনই গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে গিয়া বলিয়াছিলেন, 'তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ।' অর্থাৎ আমার বাক্যে এই কুলাঙ্গারকে এখনই পরিত্যাগ কর।' রবীন্দ্রনাথ 'গান্ধারীর আবেদনে' গান্ধারীর এই উক্তির প্রত্যক্ষতাটুকু রক্ষা করিয়াছেন। মহাভারতের গান্ধারী চরিত্র ধর্মভীরু এবং ন্যায়ের প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথেও তাহার কোন ব্যতিক্রম নাই। তবে মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্র স্নেহশীল পিতা মাত্র নহে, ধূর্ততা এবং কৌটিল্যের প্রতীক্। 'গান্ধারীর আবেদনে'র দুর্যোধনের চরিত্রও মূল মহাভারতের কোন ব্যতিক্রম নহে। ইহাতে দুর্যোধন নিজের কার্যের সমর্থনে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা মহাভারতে যে রাজনীতির কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই অনুকূল। ইহাদিগকে

মহাভারতে কুণিক-নীতি, শুক্রনীতি বা বার্হস্পত্য নীতি ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পূর্ববর্তী নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে কোন কোন চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া যেমন নাট্যকারের নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে তেমন হয় নাই ; অবশ্য ইহাদের অপরিসর ক্ষেত্রে তাহার যে খুব বেশী অবকাশও ছিল, তাহাও নহে, তথাপি অন্তত রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার পূর্ববর্তী ধারা অনুসরণ করিয়া ইহাতেও এই ত্রুটি কতকটা বর্তমান থাকিতে পারিত ; নাট্যকবিতা রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাট্যরচনার কতকগুলি দোষত্রুটি হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই যুগে তিনি কোন বৃহত্তর পরিকল্পনার উপর কোন পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই বলিয়া এই বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

'গান্ধারীর আবেদন'-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ : কপট দ্যূত ক্রীড়ায় পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিয়া বিজয়োল্লসিত দুর্যোধন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে আসিল। ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, 'অখণ্ড রাজত্ব জয় করিয়াও তোর সুখ কোথায় ?' দুর্যোধন বলিল, সে সুখ চাহে নাই, জয় চাহিয়াছে, সে আজ জয়ী—এই তাহার আনন্দ। ধৃতরাষ্ট্র তাহার ভ্রাতৃদ্রোহকে ধিক্কার দিলেন ; দুর্যোধন বলিল, এত নিকট আত্মীয় বলিয়াই পাণ্ডবেরা তাহার শত্রু, দূরবর্তী আত্মীয় হইলে তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক এত তিক্ত হইত না। ধৃতরাষ্ট্র তাহার ঈর্ষ্যাবুদ্ধিকে নিন্দা করিলেন। দুর্যোধন বলিল, 'ঈর্ষ্যা বৃহতের ধর্ম।' অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, দুর্যোধনের আচরণে ধর্ম পরাজিত হইয়াছে। দুর্যোধন তাহারও উত্তরে বলিল যে, লোকধর্ম ও রাজধর্ম এক নহে ; রাজধর্মের দিক দিয়া দুর্যোধন কোন অন্যায় করিয়াছে বলিয়া সে মনে করে না। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, কপট দ্যূতে জয়লাভ করিয়া তাহার আনন্দ প্রকাশ করা লজ্জাহীনতার পরিচায়ক। দুর্যোধন তাহারও উত্তরে বলিল, যার যাহা বল, তাহাই তাহার অস্ত্র, ইহাতে লজ্জার কোন কারণ নাই। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, আজ সর্বত্র দুর্যোধনের নিন্দা প্রচারিত হইতেছে। দুর্যোধন বলিল, সে রাজশক্তির সাহায্যে নিন্দকের কণ্ঠরোধ করিয়া নিন্দার ধ্বংস করিবে, লোকনিন্দাকে সে ভয় করে না। দুর্যোধন অভিমানাহত হইয়া পিতাকে বলিল যে, তাহারা শৈশব হইতে পিতৃস্নেহে বঞ্চিত, তাহাদের পিতার সিংহাসন তাহাদের নিন্দক দলে সর্বদা ঘিরিয়া রাখিয়াছে ; সঞ্জয়, বিদুর, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার সন্তানদের

মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়া রাখিয়াছে ; তাহাদিগকে দূর করিয়া দিতে হইবে। ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, ইহাদের কথা শুনিয়া তাঁহার পুত্রস্নেহ বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নাই। এমন সময় একজন চর আসিয়া সংবাদ দিল যে মহিষী গান্ধারী স্বামীর দর্শনপ্রার্থিনী হইয়াছেন ; শুনিয়া দুর্যোধন পলাইয়া গেল, ধৃতরাষ্ট্র মহিষীকে আহ্বান করিলেন ; গান্ধারী আসিয়া স্বামীর নিকট পুত্র দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। গান্ধারী বলিলেন, দুর্যোধন অপরাধী, তাই সে পরিত্যাজ্য ; ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, সে যদি ধর্মের কাছে অপরাধী হইয়া থাকে, তবে ধর্মই তাহাকে শাসন করিবে, পিতা হইয়া তিনি পুত্রকে পরিত্যাগ করিবেন কি করিয়া ? গান্ধারী বলিলেন, তিনি মাতা হইয়াও সমস্ত নারী জাতির নামে পুত্রের বিরুদ্ধে রাজার কাছে বিচার প্রার্থনা করিতেছেন ; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, পাপী পুত্র বিধাতার ত্যাজ্য ; তাই তিনি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তিনি তাহার সঙ্গে একই পাপে ঝাঁপ দিয়া একসঙ্গে তলাইয়া যাইতেই স্থির করিয়াছেন।

গান্ধারীর আবেদন ব্যর্থ হইল। শত্রু-পরাভব-উৎসব-মত্তা দুর্যোধন-মহিষী ভানুমতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গান্ধারী তাহাকে উৎসবের পরিবর্তে পতির উদ্ধারের জন্য দেবতার্চন করিবার উপদেশ দিলেন। ভানুমতী সে কথা তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিলেন। বনযাত্রার আগে গান্ধারীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবার জন্য দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব আসিয়া প্রবেশ করিলেন। গান্ধারী সকলকে আশীর্বাদ করিলেন।

বর্ণিত কাহিনী হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহাতে বাহ্য ঘটনার কোন ঘাত-প্রতিঘাত নাই, ইহার মধ্যে যে সকল পরস্পরবিরোধী আদর্শকে আনিয়া সম্মুখীন করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাই প্রকৃত নাটকীয় বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে। একমাত্র ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্র ব্যতীত অন্য কোন চরিত্রের মধ্যে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্বও নাই। দুর্যোধন যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহা মনে-প্রাণে সরল ভাবেই করে। তাহার বিশ্বাসের মধ্যে কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। গান্ধারীরও তাহাই—স্নেহবোধ এবং ধর্মবোধের মধ্যে তাঁহার নিজের কোন দ্বন্দ্ব নাই। এই বিষয়ে তিনি নিজে একটা সত্যোপলব্ধিতে পৌঁছিয়াছেন এবং সুদৃঢ় ভাবে তাহাই অবলম্বন করিয়া আছেন। হয়ত তীব্র মানসিক সংগ্রামের ভিতর দিয়াই তিনি সত্যোপলব্ধিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ; কিন্তু এই নাট্যকবিতায় গান্ধারীর এই মানসিক সংগ্রামের কোন পরিচয়

নাই। ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে মানসিক সংগ্রামের পরিচয় আছে। সেইজন্য ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রটি এই নাট্যকবিতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নাট্যধর্মী। গান্ধারী আদর্শ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, তাঁহার আচরণের মধ্যে মানবিক কোন গুণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না; পুত্র দুর্যোধনের সঙ্গে তিনি তাঁহার স্নেহ-সম্পর্কের কথা আবেগপূর্ণ ভাষায় স্মরণ করিলেও তাঁহার এই স্নেহস্মৃতির সঙ্গে তাঁহার নাট্যোল্লিখিত আচরণের এত পার্থক্য যে, তাহা হইতেই তাঁহার সেই স্নেহবোধ যে নিতান্তই আন্তরিক ছিল, তাহা কিছুতেই অনুভূত হয় না। অর্থাৎ মাতা গান্ধারী আর এই পুত্রের নামে বিচারপ্রার্থিনী নারী যে একই চরিত্র, তাহা কিছুতেই মনে হয় না।

'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকবিতায় ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রটিই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই বলিয়াছি, ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রের মধ্যে কতকগুলি বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা চরিত্রটিকে অপরূপ নাট্যিক গৌরব দান করিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র রাজা, পিতা ও স্বামী। অদৃষ্টের চক্রান্তে এই তিনটি কর্তব্যবোধ পরস্পরের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, রাজকর্তব্য পুত্রস্নেহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল; পুত্রস্নেহ পত্নীপ্রেমের বিরুদ্ধে গেল। এই বিরুদ্ধ সংগ্রামে কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা ও সুগভীর পত্নীপ্রেম পুত্রস্নেহের কাছে পরাজয় স্বীকার করিল। এই দ্বন্দ্ব নাট্যকার ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে পরম নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। পাপী পুত্রের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ রাজার প্রচ্ছন্ন স্নেহবোধের এই জটিল দ্বন্দ্বই কবিতাটির একটি বিশেষ নাট্যিক গুণ। অন্তরের মধ্যে স্নেহবোধকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বাহিরে তিনি পুত্রকে অধর্মাচরণের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করিতেছেন; অন্তরে কোমল হইলেও বাহিরে তিনি কঠোর। ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্র কোন উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ নহে, তাঁহার সুকঠিন রাজকর্তব্যও স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তিগুলির উৎসমুখ শুষ্ক করিয়া দিতে পারে নাই। তিনি স্নেহপরবশ হইলেও স্নেহে অন্ধ নহেন, দুর্যোধনের পাপাচরণ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তথাপি স্নেহকে তিনি জয় করিতে পারিতেছেন না—সুসঙ্গত স্বাভাবিক মানবিক গুণেই তাঁহার চরিত্রটি উদ্ভাসিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতার পুরুষচরিত্রগুলি কতকটা বাস্তব ও জীবন্ত, কিন্তু স্ত্রীচরিত্রগুলি আদর্শপ্রণোদিত বলিয়া নির্জীব।

ধৃতরাষ্ট্রের পরই দুর্যোধন চরিত্রের উল্লেখ করিতে হয়। এই চরিত্রও তাহার নিজের দিক হইতে সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রথম

দর্শনের সময় তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া যেন বিজয়ের উল্লাস উছলিয়া পড়িতেছে ; তৃপ্তি ও আনন্দ যেন আর ধরে না। কিন্তু পিতার কণ্ঠে ভর্ৎসনা শুনিয়া সহসা তাহার মনে অভিমানের উদয় হইল এবং আশৈশব তাহারা তাহাদের নিন্দক দলের চক্রান্তে পিতৃস্নেহ হইতে যে ভাবে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, তাহার কথা স্মরণ করিয়া কহিল—

অদ্য হতে পিতঃ,
যদি সে নিন্দুক দলে নাহি কর দূর
সিংহাসন পার্শ্ব হতে, সঞ্জয় বিদুর
ভীষ্ম পিতামহ,—যদি তারা বিজ্ঞবেশে
হিতকথা ধর্মকথা সাধু উপদেশে
নিন্দায় ধিক্কারে তর্কে নিমেষে নিমেষে
ছিন্ন ছিন্ন করি দেয় রাজকর্ম ডোর,
ভারাক্রান্ত করি রাখে রাজদণ্ড মোর,
তবে ক্ষমা দাও, পিতৃদেব—নাহি কাজ
সিংহাসন কণ্টক শয়নে—মহারাজ,
বিনিময় করি লই পাণ্ডবের সনে
রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্বাসনে।

উদ্ধত পুত্রের পিতৃস্নেহে অভিযোগের এই চিত্রটি বড়ই মর্মস্পর্শী, ধৃতরাষ্ট্রও ইহাতে বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং পরবর্তী মুহূর্তেই গান্ধারী আসিয়া পুত্রকে পরিত্যাগ করিবার আবেদন জানাইলেন। তখন তাঁহার আবেদন ব্যর্থ হইল, তাহার মূলে পুত্রের এই অভিমান-কম্পিত কণ্ঠস্বরের স্মৃতি যে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি, গান্ধারীর চরিত্র আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহার সঙ্গে রক্তমাংসের কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না ; সেইজন্য গান্ধারীর শত যুক্তির সম্মুখে ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র যুক্তি 'আমি পিতা' যত বেশী সত্য বলিয়া মনে হয়, গান্ধারীর উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহাভিব্যক্তিও তাহার সম্মুখে নিতান্ত প্রাণহীন অভিনয়ের মত বলিয়া বোধ হয়।

'কর্ণকুন্তী-সংবাদ'

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' সর্বশেষ (১৩০৬) রচনা হইলেও বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়া ইহাকে 'গান্ধারীর আবেদনে'র পরই আলোচনা করিতে হয়। 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ'ই নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ; রচনার পরিসর ইহার খুব বিস্তৃত না হইলেও, অল্পপরিসরের মধ্যেও ইহা নিবিড় রসঘন হইয়া উঠিয়াছে। বিষয় নির্বাচনে এবং অনুভূতির সূক্ষ্মতায় ইহা রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রচনা। ইহার কাহিনীভাগ সংক্ষেপে এইরূপ—

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের পূর্ব মুহূর্তে একদিন জাহ্নবী তীরে প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় সূর্যবন্দনারত কর্ণ সম্মুখে অপরিচিতা নারীকে দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। তিনি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে নারী নিজেকে পাণ্ডব-জননী কুন্তী বলিয়া পরিচয় দিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কর্ণ তাঁহার প্রতি এক অপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করিলেন, এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিয়া গেল। কুন্তী বলিলেন, তিনি তাঁহার নিকট এক প্রার্থনা লইয়া আসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে তাঁহার মাতৃক্রোড়ে ফিরাইয়া লইতে চাহেন। শুনিয়া কর্ণের শৈশবের কথা মনে পড়িল ; লোকমুখে শ্রুত জননী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সূত অধিরথের গৃহে আশ্রয়লাভের কাহিনী মনে হইল এবং আজন্ম-বঞ্চিত মাতৃস্নেহ লাভের সম্ভাবনায় মন অধীর হইয়া উঠিল। মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতিতে মাতৃস্নেহের বন্ধনে তিনি ধরা দিলেন। কিন্তু কুন্তী তাঁহাকে কৌরবদিগের বিরুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে সহায়তা করিবার জন্যই প্রার্থনা করিতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি আত্মসংবরণ করিয়া লইলেন। সন্তান পরিত্যাগিনী মাতার প্রতি অভিমানে তাঁহার মন এইবার ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, মাতৃস্নেহের প্রলোভন দেখাইয়া তিনি যে তাঁহাকে তাঁহার নিজের বীরধর্ম বিসর্জন দিতে বলিতেছেন, সেইজন্য তিনি মাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের যে অংশ হইতে 'কর্ণকুন্তী-সংবাদে'র কাহিনী গৃহীত হইয়াছে, তাহার বঙ্গানুবাদ এখানে প্রকাশ করা হইল—

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে একদিন কুন্তী ভাবিলেন, 'আচার্য দ্রোণ স্বেচ্ছাক্রমে

কখনই শিষ্যগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন না, ভীষ্মই বা কি বলিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি সুহৃদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন ? কেবল বৃথাদৃষ্টি মোহানুবর্তী অনর্থ-নিরত বলবান্ দুরাত্মা কর্ণ পাপমতি দুর্যোধনের বশবর্তী হইয়া পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে বলিয়া আমার মন সতত দগ্ধ হইতেছে।

অতএব আজি আমি কর্ণের নিকট তাহার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণণ করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিব। আমি বাল্যকালে বিশ্বস্ত সখীগণে পরিবৃত হইয়া পিতা কুন্তীভোজের অন্তঃপুরে বাস করিতাম। ঐ সময় ভগবান দুর্বাসা আমার ভক্তিভাবে পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে দেবাহ্বান মন্ত্র প্রদান করেন। আমি ব্যাকুলিত চিত্তে স্ত্রীভাব ও বালকস্বভাব প্রযুক্ত বারংবার মন্ত্রের বলাবল ও ব্রাহ্মণের বাক্যবল চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং কিরূপে পিতার চরিত্রে দোষস্পর্শ না হয়, আর কিরূপেই বা আমি আপন সুকৃতিশালিনী ও অনপরাধিনী হইব, এই বিবেচনা করত নিতান্ত কৌতূহল ও ক্ষতোমতাপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া সেই মন্ত্র পাঠ পূর্বক সূর্যদেবকে আহ্বান করিলাম। সূর্যদেব মন্ত্র-প্রভাবে আমার নিকট আগমন করিয়া কন্যাবস্থাতেই আমার গর্ভে কর্ণকে উৎপাদন করিলেন। কর্ণ আমার কানীন পুত্র, কি নিমিত্ত আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ না করিবে ?

মহানুভবা কুন্তী এইরূপে কার্য বিনিশ্চয় করিয়া ভাগীরথী তীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, ক্রমে গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্বীয় আত্মজ সত্যপরায়ণ মহাতেজাঃ কর্ণ পূর্বমুখে ঊর্ধ্ববাহু হইয়া বেদ পাঠ করিতেছেন। পাণ্ডুপত্নী পৃথা আতপতাপে নিতান্ত তাপিত হইয়াছিলেন, কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে উত্তরীয়চ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার জপাবসান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহানুভব কর্ণ অপরাহ্ণ পর্যন্ত পূর্বাভিমুখে জপ করিয়া পরিশেষে পশ্চিমাভিমুখে হইবা মাত্র কুন্তীকে অবলোকন করিলেন। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, "ভদ্রে! রাধাগর্ভসম্ভূত, অধিরথের ঔরসজাত কর্ণ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে, আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন ? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে ?"

কুন্তী কহিলেন, "বৎস! তুমি কুন্তীনন্দন, রাধাগর্ভসম্ভূত নও, অধিরথও তোমার পিতা নহেন, সূতকুলে তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি কানীনপুত্র; আমি কন্যাবস্থায় সর্বাগ্রে কুন্তীরাজভবনে তোমাকে প্রসব করিয়াছি। ভুবন প্রকাশক ভগবান দিনকর আমার গর্ভে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। তুমি

সহজাত কবচকুণ্ডলধারী দেবপুত্রসদৃশ ও দুর্ধর্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে বৎস, তুমি আমার গৃহে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্বক মোহবশত স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সৌহার্দ্র না করিয়া এক্ষণে যে দুর্যোধনের সেবা করিতেছ, ইহা কি তোমার সমুচিত কার্য? মহাত্মগণ ধর্মনিশ্চয় বিষয়ে পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করা পুত্রের প্রধান ধর্ম বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, মহাবীর ধনঞ্জয় পূর্বে যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত যে সম্পত্তি আহরণ করিয়াছিলেন, দুর্যোধন প্রভৃতি দুরাত্মগণ ছলনাপূর্বক তাহা অপহরণ করিয়াছে; এক্ষণে তুমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নিকট হইতে উহা গ্রহণপূর্বক স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। আজি কৌরব-সকল কর্ণার্জুন সমাগম অবলোকন করুন ও দুরাত্মগণ তোমাদের সৌভ্রাত্র সন্দর্শন করিয়া অবনত হউক। অর্জুন ও তুমি তোমরা দুইজন বলদেব ও কৃষ্ণের সদৃশ, তোমরা একত্র হইলে কোন্ কার্য সম্পাদন না করিতে পার? হে কর্ণ! তুমি স্বীয় পঞ্চ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইলে মহাযজ্ঞে বেদীর উপরিস্থ দেবগণ পরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইবে। তুমি সর্ব গুণসম্পন্ন সবশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের অগ্রজ ও পৃথাসুত; অতএব তোমার সূতপুত্রসংজ্ঞা তিরোহিত হওয়াই উচিত।"

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! কুন্তীর বাক্য অবসান হইলে ভগবান ভাস্কর গগন হইতে কর্ণকে কহিলেন, "বৎস কর্ণ! কুন্তী সত্য কহিয়াছেন, তুমি স্বীয় মাতার বচনানুরূপ সমুদয় কার্য কর, তাহা হইলেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।"

সত্যপরায়ণ কর্ণ মাতা কুন্তী ও পিতা দিবাকরের বাক্য শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি তখন কুন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ক্ষত্রিয়ে, আমি আপনার বাক্যে আস্থা করি না, আপনার বাক্যানুরূপ কার্য করিলে আমার ধর্মহানি হইবে। দেখুন, আপনা হইতেই আমার জাতিভ্রংশ হইয়াছে, আপনি তৎকালে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত অযশস্য ও কীর্তিলোপকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার নিমিত্তই ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সংস্কার প্রাপ্ত হই নাই, অতএব আর কোন শত্রু আপনার অপেক্ষা আমার অধিক অপকার করিবে? আপনি ক্ষত্রসংস্কার প্রাপ্তিকালে আমার প্রতি তাদৃশ নির্দয় ব্যবহার করিয়া এক্ষণে আমাকে আপনার কার্যসাধনে অনুরোধ করিতেছেন। আপনি পূর্বে মাতার ন্যায় আমার হিতচেষ্টা না করিয়া এক্ষণে স্বকীয় হিত বাসনায় আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। দেখুন, কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারী অর্জুনকে

অবলোকন করিলে কোন্ ব্যক্তি ভীত ও ব্যথিত না হয়? অতএব আজি যদি আমি পাণ্ডবগণের সমীপে গমন করিয়া তাহাদের পক্ষ হই, তাহা হইলে সকলেই আমাকে ভীত জ্ঞান করিবে। অদ্যাপি কেহই আমাকে পাণ্ডবগণের ভ্রাতা বলিয়া জানেন না; অতএব যদি আমি এই যুদ্ধকালে তাহাদের সমীপে গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন?

হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠে! ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ আমাকে সর্বপ্রকার ভোগ্য প্রদান ও যথোচিত সৎকার করিয়া আসিতেছেন, আজি আমি কিরূপে উহা বিফল করিব? যাহারা শত্রুদিগের সহিত বৈরভাব অবলম্বন করিয়া প্রতিনিয়ত আমার উপাসনা ও আমাকে নমস্কার করে, যাহারা আমার বাহুবলে নির্ভর করিয়া সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজয় করিবার প্রত্যাশা করে, আমি কিরূপে তাহাদিগের আশালতা ছেদন করিব? যাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া অপার সমর-সাগরের পরপার প্রাপ্ত হইতে বাসনা করে, আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব? যাহারা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নিকট জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের এই উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, এই সময় আমিও তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিব। যাহারা স্বামীর নিকট কৃতকার্য হইয়া তাহার কার্যকাল উপস্থিত হইলে উপেক্ষা করে, সেই সকল ভর্তৃপিণ্ডাপহারী পাতকিগণের ইহলোকে বা পরলোকে সম্পত্তি লাভ হয় না।

অতএব হে আর্যে! আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের হিতার্থ স্বীয় সাধ্যানুসারে তোমার পুত্রগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া সৎপুরুষোচিত অনৃশংস কার্যানুষ্ঠান করিব, আপনার বচনানুরূপ কার্য অর্থকর হইলেও তদনুষ্ঠানে কদাপি সম্মত হইব না। পাণ্ডবগণের উপর আমার যে ক্রোধ আছে, তাহা কদাপি বিফল হইবে না। আমি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, ও সহদেব তোমার এই চারি পুত্রকে সংগ্রামে সংহার করিব না! যুধিষ্ঠিরের সেব্য মধ্যে কেবল অর্জুনের সহিত আমার সংগ্রাম হইবে। অতএব হয় অর্জুনকে সংগ্রামে নিহত করিয়া স্বামীর উপকার করিব, না হয় তাহার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক উৎকৃষ্ট যশোভাজন হইব। হে পুত্রবৎসলে! আপনার পঞ্চপুত্র কদাপি বিনষ্ট হইবে না; কারণ, অর্জুন আমার হস্তে নিহত হইলে আমি জীবিত থাকিব, অথবা আমি অর্জুনের হস্তে নিহত হইলে অর্জুন জীবিত থাকিবে, এইরূপে আপনি চিরকাল পঞ্চপুত্রের মাতা হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিবেন।"

যশস্বিনী কুন্তী অতি ধীর মহাবীর কর্ণের বাক্য শ্রবণে দুঃখে কম্পিত হইয়া

তাহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি যেরূপ কহিলে, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কৌরবগণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে, কি করি, দৈবই বলবান্। কিন্তু তুমি যে অর্জুন ভিন্ন যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে অভয়প্রদান করিলে, ইহা যেন তোমার মনে থাকে।" কুন্তী ও কর্ণ এইরূপে কথোপকথন সমাপন করিয়া পরস্পর অনাময় ও স্বস্তি প্রয়োগপূর্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।"

মহাভারতের বর্ণনায় কর্ণের চরিত্র দৃঢ়তর, কুন্তীকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনের মধ্যে কোন দুর্বলতা প্রবেশ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কর্ণকুন্তী-সংবাদে' মহাভারতের কর্ণচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের রচনায় কর্ণ কুন্তীকে নিজ গর্ভধারিণী জননী বলিয়া জানিতে পারিয়া মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়া যে মাতৃস্নেহের অনুভূতিতে বিগলিত হইয়া গিয়াছিলেন, মহাভারতের বর্ণনা কর্ণ চরিত্রকে সেই দুর্বলতা হইতে রক্ষা করিয়াছে। কুন্তী কেবলমাত্র যে পঞ্চপাণ্ডবের স্বার্থ রক্ষার জন্য কর্ণের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া তাহাকে দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, তাঁহার এই আচরণ যে কর্ণের প্রতি তাঁহার প্রচ্ছন্ন স্নেহের কিছুমাত্র পরিচায়ক নহে, তাহা মহাভারতের বর্ণনায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারতে প্রথমেই কর্ণ সম্পর্কে কুন্তী বলিয়াছেন, 'বৃথাদৃষ্টি মোহানুবর্তী অনর্থ-নিরত বলবান্ দুরাত্মা কর্ণ'; সুতরাং ইহার মধ্যে কর্ণের প্রতি কুন্তীর কোন স্নেহ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের রচনায় কুন্তীর মধ্যে যে অনুতাপ এবং কর্ণের মধ্যে যে অভিমান-বোধের স্পর্শ আছে, . .ভারতে তাহা নাই। কারণ, কুন্তী এখানে একমাত্র পঞ্চপাণ্ডবের স্বার্থরক্ষার জন্যই কর্ণের নিকটবর্তিনী হইয়াছিলেন, কর্ণের মধ্যেও কুন্তীকে কেন্দ্র করিয়া মাতৃভক্তির কোন সংস্কারই কোনদিন গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; সেইজন্য কঠিন কর্তব্যের মুখে এক মুহূর্তের দর্শনেই তাঁহার হৃদয় মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী-সংবাদে'র কর্ণ কুন্তীর কথা শুনিয়া তাহাকে মা বলিয়া জানিতে পারিয়া মুহূর্তেই আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়া মাতৃস্নেহের রাজ্যে প্রবেশ করিলেন এবং এই মাতৃস্নেহকে স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র কর্তব্যের অনুরোধেই যেন দুর্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কিন্তু মহাভারতের কর্ণের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও আত্মবিস্মৃতি ঘটে নাই; তাহার সঙ্কল্প সুদৃঢ়, মাতৃস্নেহের কোন সংস্কার কোন দিক

হইতেই সেই কঠিন কর্তব্যকে শিথিল করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ দুর্বলচিত্ত, ধর্মভীরু; কিন্তু মহাভারতের কর্ণ কদাচ তাহা নহে, কর্তব্যের পথে তিনি অবিচল। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ কুন্তীকে নিজের জননী বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে মা মা বলিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, তাঁহার আশৈশব অতৃপ্ত মাতৃস্নেহের ক্ষুধা যেন এক মুহূর্তে বিশ্বগ্রাসী হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু মহাভারতের কর্ণ কুন্তীকে নিজের গর্ভধারিণী বলিয়া জানিতে পারিয়াও কোথাও জননী বলিয়া সম্বোধন পর্যন্ত করেন নাই, বরং তাহার পরিবর্তে ক্ষত্রিয়ে, আর্যে, পুত্রবৎসলে ইত্যাদি বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন। কারণ, কুন্তীকে চিনিবামাত্র মহাভারতের কর্ণ যথার্থই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার জননীরূপে এখানে আবির্ভূত হন নাই, বরং পাণ্ডব জননীরূপে পাণ্ডবের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং পাণ্ডব-স্বার্থান্বেষিণী নারীর প্রতি তাহার কোন হৃদয়-দৌর্বল্যই প্রকাশ পাইতে পারে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কর্ণের এখানে আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে, আশৈশব পালনকারিণী অধিরথ-পত্নী রাধার কথা মুহূর্ত মধ্যে বিস্মৃত হইয়া কুন্তীকে জননী বলিয়া তাঁহার স্নেহবন্ধনে তিনি ধরা দিতে চাহিয়াছেন। এখানে মহাভারতের কর্ণ-চরিত্র হইতে রবীন্দ্রনাথের কর্ণ নিষ্প্রভ হইয়াছে।

আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিস্তৃত পটভূমিকায় এই কাহিনীটিকে পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই বিশাল পরিবেশটি এই নাট্যকবিতার কাহিনীগত মর্যাদা অনেক পরিমাণে যে বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। রামায়ণ কিংবা মহাভারত হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া রচনার একটা খুব বড় সুবিধা এই যে, ইহা দ্বারা ইহাদের পরিচিত পরিবেশটির সদ্ব্যবহার করিবার সুযোগ লাভ করা যায়। শুধু তাহাই নহে, চরিত্রগুলির সঙ্গেও পাঠকের যে মনোভাব প্রায় আজন্ম সংস্কারের মতই গড়িয়া উঠে, তাহারও পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। অবশ্য আর একদিক দিয়া ইহার দায়িত্বও অনেক বেশী—নূতন করিয়া ব্যবহারের ফলে চরিত্রগুলি যদি আমাদের চিরকাল পালিত সংস্কারের তিল-মাত্রও বিরোধী হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই তাহাদের প্রতি আমাদের মন অতি সহজেই বিরূপ হইয়া যায়। অর্থাৎ 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ'-এর কর্ণ এবং কুন্তীর সঙ্গে আমরা কেবলমাত্র এই কবিতার মধ্য দিয়াই পরিচয় স্থাপন করিয়া লই না, তাঁহাদের সম্পর্কে আমাদের আজন্ম যে একটি সংস্কার পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট হইয়া আছে, এই কবিতার রসগ্রহণ করিবার কালে সেই সংস্কারবুদ্ধিও অলক্ষ্যে

সক্রিয় থাকে। রবীন্দ্রনাথ 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ'-এর ভিতর দিয়া মহাভারতের বিস্তৃত পরিবেশটি সদ্ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে অনেক সময় নিজের মনোভাব আরোপ করিয়াছেন, গীতিকবির পক্ষে অনেক সময় তাহা অপরিহার্য।

এই বিস্তৃত পৌরাণিক পটভূমিকার উপরেও যে-অনুভূতিগুলি এই নাট্য কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা নিতান্তই মানবিক,—ইহাই এই নাট্যকবিতাটির একটি দুর্লভ বৈশিষ্ট্য; ইহার কোন চরিত্রই কোন বাস্তব সম্পর্কহীন আদর্শ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ নহে। এই গুণেই ইহা কবিতা হইয়াও নাট্যধর্মী হইতে পারিয়াছে। এখানে কুন্তী বীরজননী হইয়াও সাধারণ দোষত্রুটিপূর্ণ মানবী মাত্র; রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁহার মানবিক দীনতা এখানে এমন ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাঁহার সম্মুখে তাহার মহাভারতের পাণ্ডব জননীর উন্নত চিত্র কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে; কুন্তী এখানে অপরাধিনী; তাঁহার লজ্জা, তাঁহার অপরাধ সন্ধ্যার অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া যেন এক অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মত তিনি আসিয়া নম্রশিরে বীর পুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। জন্মমুহূর্তেই পুত্রকে পরিত্যাগ করিবার মধ্যে তাঁহার যে লজ্জার কাহিনী জড়িত হইয়া আছে, তাহার জন্য তাঁহার সঙ্কোচের অবধি নাই—এই নারী এতদিন তাঁহার এই লজ্জার কথা গোপন করিয়াও আজ এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন, যাহাতে পুত্রের কাছেও সেই লজ্জা আর গোপন রাখিতে পারিতেছেন না। ইহার অপমান যে কত গভীর, মাতা হইয়া পুত্রের নিকট এই দীনতা স্বীকারের মধ্যে যে কতখানি বেদনা, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নয়; কুন্তী এখানে সেই দুঃসহ বেদনা ও অপরিমেয় লজ্জার সবটুকুরই ভার নিজের একার উপরই লইয়া আসিয়াছেন। এই নাট্যকবিতায় কুন্তীর প্রত্যেক কথার ভিতর দিয়া এই চরম অপমান, সুগভীর লজ্জা ও দুঃসহ বেদনার পরিচয় সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কুমারী-জীবনের লজ্জাকে পুত্রের নিকট যে ভাবে প্রকাশ করিতেছেন, তাহা হইতে তাঁহার পাণ্ডবের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্বকে সেদিন যে কি গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

ইহার পরই কর্ণের কথা উল্লেখ করিতে হয়। মহাভারতের অদ্বিতীয় বীর চরিত্রের গৌরব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁহার নিতান্ত মানবিক দিকটিই বিকাশ লাভ করিয়াছে। কুন্তী তাঁহার জননী,

জননীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক জন্মান্তরের স্মৃতির মতই ক্ষীণ, তথাপি তাহার মূলে সত্য আছে। আজন্ম মাতৃস্নেহ বঞ্চিত এই হতভাগ্যের সম্মুখে যখন কুন্তী তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করিলেন, তখন মাতৃসম্পর্কের মাধুর্যের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার মুহূর্তে আত্মবিস্মৃতির চিত্রটি সেই সত্যের উপর ভিত্তি করিয়াই পরিকল্পিত। কিন্তু জননীর সহিত কর্ণের সম্পর্ক নিতান্তই ক্ষীণ বলিয়া সেই মুহূর্তেই তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়া সংস্কারই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিল। জননীর দাবী লইয়া কুন্তী আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু জননীর শক্তি লইয়া আসেন নাই। কর্ণের উপর সেই শক্তি তাঁহার ছিলও না, সেইজন্যই তাঁহাকে রিক্তহস্তে ফিরিতে হইল। মাতার প্রতি বীর সন্তানের অভিমানের চিত্রটিও বড় সুন্দর।

কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে। কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে,—
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে।

বীরধর্ম রক্ষার জন্য কর্ণের মাতৃস্নেহকে প্রত্যাখ্যান করিবার যে কথা ইহাতে বলা হইয়াছে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে আদর্শ প্রেরণার ফল বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃত তাহা নহে। মহাভারতের কাহিনীতে দেখা গিয়াছে, কর্ণের প্রতি স্নেহে কুন্তীর আন্তরিকতা ছিল না, কুন্তী আসিয়াছিলেন পাণ্ডবের স্বার্থরক্ষার জন্য, বিশ্ববিজয়ী কর্ণের হাত হইতে অর্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য। এই নাট্যকবিতায় তাহা উল্লেখ থাকিবার কথা নহে, তবে কুন্তীর আচরণের ভিতর দিয়া তাঁহার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবের নিরাপত্তার ভাবনা এই নাট্য-কবিতার মধ্যে অস্পষ্ট নাই; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে নারীহৃদয়ের চরম লজ্জাকেও জলাঞ্জলি দিয়া কুন্তী যে কর্ণের নিকট গিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কর্ণের প্রতি তাঁহার সন্তান-বাৎসল্য অপেক্ষা পঞ্চপাণ্ডবের মঙ্গল-চিন্তাই অধিকতর কার্যকরী হইয়াছিল। যেখানে আন্তরিকতা নাই, সেখানে প্রকৃত শক্তির অভাব; সেইজন্যই কর্ণের নিকট কুন্তীর মাতৃস্নেহ কার্যকর হইতে পারিল না। কর্ণ বীরধর্মেই প্রতিষ্ঠিত—এই বীরধর্ম হইতে তাঁহাকে চ্যুত করিবার কোন বিরুদ্ধ শক্তিই তাঁহার সম্মুখে

ছিল না। সেইজন্যই কর্ণ শেষ পর্যন্ত স্বধর্মেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়া গেলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার নিতান্ত মানবিক অভিমানের কম্পিত কণ্ঠস্বরটিও রবীন্দ্রনাথ শুনিতে পাইয়াছেন,

> জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
> নামহীন, গৃহহীন—আজিও তেমনি
> আমারে নির্মম চিত্তে তেয়াগো জননী
> দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব-'পরে।

কর্ণের বীরধর্ম পালনের আগ্রহের জন্য জননীর প্রতি তাঁহার এই দুর্জয় অভিমানবোধ যে কতকটা দায়ী, তাহা অনুমান করা কি খুব কঠিন? এই-খানেই বীরধর্ম পালনের আদর্শবাদ মানবিক অনুভূতির বাস্তবতার নিকট নতি স্বীকার করিতেছে।

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'

রচনা-ভঙ্গি ও বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। অন্যান্য নাট্যকবিতা এক দৃশ্যেই সম্পূর্ণ, কিন্তু ঘটনার দিক দিয়া সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ না থাকিলেও 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য় দুইটি স্বতন্ত্র দৃশ্য আছে। অন্যান্য নাট্যকবিতার মত ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নহে—ছয় মাত্রিক দুই পর্বের মিত্রচ্ছন্দে আদ্যোপান্ত ইহা রচিত। এই ছন্দের গীতিসুর নাট্যধর্মের অনেকটা বিরোধী, সেইজন্য ইহা আদ্যোপান্ত একটি আখ্যানমূলক গাথা কবিতার মত মনে হয়। একটি দীর্ঘ রচনার মধ্যে এক বৈচিত্র্যহীন ও অভিন্ন ছন্দ ব্যবহারের ফলে ইহাতে একটু একঘেয়েমির সৃষ্টি হইলেও, এই ছন্দরচনার মধ্যে নাট্যকারের যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে,—বাংলা সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এত দীর্ঘ রচনার মধ্যে এমন সুনিপুণ মিত্রাক্ষর ছন্দরচনার কৌশল আর কাহারও আয়ত্ত নাই,—তথাপি স্বীকার করিতেই হয়, ছন্দটি সম্পূর্ণ বিষয়োপযোগী হয় নাই।

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'ই রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে একমাত্র পুরুষ-ভূমিকা-বর্জিত নাটক। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা 'কাহিনী'র অন্যান্য নাট্যকবিতার মত কোন পৌরাণিক ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে,—রবীন্দ্র-কবিমানসের কল্যাণধর্মের আদর্শ এখানে একটি লঘু হাস্যরসোজ্জ্বল বাস্তব পরিবেশকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ :

রাণী কল্যাণীর দাসীর নাম ক্ষীরো; তাহার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, মেজাজও তাহার বড় খিট্‌খিটে। কেহ কোন কিছুর জন্য ডাকিলেই একেবারে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। তাহার মুখের জ্বালায় অন্য ঝি-চাকর টিকিতে পারে না—সকলকে তাড়াইয়া দিয়া নিজের ভাইঝি, নাতনী ইহাদের লইয়া নিরুপদ্রবে রাণীর আশ্রয়ে বাস করে। রাণী কল্যাণীর মঙ্গল হস্ত দশদিকে প্রসারিত হইয়া আছে—সংসারের যত দীন দুঃখী তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার করুণা লাভ করে। প্রতিবেশিনীগণ তাঁহার দুর্বলতার সুযোগ লয়, সামনে হাত পাতিয়া যাহার নিকট হইতে সাহায্য নেয়, আবার পিছন ফিরিয়াই তাহার নিন্দা করে। রাণীর ঐশ্বর্য দেখিয়া ক্ষীরো একদিন মনে মনে কল্পনা করে, যদি লক্ষ্মীর দেখা পাইতাম,

তবে পরের বাড়ীতে খাটিয়া মরিবার দুঃখ দূর হইত। সেই রাত্রেই লক্ষ্মী তাহার শিয়রে আবির্ভূত হইলেন; ক্ষীরোকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, তোর এমন মনিবকেও তুই ঠকিয়ে খাস? ক্ষীরো বলিল, আমি দুঃখী, তাই আমি যাহাই করি না কেন, তাহারই মধ্যে দোষ দেখা দেয়, তুমি যদি আমাকে অনুগ্রহ কর, তবে দেখিবে আমার স্বভাবের পরিবর্তন হইয়াছে। লক্ষ্মী বলিলেন, আচ্ছা, তাহাই করিলাম, দেখি তোকে দিয়া আমার যশ রক্ষা পায় কিনা। লক্ষ্মী ক্ষীরোকে আশ্রয় করিয়া কলাণীকে পরিত্যাগ করিলেন। ক্ষীরো পুরাদস্তুর রাণী হইয়া বসিল, পরিচারিকাদিগকে নূতন আদব কায়দা শিখাইল, দুঃস্থ দরিদ্রকে তাহার প্রাসাদের চতুঃসীমা হইতে দূর করিয়া দিল। রাজ্যভ্রষ্টা রাণী কল্যাণী আসিয়া তাহার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাকেও সে তাড়াইয়া দিল। এমন সময় সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল, রাণী কল্যাণী তাহাকে ডাকিতেছেন। সে বুঝিল, এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

ইতিপূর্বে 'হাস্যকৌতুকে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যরচনায় যে শ্রেণীর হাস্য-রসিকতার অবতারণা করিয়াছিলেন, এই নাট্যকবিতাটির মধ্যেও সেই শ্রেণীর হাস্যরসের সঙ্গেই পরিচিত হওয়া যায়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম রসবোধ ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে সুগভীর অন্তর্জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষীরোর চরিত্রটি আদ্যোপান্ত জীবন্ত বলিয়া অনুভূত হয়। রাণী কল্যাণীর মধ্যে উদার দানশীলতার গুণের সঙ্গে একটি সুচতুর বুদ্ধি-বিচক্ষণতারও যে স্পর্শ আছে, তাহাই তাহার চরিত্রটিকে অপরূপ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। সংলাপ একটু একঘেয়ে হইয়া উঠিলেও পরিহাস-রসিকতার গুণে অভিনয়েও ইহা আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়া থাকে।

'সতী'

'গান্ধারীর আবেদনে'র পর অতি অল্পদিনের ব্যবধানেই রবীন্দ্রনাথের 'সতী' ও 'নরক-বাস' নাট্যকবিতা দুইটি রচিত হয়। এই দুইখানি নাট্যকবিতাই ইহাদের পূর্ববর্তী রচনা 'গান্ধারীর আবেদন' কিংবা পরবর্তী রচনা 'কর্ণকুন্তী-সংবাদের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। 'সতী' নাট্যকবিতার বিষয়বস্তু 'মিস্ ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় প্রকাশিত মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওয়ার্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধ বিশেষ হইতে সংগৃহীত।' ইহার মধ্যে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টির অবকাশ ছিল, কিন্তু তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয় নাই; মূলের প্রতি একান্ত আনুগত্যের জন্যই হউক, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, কাব্যাংশও ইহার নিকৃষ্ট হইয়াছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ:

অমাবাইকে বিবাহ-সভা হইতে জোর করিয়া লইয়া গিয়া বিজাপুর রাজ্যের মুসলমান সভাসদ্ তাহাকে বিবাহ করিয়াছে—অমাবাইও তাহাকে স্বেচ্ছায় পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু অমার পিতা বিনায়ক রাও এই মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন; অমার বাগ্‌দত্ত স্বামীর নাম জীবাজি, জীবাজিকেও তিনি এই কঠিন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলেন; বহুদিন পর একদিন এই প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ আসিল, জীবাজি এই মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া এইমাত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে, বিনায়কও সেই মুসলমানকে বধ করিয়াছেন, এমন সময় তিনি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার কন্যার সম্মুখীন হইলেন। অন্যায় যুদ্ধে স্বামীকে বধ করিয়াছেন বলিয়া অমা তাহার পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল; কন্যার মুখে এই অভিযোগ শুনিয়া তিনি একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, তিনি কন্যাকে স্বাতন্ত্র্যচারিণী বলিয়া গালি দিলেন। অমা তাহার পতিগৃহে পুত্রের নিকট ফিরিয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু পিতা তাহাকে তাহার বাগ্‌দত্ত স্বামীর চিতায় সহমরণে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন; অমাবাই বলিল, সেই মুসলমানকেই সে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল, অন্য পতির কল্পনা করাও তাহার পাপ। এমন সময় অমাবাইর জননী রমাবাই আসিয়াও কন্যাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং জীবাজির চিতায় আরোহণ করিয়া তাহার সঙ্গে অসমাপ্ত

বিবাহ আজ সম্পূর্ণ করিতে বলিলেন। অমা অস্বীকৃতা হইল; কিন্তু রমাবাইর আদেশে জীবাজির সৈন্যগণ চিতা সজ্জিত করিয়া তাহাতে জীবাজির দেহের সঙ্গে অমাকেও ভস্মীভূত করিল,অমা বাগ্‌দত্ত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেল।

ইহাতে নাট্যকার বিনায়ক রাও'র চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইলেও, সেই দ্বন্দ্ব তেমন উচ্চাঙ্গ নাট্যিক গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে নাই। মুসলমান কর্তৃক কন্যাপহরণের পর তিনি যেমন অপরাধীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন এবং এই দৃঢ়তার গুণেই প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে কন্যার সম্মুখীন হইয়াই তাঁহার চরিত্রের সেই দৃঢ়তাগুণ লুপ্ত হইয়া গেল। বাৎসল্য ইহার কারণ হইতে পারে, কিন্তু বাৎসল্য দ্বারা তাঁহার মত চরিত্রের এমন আত্মভ্রষ্টতা জন্মিতে পারে কি না, তাহাও বিচার্য। ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যেও এই বাৎসল্যই কার্যকর হইয়াছিল; কিন্তু তাহাও ইহার সুসঙ্গত ধারা কোনদিনই অতিক্রম করিয়া যায় নাই, কিংবা তাহা দ্বারা তাঁহার সমুচিত রাজোচিত মর্যাদাও কোন দিক দিয়া ক্ষুণ্ণ হয় নাই; কিন্তু বিনায়কের কার্যাবলী কোন সুসঙ্গত ধারারই অনুবর্তন করে নাই, সমগ্র দৃশ্যটির মধ্যে তাহার প্রত্যেকটি কার্য পূর্বাপর সম্পর্কহীন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়। বহুদিন পর কন্যার সম্মুখীন হইবা মাত্র তাহার পতিকে হত্যা করিবার গ্লানি যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার চরিত্রগত স্থৈর্য নষ্ট করিল। রমাবাইর চরিত্র আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ, কিন্তু তাহার আচরণ পূর্বাপর সম্পর্ক রহিত নহে। সতীত্ব অপেক্ষা নারীর অন্য ধর্ম নাই, বাগ্‌দত্ত স্বামী জীবাজিই অমার পতি, বিধর্মী পতি নহে, এই সকল বিশ্বাসের মূলে তাহার যে দৃঢ়তা আছে, তাহাই এই চরিত্রটির বিশেষত্ব।

অমার চরিত্র বিশেষত্ব-বর্জিত; মনে হয়, পতিপ্রেম অপেক্ষাও পুত্র-স্নেহ তাহার জীবনে অধিকতর সত্য। পিতার কথায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিতে তাহার কোন আপত্তি ছিল বলিয়া মনে হয় না। একমাত্র বিধর্মীর ঔরসজাত পুত্রই তাহার অন্তরায়। পতি-প্রেম অপেক্ষা পুত্রস্নেহই তাহার মধ্যে বলবত্তর বলিয়া অনুভূত হয়।

'নরক-বাস'

'নরক-বাস' রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে নানাকারণে বিশেষ লক্ষণীয়। মহাভারত হইতে ইহার কাহিনী গৃহীত হইয়াছে। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া ইহার বিষয় পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। 'নরক-বাস'-এর কাহিনীটি এইরূপ—

রাজা সোমক রথারোহণ করিয়া স্বর্গে যাইবার পথে নেপথ্য হইতে কাহার আহ্বান শুনিতে পাইলেন, দেবদূতকে রথ থামাইতে বলিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অস্পষ্ট মেঘলোকে কিছুই দেখিতে পাইলেন না; তাঁহার মর্ত্যের পুরোহিত ঋত্বিক নিজের পরিচয় দিয়া কহিলেন যে, বহুকালাবধি তিনি এই নরকে বাস করিতেছেন; রাজা তাঁহাকে তাঁহার এই পাপভোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঋত্বিক বলিলেন, রাজপুত্রকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিবার পাপেই তাহাকে এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। প্রেতগণ এই কাহিনী শুনিতে চাহিল, তখন রাজা ও ঋত্বিক এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে শুনাইলেন—

বৃদ্ধ বয়সে সোমকের একমাত্র পুত্রের জন্ম হয়। একদিন রাজা পুত্রস্নেহে রাজকর্তব্য বিস্মৃত হইয়া রাজপুরোহিতকে অবহেলা করেন; কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া ইহার প্রতিবিধান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ঋত্বিক পরামর্শ দেন যে রাজা যদি তাঁহার একপত্যতার শাপ দূর করিয়া ভবিষ্যতে কর্তব্যকার্যে অবহেলার পথ রোধ করিতে চাহেন, তবে তাঁহার একমাত্র শিশুপুত্রকে আহুতি দিয়া তাহার ধূম আঘ্রাণ করিলেই মহিষীরা শত পুত্রবতী হইবেন। রাজা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন, রাজপুরোহিত স্বয়ং মাতৃক্রোড় হইতে রাজার শিশুপুত্রকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। এই কাহিনী স্মরণ হওয়া মাত্র রাজার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল এবং তিনি নিজেকেও ঋত্বিকের সঙ্গে এই শিশুহত্যার পাপে সমান অংশীদার বলিয়া বিবেচনা করিয়া নরকবাসে তাঁহার সহচর হইতে প্রার্থনা করিলেন। দেবদূত এবং ধর্মরাজের শত অনুরোধেও তিনি স্বর্গের পথে অগ্রসর হইলেন না, নরকেই বাস করিতে লাগিলেন।

মহাভারতের বনপর্বে কাহিনীটি যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার

অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা হইল। রবীন্দ্রনাথ কতখানি তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছেন, তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

'সোমক-নৃপতি অতি ধার্মিক ছিলেন। তাঁহার একশত ভার্যা ছিল। বহুকাল অতীত হইল, কিন্তু ভূপতি তাঁহাদের কাহারও গর্ভে অপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় বহু যত্নে সেই শত-স্ত্রীর মধ্যে একজনের গর্ভে জন্তু নামে এক পুত্র জন্মিল। মাতৃগণ কামভোগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সেই পুত্রটির চতুর্দিকে উপবিষ্ট থাকিতেন।

একদা একটি পিপীলিকা জন্তুর কটিদেশে দংশন করিলে বালক অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাহার মাতৃগণ সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে তাহার চতুর্দিকে বসিয়া চীৎকার স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ সোমক সভামধ্যে ঋত্বিক ও অমাত্যগণ সমভিব্যহারে উপবিষ্ট ছিলেন, এমত সময়ে অকস্মাৎ অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তিনি সেই বৃত্তান্ত সকল অবগত হইবার নিমিত্ত দৌবারিককে প্রেরণ করিলেন। দৌবারিক যথাবৎ বৃত্তান্ত-সকল অবগত হইয়া রাজসমীপে নিবেদন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণ সমভিব্যহারে গাত্রোত্থানপূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ সোমক ঋত্বিক ও অমাত্যগণ সহ অন্তঃপুর হইতে সভামণ্ডপে উপবেশনপূর্বক কহিতে লাগিলেন—"হায়! একপুত্র কি কষ্টদায়ক! উহা অপেক্ষা অপুত্রক হওয়া উত্তম। একপুত্রতা চিররোগিতা অপেক্ষাও ক্লেশকর। আমি পুত্র লাভেচ্ছায় এই এক শত পত্নীর পরীক্ষা করিয়া পাণিগ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু কাহারও গর্ভে অপত্য উৎপন্ন হইল না; কেবল এই একমাত্র জন্তু বহু-প্রযত্নে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। হায়! ইহার পর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? আমার ঐ পত্নী সমুদয়ের বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইয়াছে, পুত্রলাভের আর কোন সম্ভাবনা নাই; ঐ এক পুত্রেই আমাদিগের প্রাণ পর্যন্ত সমর্পিত হইয়াছে; অতএব হে দ্বিজোত্তম! যদি এমত কোন কর্ম থাকে, যাহাতে শত পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা আদেশ করুন; ঐ কার্য লঘু বা মহৎ, সুকর বা দুষ্কর হউক, অবশ্যই সম্পন্ন করিব।"

ঋত্বিক কহিলেন, "হে মহারাজ! শত পুত্র সমুৎপন্ন হইতে পারে, এমত কর্ম আছে। যদি আপনি তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়েন, তবে আদেশ করি।" সোমক কহিলেন, "হে ভগবান্! যদ্দ্বারা শতপুত্র সমুৎপন্ন হইতে পারে,

এমত কোন কার্য কর্তব্য বা অকর্তব্য হইলেও আমি তাহা অবশ্যই সম্পন্ন করিব, সন্দেহ নাই।"

অনন্তর ঋত্বিক কহিলেন, "হে রাজন; আমি আমার ভবনে এক যজ্ঞ করিব, সেই যজ্ঞে আপনাকে স্বীয় আত্মজ জন্তুর বসায় দ্বারা আহুতি প্রদান করিতে হইবে। সেই সময়ে আপনার পত্নীগণ আহুতি সমুত্থিত ধূম আঘ্রাণ করিলে তাঁহারা সকলেই এক এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন, আর ঐ জন্তুও আপনার যে পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই পত্নীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিবে, উহার বামপার্শ্বে এক অপূর্ব সৌবর্ণ চিহ্ন থাকিবে।"

সোমক কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! এই যজ্ঞে যেরূপ অনুষ্ঠান করা কতব্য, তাহা সমুদয় করুন, আমি পুত্রলাভার্থ আপনার বাক্যানুসারে কার্য কবিব।" তখন ঋত্বিক্ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া রাজমহিষীগণের নিকট হইতে জন্তুকে গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলে, পুত্রবৎসলা রাজমহিষীগণ ঋত্বিকের হস্ত হইতে বলপূর্বক তনয় গ্রহণ করিবার মানসে 'হা হতাস্মি' বলিয়া রোদন করিতে করিতে বালকের দক্ষিণ-কর গ্রহণপূর্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, ঋত্বিকও তাহার বাম হস্ত ধারণ করত বলপূর্বক তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তখন রাজমহিষীগণ উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়া কেবল কুররীকুলের ন্যায় করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋত্বিক্ সেই বালককে সংহার করিয়া তাহার বসা গ্রহণপূর্বক বিধিবৎ আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাজমহিষীগণ তাহার ধূম আঘ্রাণপূর্বক শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া সহসা বসুধাতলে নিপতিত হইলেন।

কিছুদিন পরে রাজমহিষীগণ সকলেই গর্ভবতী হইলেন। দশম মাস পূর্ণ হইলে, তাঁহাদের সকলেরই এক এক পুত্র সমুৎপন্ন হইল। জন্তু সর্বাগ্রে স্বীয় পূর্ব গর্ভধারিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। রাজমহিষীরা স্ব স্ব প্রসূত পুত্রগণ অপেক্ষা জন্তুকে সমধিক স্নেহ করিতেন। জন্তুর বামপার্শ্বে ঋত্বিকের বচনানুরূপ সৌবর্ণ-চিহ্ন লক্ষিত হইল, সর্বজ্যেষ্ঠ জন্তু গুণেও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহারাজ সোমকের ঋত্বিক কালগ্রাসে নিপতিত হইলে, কিয়ৎকাল পরে মহীপতি সোমকও পরলোক যাত্রা করিলেন। তিনি শমন-সদনে গমন করিয়া দেখিলেন, স্বীয় ঋত্বিক্ ঘোরতর নরকে নিপতিত রহিয়াছেন। তখন তিনি ঋত্বিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দ্বিজবর! আপনি কি নিমিত্ত এই ঘোর নরকে নিপতিত রহিয়াছেন?" ঋত্বিক্ কহিলেন,

'হে রাজন! আমি আপনার যে সেই যজ্ঞানুষ্ঠান করাইয়াছিলাম, তাহারই ফলভোগ করিতেছি।" মহাত্মা সোমক-মহীপতি ঋত্বিকের বচন শ্রবণান্তর যমকে কহিলেন, "হে ধর্মরাজ! আমার যাজককে এই নরক হইতে বিমুক্ত করুন; আমি স্বয়ং এই নরকাগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিব, ইনি আমার গুরু, আমারই নিমিত্ত এই নরকানলে দগ্ধ হইতেছেন।" যম কহিলেন, "হে রাজন্! একজনের কর্মফল অন্যে ভোগ করিতে পারে না। ঐ দেখ, তোমার সমুদয় সৎকর্মের ফল বিদ্যমান রহিয়াছে।" সোমক কহিলেন, "এই ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি ব্যতিরেকে আমি পবিত্রলোক ভোগ করিতে বাসনা করি না; স্বর্গেই হউক, আর নরকেই হউক, আমি ইহার সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি। ইহার ও আমার কর্ম-সকল সমান, অতএব আমাদের দুইজনের পুণ্যাপুণ্য ফল সমান হউক।" যম কহিলেন, "যদি তোমার এইরূপ অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে উহার সহিত সমকাল নরক ভোগ কর; পরিশেষে তোমরা উভয়েই সদ্‌গতি লাভ করিবে।"

গুরুপ্রিয় মহারাজ সোমক যমের বচনানুসারে গুরুর সহিত কিয়ৎকাল নরক-ভোগ করত ক্ষীণপাপ ও বিমুক্ত হইয়া পরিশেষে তাঁহার সহিত স্বকর্ম-নির্জিত চিরাভিলষিত শুভফল সমুদয় লাভ করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! সেই মহাত্মা রাজর্ষির এই পরম পবিত্র আশ্রম অগ্রে বিরাজিত রহিয়াছে। ক্ষমাশীল হইয়া এই আশ্রমে ছয় রাত্রি বাস করিলে সদ্গতিলাভ হয়। হে ধর্মাত্মন্! আমরা বিগতক্লম হইয়া সংযত-চিত্তে এই স্থানে ছয় রাত্রি বাস করিব; আপনি সজ্জীভূত হউন।'—(বনপর্ব, ১২৭ অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)

মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গৃহীত কাহিনীর প্রধান পার্থক্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ মূল কাহিনীর সবটুকু গ্রহণ করেন নাই, অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার ফলে মহাভারতের কাহিনীর উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের কাহিনী হইতে সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় না। বিশেষত এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাহিনীটির মধ্যে শিশুহত্যাজনিত বীভৎস রসটি প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাহিনীতে রাজা সোমকের শতপুত্র লাভ করিবার কথা মাত্র আছে, তাহা পাঠ করিলে একথা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না যে, মহিষীগণ সত্যই শতপুত্রবতী হইয়াছিলেন এবং সোমকের একমাত্র পুত্র পুনরায় সেই একই মাতার গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মহাভারতের কাহিনীর তুলনায় সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের কাহিনীতে ঋত্বিকের

পাপের মাত্রা বেশী বলিয়া মনে হয়। বিশেষত ঋত্বিকের প্রতি সোমকের যে কৃতজ্ঞতা আছে এবং যে কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হইয়া সোমক ঋত্বিকের সঙ্গে নরকভোগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাহার ভাবটিও অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। মহাভারতের কাহিনীতে দেখা যায়, ঋত্বিক শেষ পর্যন্ত স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পাপভোগ শেষ হইয়া যাওয়ার পর তিনি সোমকের সঙ্গে একত্রই স্বর্গ গমন করিয়া তাঁহার জীবনের পুণ্যের পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ঋত্বিকের আশ্রমকে মহাভারতে 'মহাত্মা রাজর্ষির পরম পবিত্র আশ্রম' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং সমাজের কাছে ঋত্বিক মহাত্মা এবং পুণ্যবান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাহিনীতে ঋত্বিক চরম পাষণ্ড রূপেই চিত্রিত হইয়াছেন, তাঁহার জীবনে কোন যে পুণ্যফল ছিল এবং তাহা দ্বারা যে তিনিও সোমকের সঙ্গেই একদিন স্বর্গ গমন করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত মাত্রও অনুভব করিতে পারা যায় না। ঋত্বিক রাজার কল্যাণে যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, রাজা তাহার ফললাভ করা সত্ত্বেও ঋত্বিক নরকবাস করিতেছিলেন বলিয়াই ঋত্বিকের প্রতি রাজার কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল; সোমক যজ্ঞফল যদি লাভ না করিতেন, ঋত্বিক কর্তৃক মিথ্যা প্রতারিত হইয়াছেন বলিয়া যদি বুঝিতেন, তবে কদাচ তাহার দিকে তিনি ফিরিয়াও তাকাইতেন না।

যে যজ্ঞের প্রকৃতই ফললাভ করা গিয়াছিল, সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ঋত্বিকের নরকবাস করিবার মত কি অপরাধ হইয়াছিল, এই প্রশ্ন মনে উদয় হইতে পারে। যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় ত্রুটি কিংবা বৈধকর্মে হিংসার জন্য ঋত্বিক প্রত্যবায়ভাগী হইয়া নরকে গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কাহিনীকে এই শাস্ত্রীয় দিক হইতে বিচার না করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবিকতাবোধ দ্বারা বিচার করিয়াছেন। সেইজন্যই ঋত্বিকের পাপ তাঁহার নিকট দুরপনেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহা বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের ফল বলিয়াও স্বীকার করিতে হয়। বৌদ্ধধর্ম যজ্ঞ এবং যজ্ঞে প্রাণী হত্যাকে নিন্দা করিয়াছে, তাহার প্রভাব পরবর্তী কালের ভারতীয় চিন্তা এবং কর্মের মধ্যে নানা ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। মহাভারতের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রচ্ছন্ন প্রভাব বহু ক্ষেত্রেই অনুভব করা যায়। ইহাও তাহারই ফল বলিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধপ্রভাব সত্ত্বেও নরমেধ যজ্ঞের ঋত্বিককে শেষ পর্যন্ত যে স্বর্গ গমনের অধিকার দেওয়া

হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবকে জয় করিয়াও শেষ পর্যন্ত বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। রামায়ণের তুলনায় মহাভারতের যুগে সমাজে ব্রাহ্মণের অধিকার যে অনেকখানি খর্ব হইয়াছিল, ঋত্বিকের নরকবাস তাহারই ফল।

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের কাহিনীটি অংশত গ্রহণ করিয়াছেন, সোমকের একমাত্র পুত্রের জন্তুরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণের কথা বাদ দিয়াই রবীন্দ্রনাথ ঋত্বিককে অখণ্ড নরকবাসী করিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতে ঋত্বিক যে অখণ্ড নরকবাসী নহেন এবং রাজাও যে তাহার সঙ্গে অনন্তকাল ধরিয়া নরকবাস স্বীকার করিয়া লন নাই, তাহা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিবার যোগ্য। ঋত্বিকের প্রতি রাজার কৃতজ্ঞতার প্রকৃত ক্ষেত্রটির সন্ধান করিতে না পারিলে রাজার নরক-বাস স্বীকৃতির তাৎপর্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে না; ইহাকে উদ্দেশ্যহীন আত্মত্যাগ বলিয়া ভুল হইবে, অনেক সমালোচকই এই ভুল করিয়াছেন।

নাট্য-কাহিনীটি মূলত পৌরাণিক হইলেও ইহার মধ্যে কিছু পাশ্চাত্ত্য প্রভাবও আছে। মর্ত্য ও স্বর্গের মধ্যবর্তী স্থানস্থিত যে নরকের পরিকল্পনা ইহাতে করা হইয়াছে, তাহা মহাভারত কিংবা হিন্দুপুরাণ-সম্মত ধারণা নহে, ইহাতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। নরকের বর্ণনায় পাশ্চাত্ত্য ধারণাকে অনুসরণ করিবার রীতি বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদনের বর্ণনা ইহা হইতেও প্রত্যক্ষ।

হিন্দু ধর্মসংস্কারের হৃদয়হীনতা বর্ণনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক কালেই 'কথা'-কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত আরও দুইটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা 'দেবতার গ্রাস' ও 'বিসর্জন'। 'নরক-বাস'ও এই শ্রেণীরই রচনা। হিন্দুধর্মসংস্কারের হৃদয়হীনতা বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি রচনাই সমান। তবে সংস্কারের বশবর্তী হইয়া অসহায় শিশুহত্যার যে নির্মম চিত্র এই তিনটি রচনার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যেও বোধ হয় 'নরক-বাসে'র বর্ণনাটিই নিষ্ঠুরতম; এক কথায় 'নরক-বাসে'র শিশুহত্যার বর্ণনাটি বীভৎস হইয়াছে, অথচ মহাভারতের কাহিনী এত বীভৎস নহে, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

মানুষের অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলির উপর অহেতুক নির্মম উৎপীড়ন করিলেই প্রকৃত করুণরসের সৃষ্টি হয় না; করুণরসের যে একটা মানবিক আবেদন আছে, বীভৎস রসে তাহা নাই; অসহায় শিশুহত্যার বীভৎসতা

বর্ণনায় যে রসের সৃষ্টি হয়, তাহা সাহিত্য-নীতি দ্বারাও সমর্থিত হইবার যোগ্য নহে। অথচ রবীন্দ্রনাথের সংযম ও সৌন্দর্য-সন্ধানী কবিমনও যে কি ভাবে এক এক সময় মানুষের বিকৃতবুদ্ধির প্রতি বিতৃষ্ণায় বিরূপ হইয়া পড়িত, তাহা এই রচনাগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। 'নরক-বাসে'র মত কাহিনী সংস্কারধর্ম পালনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অশ্রদ্ধারই অভিব্যক্তি মাত্র, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। হৃদয়ধর্মের বিরুদ্ধে সংস্কারধর্মের যে সংগ্রামের চিত্র তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায়, 'কাহিনী'র যুগেও তাহার প্রভাব একেবারে তিরোহিত হয় নাই, বরং এই যুগে ইহাদের ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়াছে। তাহা হইবারও কথা ; কারণ, এই যুগের রচনায় নাটক অপেক্ষা কবিতার গুণ অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানস সংস্কারধর্মের সকল পরিকল্পনাকেই স্পর্শ করিয়া ছিল ; অতএব 'নরক-বাসে'র মধ্যেও শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্ম-সংস্কারের যে নির্মমতার চিত্র প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা সংস্কারধর্ম পালনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথেরই ব্যক্তিগত প্রতিবাদ মাত্র।

বিষয়বস্তু ও আদর্শগত এই সকল ত্রুটি থাকার পরও 'নরক-বাসে'র চরিত্র পরিকল্পনাও যে উচ্চাঙ্গের হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রথমেই রাজা সোমকের চরিত্রের কথা বলিতে হয়। কাহিনীর বীভৎসতার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়াই হউক কিংবা নিতান্ত ব্যক্তিত্বের অভাবেই হউক, তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ অপরিস্ফুট রহিয়াছে। তাহার চরিত্রের প্রথম অংশে তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় যে দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যত্র কোন আচরণে তাঁহার সেই দৃঢ়তার পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। প্রেতলোকে ঋত্বিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর তাহার চরিত্রগত যে মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাও অপরিস্ফুট হইয়াছে ; কারণ, ব্রাহ্মণের পাপ-ভোগ দেখিয়া তিনি নিজেও উপলব্ধি করিলেন,—

মত্ত হয়ে ক্ষাত্র অহঙ্কারে
নিজ কর্তব্যের ত্রুটি করিতে ক্ষালন
নিষ্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ
হুতাশনে, পিতা হয়ে। বীর্য আপনার
নিন্দুক সমাজ মাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায়
অনলে করেছি ভস্ম।

পুত্রহত্যায় তাহার নিজের দায়িত্বের কথা এইভাবে স্মরণ হইবার ফলেই তাঁহার আত্মকৃত নরকভোগের গৌরব আপনা হইতে অনেকখানি লাঘব হইয়া যায়। নাট্যকার ঋত্বিকের জন্য পূর্ব হইতেই নরক-বাসের ব্যবস্থা করিলেও শেষ পর্যন্ত রাজার উপর এই পাপের দায়িত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাকেও নরকের দ্বার পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছেন—তাহার ফলে স্বর্গ প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বেচ্ছায় নরকবাসের প্রার্থনার মধ্যে তাঁহার যে গৌরব প্রাপ্য ছিল, তাহা হইতেও তাঁহাকে বহুলাংশে বঞ্চিত করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সোমক চরিত্রকে শাস্ত্রীয় ধর্মাধর্ম নিরপেক্ষ মানবপ্রেমিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও তাহার মধ্যে একটু বিরোধ আছে বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। সভাস্থলে ঋত্বিক্ তাঁহাকে নিজের শিশুপুত্রকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়া নরমেধযজ্ঞ করিতে বলিলেন, তখন তিনি তাঁহার কথায় শতপুত্র লাভের আশায় নিজের একমাত্র পুত্রকে আহুতি দিতে স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না।

নারীর আর্তবিলাপে চৌদিক
কাঁদি উঠে, প্রজাগণ করে ধিক ধিক,
বিদ্রোহ জাগাতে চায় যত সৈন্যদল
ঘৃণাভরে। নৃপ শুধু রহিল অটল।

এই অবস্থাতেও তাঁহার মনে মানব-প্রেমের অনুভূতি বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। তাহা হইলে নিজের প্রজাবর্গকেই নিজের সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়া নিজের এক পুত্রের মধ্যেই শান্তিলাভ করিতে পারিতে । কিন্তু তখন পর্যন্ত তিনি সংস্কার ধর্মের নিকট নতি স্বীকার করিয়া নিজের হৃদয়ধর্মকে বিসর্জন দিয়াছিলেন। তারপর ঋত্বিককে নরক-বাস করিতে দেখিয়াই তাঁহার হৃদয়মধ্যে প্রথম মানব-প্রেমের উদয় হইয়াছিল, নতুবা স্বর্গের পথে তাঁহার যাত্রা কোনদিক দিয়াই ব্যাহত হইত না। ঋত্বিককে নরক-বাস করিতে দেখিয়াই তাঁহার সকল পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অনুতপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, এখানেই তিনি হৃদয়-ধর্মকে প্রথম স্বীকৃতি জানাইলেন। তিনি তাঁহার চরিত্রে যদি আনুপূর্বিক হৃদয়-ধর্মকেই স্বীকার করিতেন, তবে শিশুহত্যা জনিত পাপ এবং তজ্জাত অনুতাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন।

'বিদায়-অভিশাপ'

'কাহিনী' রচনার কয়েক বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ আর একখানি নাট্যকবিতা রচনা করেন, তাহার নাম 'বিদায়-অভিশাপ।' ইহা একখানি প্রেম-বিষয়ক রচনা। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ দেবতাদিগের আদেশে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য মর্ত্যে আগমন করেন। শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর মনস্তুষ্টি বিধান করিয়া কচ শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। সহস্র বৎসর কচ দৈত্যগুরুর আশ্রমে অতিবাহিত করেন এবং দেবযানীর সহায়তায় তাঁহার পিতার নিকট হইতে সমগ্র সঞ্জীবনী বিদ্যা উদ্ধার করেন। স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিবার কালে কচ দেবযানীর নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিলেন। এই বিদায়ের কাহিনীই নাট্যকবিতাখানিতে বর্ণিত হইয়াছে। কচ দেবযানীর নিকট যখন বিদায় প্রার্থনা করিলেন, তখন দেবযানী কচের অন্তরের অন্তরতম কথাটি জানিতে চাহিলেন। কচ নিজের মনোভাব প্রথমে গোপন করিয়াও, দেবযানীর সুচতুর জিজ্ঞাসায় তাঁহার অন্তরে দেবযানীর প্রতি প্রণয়ানুভূতির কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। দেবযানী কচকে স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে মিনতি করিলেন ; কচ বৃহত্তর কর্তব্যবোধকে ব্যক্তি-অনুভূতির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। অভিমানাহতা হইয়া দেবযানী কচকে অভিশাপ দিলেন যে, যে বিদ্যার জন্য তিনি তাঁহাকে অবহেলা করিলেন, সে বিদ্যা তাঁহার সম্পূর্ণ বশ হইবে না—তিনি অন্যকে তাহা শিখাইতে পারিলেও, নিজে তাহা প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। বিনিময়ে কচ তাহাকে বর দিলেন যে, দেবযানী সুখী হইবেন।

কাহিনীটি মূলত মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও, কবি ইহার শেষাংশে কচের চরিত্রের উৎকর্ষ নির্দেশ করিবার জন্য সামান্য একটু পরিবর্তিত করিয়াছেন। মহাভারতে আছে, কচও দেবযানীকে প্রত্যভিশাপ দিয়াছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে অভিশপ্ত কচকে দিয়া দেবযানীকে বর দেওয়াইয়াছেন।

মহাভারতের আদিপর্ব হইতে মূল কাহিনীটি এখানে বর্ণনা করিয়া ইহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত কাহিনীর তুলনা করা যাইতে পারে।

'ব্রতপরায়ণ কচ গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ত্রিদশালয়ে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, দেবযানী কহিলেন, "হে মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র কচ! তুমি কুল, শীল, বিদ্যা, তপস্যা ও শ্রম-দমাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। মহযশাঃ অঙ্গিরা যেমন আমার পিতার মান্য, তোমার পিতা বৃহস্পতি আমার পিতার সেইরূপ মান্য ও পূজনীয়। এই আলোচনা করিয়া আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে তপোধন, তুমি নিয়মস্থ বা ব্রতনিষ্ঠ হইলে আমি তোমার সবিশেষ শুশ্রূষা করিতাম; এক্ষণে তুমি কৃতবিদ্য হইয়াছ, আমি তোমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা, অতএব মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক আমার পাণিগ্রহণ কর।" কচ কহিলেন, "হে শুভে! তোমার পিতা শুক্রাচার্য আমার যেরূপ মান্য ও পূজনীয়, তুমিও তদ্রূপ পূজনীয়া। হে ভদ্রে! তুমি ভগবান ভার্গবের প্রাণ হইতেও প্রিয়তরা কন্যা। তুমি ধর্মত' আমার গুরুপুত্রী, সুতরাং আমাকে এরূপ কথা বলা তোমার উচিত হইতেছে না।" দেবযানী কহিলেন, "তুমি আমার পিতার পুত্র নহ। তুমি পিতার গুরুপুত্রের পুত্র। কেবল এই নিমিত্ত তুমি আমার মান্য ও পূজনীয়। কিন্তু অসুরেরা তোমাকে বারংবার নষ্ট করিয়াছিল। সেই অবধি আমি তোমাতে একান্ত অনুরক্তা হইয়াছি। তোমার প্রতি আমি যেরূপ ভক্তি, সৌহার্দ ও অনুরাগ করিয়া থাকি, তাহার কিছুই তোমার অবিদিত নহে। অতএব হে ধর্মজ্ঞ! এখন তুমি নিরপরাধিনীকে পরিত্যাগ করিও না।" কচ কহিলেন, "হে শুভব্রতে! অনিযোজ্য বিষয়ে আমাকে নিয়োগ করা উচিত হইতেছে না। হে বালে! তুমি আমার গুরু হইতেও গুরুতরা! এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে বিশালাক্ষি! তুমি যে শুক্রের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছ, আমি তাহারই উদরে বাস করিয়াছিলাম; সুতরাং তুমি ধর্মতঃ আমার ভগিনী হইলে, অতএব এরূপ কথা আর কহিও না। হে ভদ্রে! এতদিন এই স্থলে সুখে বাস করিলাম, এক্ষণে অনুমতি কর, গৃহে গমন করি এবং আশীর্বাদ কর, যেন পথিমধ্যে আমার কোন বিঘ্ন ঘটনা না হয়। কথাপ্রসঙ্গে আমাকে এক একবার স্মরণ করিও এবং সতত সাবধানে আমার গুরু শুক্রাচার্যের পরিচর্যা করিও।" দেবযানী কহিলেন, "হে কচ! তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, তোমার সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী হইবে না।" কচ কহিলেন, "আমি কোন দোষাশঙ্কায় তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি, এমন নহে, গুরুপুত্রী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছি; এবং এ বিষয়ে গুরুর অনুমতি নাই, সুতরাং তুমি অকারণে

আমাকে অভিসম্পাত করিলে। হে দেবযানি! আমি তোমাকে আর্য-ধর্মের উপদেশ প্রদান করিতেছিলাম, তথাপি তুমি আমাকে অভিশাপ দিলে। ফলতঃ আমি শাপের উপযুক্ত নহি এবং তোমার এই শাপও ধর্মতঃ নহে, কামতঃ; অতএব আমি তোমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা নিষ্ফল হইবে এবং অন্য কোন ঋষিকুমারও তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না। আর তুমি আমাকে অভিসম্পাত করিলে যে তোমার অধীত বিদ্যা সিদ্ধ হইবে না; ভাল, তাহা আমি স্বীকার করিলাম; কিন্তু আমি যাহাকে ঐ বিদ্যা অধ্যয়ন করাইব, সে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিবে।" কচ দেবযানীকে এইরূপ প্রতিদান প্রদান করিয়া সত্বর দেবলোকে উপনীত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ কচকে অভ্যাগত দেখিয়া বৃহস্পতির সমক্ষে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে কচ! তুমি আমাদিগের যে পরমাদ্ভুত হিতকার্য সম্পাদন করিলে, তাহাতে তোমার যশঃ চিরস্থায়ী হইবে এবং আমাদিগের অংশভাগী হইবে।"—আদিপর্ব, ৭৭ অধ্যায়, ঐ

রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের কাহিনীর একটি স্থূল পার্থক্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের দেবযানী কচকে অভিশাপ দিবার পর কচও দেবযানীকে যে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন; দেবযানী কর্তৃক নিতান্ত বিনা দোষে কচ অভিশপ্ত হইয়াও তাহাকে সুখী হইবার তিনি বর দিয়াছেন। মহভারতের কাহিনীতে এখানে যে বাস্তববোধ প্রকাশ পাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনীতে তাহা পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ পুরুষ চরিত্রকে সর্বদাই আদর্শায়িত করিতে চাহিয়াছেন, এখানেও তাহার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তিনি মহাভারতের বিস্তৃত পটভূমিকা হইতে কাহিনীটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া কাহিনীটির একটি স্বাধীন রূপ দিতে চাহিয়াছেন। মহাভারতের এই কাহিনীর সঙ্গে দেবযানীব জীবনের পরবর্তী অংশেরও যোগ আছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তেমন কোন দায়িত্ব পালন করিতে যান নাই। তিনি কচ চরিত্রকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য তাহাকে অনেকখানি রক্তমাংসের সম্পর্কশূন্য করিয়াছেন। মহাভারতে কচ চরিত্রের গৌরব যে লাঘব করা হইয়াছে, তাহাও নহে। কারণ, কামপরবশ হইয়া দিগ্‌বিদিক-শূন্যা দেবযানী কর্তব্যপরায়ণ সংযতচিত্ত কচকে যে অকারণে অভিশাপ দিল, তাহার এই অসংযত আচরণের জন্য তাহারও দণ্ডভোগ করা কর্তব্য ছিল। কচের অভিশাপে দেবযানী তাহাই পাইয়াছে।

কাব্যের তৎপর্য ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পঞ্চভূত' নামক প্রবন্ধ-পুস্তকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে এই কবিতাটির নানা প্রকার ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে যে ব্যাখ্যাটি তাঁহার নিজের সমর্থন লাভ করিয়াছে, তাহা এই—'কচ-দেবযানী সংবাদে মানব-হৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদ-কাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন, তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।' প্রকৃত পক্ষে মানবমনের চিরন্তন বৃত্তি প্রেমই এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্যখানির উপজীব্য—ইহাতে কোন তত্ত্বকথা নাই।

অপরিসর ক্ষেত্রের মধ্যেও দেবযানীর চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি। দেবযানীর কুমারী-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার যে বিচিত্র রূপ কবির দৃষ্টিতে এখানে অনাবৃত হইয়াছে, তাহার অনুভূতি একান্তই মানবিক বলিয়া গভীরভাবে পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে। দেবযানীর চরিত্রের এই বাস্তব দিকটাই এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্যখানিকে এক অপরূপ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। প্রণয়াস্পদের প্রতি দেবযানীর অভিশাপের বাস্তব মূল্য সম্পর্কে বিচার করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহারও অপূর্ব সার্থকতা রহিয়াছে। দেবযানী মানবী, তাহার প্রণয়-স্বপ্নজাত সুখ ও প্রণয়-ভঙ্গজাত বেদনা উভয়ই তুল্যরূপে গভীর। যখন তিনি বঞ্চনার আঘাত পাইলেন, তখন তাঁহার নারীহৃদয় স্বভাবতই আর্তনাদ করিয়া উঠিল, ইহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রূপেই প্রকাশ পাইল তাঁহার অভিশাপ। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও বলিয়াছেন, 'ব্যর্থ প্রেম দেখা দেয় রোষের ধরিয়া ছদ্মবেশ।' কিন্তু কচ-চরিত্রের মধ্যে আদর্শের স্পর্শ রহিয়াছে; কচ পুরুষের কর্তব্য-নিষ্ঠ জীবনাদর্শের প্রতীক্। পুরুষ যত সহজে স্বভাবকে জয় করিতে পারে, নারী তত সহজে পারে না, সেইজন্য কচকে আদর্শের প্রতীক্ করা সত্ত্বেও ইহার নাট্যিক মূল্যও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যে মহান্ কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য কচ মর্ত্যে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার সাফল্যের আনন্দে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ; সেইজন্য তিনি প্রত্যভিশাপের পরিবর্তে বর প্রদান করিলেন, আর রিক্তা নারী অন্তরের স্বাভাবিক বেদনায় অভিশাপের অকল্যাণ বর্ষণ করিল। কবিদৃষ্টি লইয়া রবীন্দ্রনাথ মহাভারতোক্ত কাহিনীর এই অংশ এই ভাবে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন।

নাট্যকবিতাগুলি আকারে সংক্ষিপ্ত হইলেও অভিনীত হইবার যোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন নাট্যকবিতা সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলি তাঁহার 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে কাহিনীগুণ অপেক্ষা কবিতা ও নাটকের গুণই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে—প্রকৃত কাহিনী ইহাতে নিতান্ত গৌণ। পুরাণ এবং ইতিহাসাশ্রিত চরিত্রগুলির ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া ইহারা রচিত হইয়াছে বলিয়াই কাহিনীর যে একটি সংস্কার ইহাদের প্রত্যেকটিরই পটভূমিকা আশ্রয় করিয়া ছিল, রবীন্দ্রনাথ এখানে তাহারই সদ্ব্যবহার করিবার ফলে কাহিনীর ধারা কিংবা ঘটনা বর্ণনা করিবার দায়িত্ব হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার স্থলে একান্ত মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে ভিত্তি করিয়া তিনি ইহাদের রচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

রঙ্গনাট্য

বাংলার সামাজিক জীবনের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকখানি গদ্যনাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাদিগকে সাধারণভাবে রঙ্গনাট্য বলিয়া উল্লেখ করা যায়। রামনারায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া অমৃতলাল বসু পর্যন্ত ব্যঙ্গাত্মক নাট্যরচনার যে ধারা বাংলা সাহিত্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রঙ্গনাট্যগুলির কোন যোগ নাই। সমাজের বৃহত্তর কোন সমস্যা লইয়া তিনি কোন ব্যঙ্গাত্মক নাটক রচনা করেন নাই। তাঁহার এই বিষয়ক নাটক—ক্ষুদ্র কিংবা পূর্ণায়তন যেমনই হউক না কেন, বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া সর্বত্রই নিতান্ত সাধারণ। এমন কি, নিজের পারিবারিক জীবনের কোন কোন চরিত্র অবলম্বন করিয়া তিনি এই শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়াছেন। রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, অমৃতলাল যেমন দেশের সমসাময়িক কোন রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক অবস্থাকে ব্যঙ্গ করিয়া নাটক রচনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কোন রঙ্গনাট্যেই তাহার কোন প্রসঙ্গ দেখা যায় নাই। অনেকে 'চিরকুমার সভা' নাটকটিকে তাঁহার স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কেই মুখ্য ভাবে অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছিল কি না, তাহা বলিবার উপায় নাই; গৌণভাবে তাহার ইঙ্গিত হয়ত ে .তে আসিয়া থাকিবে। বিশেষতঃ 'চিরকুমার সভা'র পরম উপাদেয় হাস্যরস কটু ও তিক্ত ব্যঙ্গরসকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রঙ্গনাট্যের একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহারা বিষয়ের দিক দিয়া বৈচিত্র্যহীন। একমাত্র নাগরিক জীবনই ইহাদের অবলম্বন এবং নাগরিক জীবনেও যে বৈচিত্র্য আছে, ইহাদের মধ্যে নাট্যকার তাহারও সন্ধান করিতে পারেন নাই। জীবন কিংবা সমাজের কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ইহাদের লক্ষ্য নহে বলিয়া এবং এমন কি, অনেক সময় ইহাদের উপাদান রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পারিবারিক জীবন হইতে গৃহীত বলিয়া, ইহারা বাংলা সাহিত্যে কোন সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

‘বশীকরণ’

‘হাস্যকৌতুক’ ও ‘ব্যঙ্গকৌতুকে’র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে সকল ক্ষুদ্র কৌতুক-নাট্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ‘ব্যঙ্গকৌতুকে’র অন্তর্গত ‘বশীকরণ’ই একটি পূর্ণাঙ্গ ক্ষুদ্র নাটিকার মর্যাদা লাভ করিতে পারে। ইহার ঘটনা-সংস্থাপনের মধ্যে উচ্চাঙ্গ হাস্যরসের উপাদান আছে, ব্যক্তি ও সমাজ-বিশেষের প্রতি ইহার মধ্যে বিদ্রূপ ও শ্লেষ প্রকাশ করা হইলেও, তাহা নাটকের মুখ্য বিষয় হইয়া উঠিতে পারে নাই ; সেইজন্য কাহিনীর অনাবিল হাস্যরস শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ‘বশীকরণ’-এর কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

অবিবাহিত যুবক আশু তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং যাহারা ইহার সাধনা করে, তাহাদের নিকট সর্বদা যাতায়াত করিয়া থাকে। অন্নদা ব্রাহ্ম হইয়াছে শুনিয়া তাহার শ্বশুর অন্নদার স্ত্রীকে বিধবার বেশ ধারণ করাইয়া হিন্দুধর্মের বিবিধ আচার-পালনের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রমন্ত্রেও অধিকারিণী করিয়া তুলিলেন। পিতার মৃত্যুর পর অন্নদার স্ত্রী তাঁহার স্বামীর সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; একবার কলিকাতায় আসিয়া বাইশ নম্বর বাড়ী ভাড়া করিলেন এবং তাঁহার বিদ্যার কথা চারিদিকে প্রচার করিয়া দিলেন। শুনিতে পাইয়া আশু তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিল। বিধবা শ্যামাসুন্দরী তাঁহার কন্যার বিবাহ সন্ধান করিতে কলিকাতায় আসিয়া ঊনচল্লিশ নম্বর বাড়িতে উঠিলেন। ঘটকের মধ্যস্থতায় অন্নদার সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব হইল, অন্নদা মেয়েটিকে দেখিতে চলিল। অন্নদার স্ত্রী মাতাজি বলিয়া পরিচিত। ইতিমধ্যে তিনি আকস্মিক সংবাদে ঊনচল্লিশ নম্বর বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন, বাড়ীওয়ালা শ্যামাসুন্দরীকে বাইশ নম্বর বাড়ীতে স্থান দিল। এই আকস্মিক পরিবর্তনের কথা অন্নদা কিংবা আশু কেহই জানিল না। অতএব অন্নদা গিয়া মাতাজির নিকট উঠিল, আশু শ্যামাসুন্দরীর বাড়ী গেল। মাতাজি অন্নদাকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিল এবং অন্নদাকে বশীকরণের মন্ত্র পড়াইয়া নিজের পরিচয় প্রকাশ করিয়া দিল। অন্নদা স্ত্রীকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিল। এদিকে আশুকেই প্রস্তাবিত পাত্র বিবেচনা করিয়া শ্যামাসুন্দরী তাহার সঙ্গে সেইরূপই ব্যবহার করিলেন, আশু মেয়েটিকেও দেখিল। নিজের ভুল বুঝিতে আশুর দেরি হইল না, অন্নদার নিকট ছুটিয়া গিয়া এই ভুল সংশোধন করিতে চাহিল ; কিন্তু

গিয়া দেখিল, তাহার আর উপায় নাই। মেয়েটিকে দেখিয়া আশু আগেই মুগ্ধ হইয়াছিল, অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিতে সে নিজেই আর কোন আপত্তি করিল না।

এই নাটকের মধ্যে যদিও পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁহার শিষ্য চন্দ্রনাথ বসু কৃত হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, তথাপি তাহা নাটকের মধ্যে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া ইহার অনাবিল হাস্যরসের স্রোতে কোন কার্যকারী বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

ইহা প্রকৃতপক্ষে একটি মনোরম comedy of error বা ভ্রান্তিবিনোদ। ইহার ভ্রমোৎপাদনের মূলে কোনরূপ পীড়াদায়ক অসঙ্গতি না থাকায় ইহা যেমন সহজেই আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে, আবার ইহার পরিণতিটি পরম সুখকর বলিয়া তাহাও মনের উপর একটি গভীর রসোজ্জ্বল রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রহসনগুলির মধ্যেও কাহিনীগুণে ইহার সমকক্ষ আর কোন রচনা নাই। অথচ 'বশীকরণ' রবীন্দ্র-সাহিত্যে সুপরিচিত রচনা নহে।

'বশীকরণ'-এর কথা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের আর তিনখানি মাত্র রঙ্গনাট্য উল্লেখযোগ্য—'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও 'চিরকুমার সভা'। অনতি-কাল ব্যবধানেই এই তিনখানি রঙ্গনাট্য রচিত হইয়াছিল। সেইজন্য ইহাদের বিষয় ও ভাবগত অনৈক্য খুব বেশি নাই। তিনখানি নাটকের মধ্যেই বিবাহ-সমস্যাকে প্রধান উপজীব্য করা হইয়াছে। এই বিবাহ সংঘটনের দিক দিয়া 'গোড়ায় গলদে' সামান্য বৈচিত্র্য থাকিলেও, 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং 'চির-কুমার সভা'য় এ বিষয়ে বিশেষ অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায় না,—উভয় ক্ষেত্রেই ভগিনীপতির অবিবাহিতা শ্যালিকার বিবাহ-সমস্যা লইয়াই নাটকের সূত্রপাত হইয়াছে এবং কৌশল অবলম্বন দ্বারা বিবাহ-কার্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের যবনিকা পাত হইয়াছে। এই বিষয়ে 'বশীকরণ'-এর সঙ্গেও এই নাটক তিনখানির বিষয় এবং ভাবগত ঐক্য আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী জীবনের বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র তাঁহার রঙ্গনাট্যের পটভূমিকারূপে ব্যবহার করিতে পারেন নাই—এই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি নির্দিষ্ট সমাজের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া ছিল। ইহাদের বৈচিত্র্যের অভাব যে ইহাদের পাঠকমনকে ঈষৎ পীড়িত না করে, তাহা বলিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ যে-সমাজ অবলম্বন করিয়া এই তিনখানি

রঙ্গনাট্য রচনা করিয়াছেন, তাহাও এক এবং অভিন্ন—কলিকাতার নাগরিক সভ্যতার এক অভিজাত সমাজ-জীবনই তাঁহার এই রঙ্গনাট্যগুলির উপজীব্য। ইহার কারণ, রবীন্দ্রনাথ প্রধানত জীবন্ত চরিত্র সম্মুখে রাখিয়াই তাঁহার রঙ্গনাট্যের চরিত্রগুলির পরিকল্পনা করিয়াছেন। বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ক্ষেত্র খুব বিস্তৃত ছিল না ; সেইজন্য কেবলমাত্র নিজের পারিবারিক জীবন কেন্দ্র করিয়াই প্রধানতঃ তিনি এই চরিত্রগুলি পরিকল্পনা করিয়াছেন। যাঁহারা বস্তুনিষ্ঠ নাট্যকার, তাঁহারা জীবন্ত চরিত্র সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে আদ্যোপান্তই নিখুঁত করিয়া রূপায়িত করিতে পারেন, দীনবন্ধু মিত্রই তাহার প্রমাণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, কোন প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবন অবলম্বন করিয়া তাঁহার চরিত্র-পরিকল্পনার সূত্রপাত হইলেও, শেষ পর্যন্ত তিনি তাহাদের বাস্তবধর্ম রক্ষা করিতে পারিতেন না— তাঁহার নিজস্ব কল্পনাও আসিয়া তাহাতে যোগ দিত। সেইজন্য দীনবন্ধুর চরিত্রগুলি যেমন কোনটি কে, তাহা অনেক সময় আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগুলি তাহা পারা যায় না। দীনবন্ধুর পরিকল্পনা আনুপূর্বিক বাস্তব, রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা বাস্তব এবং কল্পনা মিশ্রিত। তাঁহার পরিকল্পিত একই চরিত্রের মধ্যে তাঁহার পরিচিত বিভিন্ন চরিত্রের বিবিধ গুণাবলীর সঙ্গে নিজস্ব মতবাদ আসিয়াও সংমিশ্রণ লাভ করে। ইহার ফলে যদিও অনুভব করিতে মোটেই বেগ পাইতে হয় না যে, রবীন্দ্রনাথের রঙ্গ-নাট্যের প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে একদিন যাতায়াত করিত, তথাপি কোনটি যে কে, তাহা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না। 'চিরকুমার সভা'র এক চন্দ্রবাবুর মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু ও নাট্যকারের নিজস্ব কতকটা চরিত্রগুণ অসিয়া মিশিয়াছে, 'নির্মলা'র মধ্যে সরলা দেবীর অস্পষ্ট ছায়া মাত্র অনুভূত হয়, অক্ষয়ের মধ্যে অক্ষয় চৌধুরীর কতকটা গুণ মাত্র অনতিপরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের কাহারও মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট আনুপূর্বিক একটি চরিত্র সম্যক্ বিকাশ লাভ করে নাই।

'গোড়ায় গলদ'

সর্বপ্রথম আনুপূর্বিক গদ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ নাটক 'গোড়ায় গলদ'। ইহা একখানি প্রহসন। 'গোড়ায় গলদে'র মধ্যে শ্লেষ বা ব্যঙ্গের কোন লক্ষণ নাই, ইহা অনাবিল হাস্যরসের ধারায় সমুজ্জ্বল। 'মানসী'র প্রায় দুই বৎসর পর 'গোড়ায় গলদ' রচিত হয়, 'মানসী'র ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি যাহাই থাকুক না কেন, তাহাদের সঙ্গে 'গোড়ায় গলদে'র কোন যোগ নাই। 'গোড়ায় গলদ' কোন উদ্দেশ্যমূলক রচনা নহে, কিংবা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কোন সামাজিক মনোভাব ইহার মধ্য দিয়াও ব্যক্ত হইবার অবকাশ পায় নাই। ইহার একটি মূল্য এই যে, বাংলার প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবন হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম নাট্যরচনা। এমন কি, কয়েকটি ছোটগল্প বাদ দিলে ইহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বাংলার সমাজ-বিষয়ক আর কোন রচনা প্রকাশ করেন নাই। ইহার কাহিনীভাগ সংক্ষেপে এই—

বিনোদবিহারী, নলিনাক্ষ, চন্দ্রকান্ত, ললিত, নিমাই ইহারা পরম বন্ধু। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র চন্দ্রকান্ত বিবাহিত, অন্য সকলেই অবিবাহিত নব্য-যুবক; কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে কেহই উদাসীন নহে, এই বিষয় লইয়া তাহাদের মধ্যে আকাশ-কুসুম কল্পনার অন্ত নাই। চন্দ্রকান্তর প্রতিবেশীর নাম নিবারণ। নিবারণের কন্যা ইন্দুমতী ও নিবারণের এক পরলোকগত বন্ধুর কন্যা কমলমুখী উভয়েই নিবারণের বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া গানবাজনা শিখিয়াছে। বয়সের দিক দিয়া উভয়েই একটু বাড়িয়াও গিয়াছে, এখনও তাহাদের বিবাহের কিছু হয় নাই। একদিন চন্দ্রকান্তর বাড়ীতে বসিয়া চারি বন্ধু কল্পিত দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নে বিভোর, এমন সময় পাশের বাড়ী হইতে নারীকণ্ঠে অপূর্ব সঙ্গীত শ্রুত হইল। তৎক্ষণাৎ বিনোদবিহারী স্থির করিল, সেই মেয়েটিকেই সে বিবাহ করিবে। বিনোদবিহারী কবি, তাহার প্রকৃতির মধ্যে সংসারের আর দশজনের নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। সে সকলকে লইয়া গিয়া নিবারণের বন্ধুকন্যা কমলমুখীর সঙ্গে নিজের বিবাহ স্থির করিয়া আসিল। ইতি-পূর্বেই চন্দ্রকান্তর অন্যতম বন্ধু নিমাইর পিতা শিবচরণ পুত্রের অজ্ঞাতেই নিবারণের কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে নিমাইর বিবাহ স্থির করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত তাহার বন্ধুদিগকে লইয়া যখন নিবারণের বাড়ীতে গেল,

তখন ইন্দুমতী পাশের ঘর হইতে নিমাইকে দেখিল, দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল; কিন্তু সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না যে, তাহার সঙ্গেই তাহার বিবাহের সম্পর্ক স্থির হইয়াছে। একদিন নিমাই চন্দ্রকান্তর বাড়ীতে ইন্দুমতীকে দৈবাৎ দেখিতে পাইল, দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল; কিন্তু নিমাই জানিল যে, তাহার নাম কাদম্বিনী এবং সে বাগবাজারের চৌধুরী পরিবারের মেয়ে—তাহার সঙ্গেই যে নিমাইর বিবাহ স্থির হইয়াছে, তাহা সেও জানিতে পারিল না। যথাসময়ে বিনোদের সঙ্গে কমলের বিবাহ হইয়া গেল। চন্দ্রকান্তর স্ত্রীর নাম ক্ষান্তমণি। তাহার সঙ্গে ইন্দুমতীর বড় ভাব। ইন্দুমতী ক্ষান্তর নিকট হইতে নিমাইর সন্ধান লইতে লাগিল, কিন্তু ভ্রমক্রমে জানিতে পারিল, তাহার নাম ললিত; নিমাই বলিয়া তাহাকে চিনিল না। নিমাই তাহার পিতার নিকট হইতে শুনিতে পাইল যে, তাহার পিতার বাল্যবন্ধুর কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে; শুনিয়া সে এই বিবাহ সম্বন্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল এবং কাদম্বিনীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বাগবাজার-অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। পিতা তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অগত্যা বাগবাজারের চৌধুরী পরিবারের এক মেয়ের সঙ্গেই তাহার বিবাহ স্থির করিলেন। ক্রমে নিমাইর ভুল ভাঙ্গিয়া গেল; সে বুঝিতে পারিল, নিবারণের কন্যা ইন্দুমতীকেই সে বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী বলিয়া এতকাল ভুল করিয়া আসিয়াছে, সেইজন্য সে পিতার এই প্রস্তাব অস্বীকার করিল এবং পূর্ব প্রস্তাব সম্বন্ধেই সম্মতি দিল। শিবচরণবাবু চৌধুরীদিগকে কথা দিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি এইবার বড়ই বিপন্ন বোধ করিলেন। বাগবাজারের চৌধুরীরা বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, কন্যা রূপের অভাব ধন দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাঁহারা ললিতকে জামাতারূপে লাভ করিলেন। শিবচরণবাবু নিষ্কৃতি পাইলেন। ইন্দুমতীও যথাসময়ে তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল। নিমাইর সঙ্গে তাহার মিলনের পথে আর কোন বাধা রহিল না।

মূল নাট্যকাহিনীর মধ্যে আর একটি উপকাহিনী আছে, তাহা বিনোদ ও কমলমুখীর কাহিনী। মূল কাহিনীর সঙ্গে ইহার যোগ খুব নিবিড় বলিয়া অনুভূত না হইলেও ইহার মধ্যেও হাস্যরসের ধারাটি অব্যাহত রহিয়াছে।

এই নাটকও আদ্যোপান্ত একটি comedy of error বা ভ্রান্তিবিনোদ। ইন্দুমতী নিমাইকে চিনিতে ভুল করিল, নিমাইও ইন্দুমতীকে চিনিতে ভুল করিল, এই দুই জনের ভুল করার উপরই সমগ্র নাট্যকাহিনীর ভিত্তি। এই

অবস্থায় ভুল করার ব্যাপারটা যতখানি সঙ্গত ও স্বাভাবিক করিয়া সৃষ্টি করা যায়, নাট্যকারের উদ্দেশ্যও ততখানি সফল হইতে পারে।

বাংলায় যে শ্রেণীর রচনাকে প্রহসন বলা হয়, তাহার সঙ্গে যে ইংরেজী comedyর পার্থক্য আছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আর্ট হিসাবে বাংলা প্রহসন ইংরেজী comedy হইতে নিম্নস্তরের। প্রহসনের মধ্যে চরিত্রসৃষ্টির দায়িত্ব অপেক্ষা ঘটনা-বিন্যাসের দায়িত্ব বেশী। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ভুলভ্রান্তি, ব্যক্তি-চরিত্রের ছোটবড় দুর্বলতা, এই সবই প্রহসনের ভিত্তি হইয়া থাকে—এই ভুলভ্রান্তি এবং দুর্বলতাগুলি নিতান্ত স্বাভাবিক পরিবেশের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে হয়, কিন্তু তাহা এমন স্তরের হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাহার উপর একটা সমগ্র কাহিনীর ভিত্তি সহজেই স্থাপিত হইতে পারে। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, 'গোড়ায় গলদ'-এর মধ্যে যে ভ্রান্তি উপজীব্য করা হইয়াছে, তাহার উপর একটা পূর্ণাঙ্গ নাট্যকাহিনীর ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে না। নিমাইকে ইন্দুমতীর ললিত বলিয়া ভুল করিবার কারণটি খুব সঙ্গত বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ, ললিতের আচারে ব্যবহারে কিছুতেই মনে হইতে পারে না যে, সে চন্দ্রকান্তর একজন নিত্য সঙ্গী। প্রকৃতপক্ষে নাটকের মধ্যেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের যে কয়টি বন্ধু বিনোদের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া নিবারণের বাড়ী গিয়াছিল, তাহাদের সকলের চেহারা ক্ষান্তমণি চোখে না দেখিলেও, কথাবার্তা কানে শুনিয়াছে। যে ললিত কথায় কথায় এত ইংরেজী বকিয়া থাকে, তাহাকে ক্ষান্তমণির ভুল করিবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। অথচ এই ক্ষান্তমণির ভুলের উপরই ইন্দুমতীর ভুল হইয়াছে। নিমাইর ইন্দুমতীকে বাগবাজারের কাদম্বিনী বলিয়া ভুল করিবার কারণটি ততোধিক অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ বিস্তৃত করিয়া উল্লেখ করিবারও প্রয়োজন নাই। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে চেহারায় চেনে; পরস্পরের সঙ্গে শুধু দেখা সাক্ষাৎই নয়, আলাপ পরিচয় পর্যন্ত আছে, তথাপি নাম সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে যে একটা ভ্রান্ত ধারণা গোড়াতেই জন্মিয়াছে, তাহা নাট্য-কাহিনীর মধ্যে বিশেষ কার্যকরী বলিয়া মনে হয় না। যেখানে সাধারণ একটা ভুলের উপর সমগ্র কাহিনীর ভিত্তিস্থাপন করা হইয়াছে, সেখানে ভুলের কারণটি যদি সুস্পষ্ট ও সুসঙ্গত না হয়, তবে কাহিনীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এখানেও যে কতকটা তাহাই হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কাহিনী হিসাবে 'গোড়ায় গলদে'র অন্যতম গুরুতর ত্রুটি বিনোদ ও কমলমুখীর প্রসঙ্গ। মূলকাহিনীর মধ্যে তাহাদের স্থান যে বিশেষ প্রশস্ত, তাহা বলিতে পারা যায় না। বিনোদ এম. এ. পাশ করিয়া বি. এল্ পড়িতেছে, একটা ঝোঁকের মাথায় বিবাহ করিয়া ফেলিয়া পরে স্ত্রীকে আর পোষাইতে পারিতেছে না বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। তারপর সহসা তাহার স্ত্রী এক বিপুল পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া পড়িয়া এই ঐশ্বর্যদ্বারাই স্বামীকে পুনরায় আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। এই সকল বিষয় কেবল অসম্ভব বলিয়াই অবিশ্বাস্য। একটি দৃশ্যের মধ্যে ইহাদের আচরণ একেবারে অসম্ভাব্যতার চরমে উঠিয়াছে। দৃশ্যটি চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। ঘোম্‌টা পরিয়া কমলমুখী তাহার স্বামী বিনোদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করিল, অথচ বিনোদ তাহাকে চিনিতে পারিল না। ইহা বড়ই বিসদৃশ মনে হয়। ইহা দ্বারা যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, তাহাও বিশেষ উচ্চাঙ্গের বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। নিবারণ কমলমুখীর পরিচয় দিতে গিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কমলমুখীর পিতা বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; সেইজন্য বিবাহে তিনি আশানুরূপ ব্যয় করিতে অক্ষম। নিবারণের সাধুতায় সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না; এই অবস্থায় স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার পরই সহসা কমলমুখীর বিপুল পিতৃ-সম্পত্তি লাভ নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ক্ষীণতম ভ্রান্তির উপর নাটকখানির ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। কেবলমাত্র ভ্রান্তির অকিঞ্চিৎকরত্বই নহে, ইহার অহেতুকত্বও এই নাট্যকাহিনীর অন্যতম গুরুতর ত্রুটি।

পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরেজি comedy ও বাংলা প্রহসন এক বস্তু নহে, ইংরেজি comedy-তে চরিত্রসৃষ্টির যে দাবী আছে, বাংলা প্রহসনে তাহা নাই। তথাপি প্রহসন জাতীয় রচনায় সার্থক ঘটনা-বিন্যাসের সঙ্গে যদি চরিত্রসৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা রচনার উৎকর্ষেরই কারণ হয়। দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন মাত্রেরই ইহা একটি সাধারণ গুণ।

'গোড়ায় গলদে'র মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র শিবচরণের। সে নিমাইর পিতা। তাহার মত ও বিশ্বাসের মধ্যে একটা অনমনীয় দৃঢ়তা আছে, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের উপর তাঁহার অভিভাবকত্বের যে পরিচয়টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও দৃঢ়তাব্যঞ্জক। বিবাহ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বা অবিবাহিতের কোন মত কিংবা কোন ভালমন্দ বিচারশক্তি থাকিতে পারে, তাহা তিনি

বিশ্বাস করেন না; এই বিশ্বাস না করার মধ্যে তাঁহার যে দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পরম কৌতুককর হইয়াছে। তিনি নিজে দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা এ সম্বন্ধে যে সত্য লাভ করিয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ে একমাত্র সত্য। বিবাহ ব্যাপারটা তাঁহার মতে নিতান্তই সামান্য একটা ব্যাপার। ভিতর হইতে পুত্রের প্রতি তাঁহার স্নেহের দুর্বলতা ও বাহির হইতে শাসনের কঠোরতা—এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাঁহার চরিত্রটি সার্থকভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে।

এই নাটকে আর কোন চরিত্র তেমন সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। এই সম্পর্কে নিবারণের চরিত্রটির কথা কাহারও মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা খুব স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, ইহাতে পূর্বাপর সামঞ্জস্যেরও কিছু অভাব আছে। তাঁহাকে প্রথম দেখিয়া সাধু ও বিষয়জ্ঞানশূন্য বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী আচরণে তাঁহার চরিত্রের এই দিকটা রক্ষা পায় নাই। কমলমুখীকে তিনি আজীবন গরীবের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিয়া স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার পরই সহসা সাধুতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি তাহার বিপুল পিতৃসম্পত্তি তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন। যদিও তিনি বলিয়াছেন যে, কমলের পিতা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কুড়ি বৎসর বয়স হইলে তাহার হাতে যেন সম্পত্তির ভার দেওয়া হয়, তথাপি নিতান্ত নিজের প্রয়োজনীয়তার অনুরোধেই যে নাট্যকার এখানে এ'কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই উক্তি দ্বারা নিবারণের চরিত্রের অসামঞ্জস্য যে কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হইয়াছে, তাহাও মনে হইতে পারে না।

স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে ক্ষান্তমণির চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত হইলেও সার্থক। তাহার চরিত্রের মধ্য দিয়া যে একটি নিখুঁত বাস্তব পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ইহার প্রধান গুণ। কিন্তু তাহার চরিত্রের মধ্যে একমাত্র তাহার দাম্পত্য জীবনের অংশটিই উজ্জ্বলতম দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য অংশ নিতান্ত নিষ্প্রভ। তবে তাহা নাটকের মধ্যে বিশেষ সংক্ষিপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'গোড়ায় গলদ' নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন, তখনও স্ত্রীশিক্ষার দিক দিয়া বাংলার সমাজ বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই; স্ত্রীসমাজে উচ্চশিক্ষা তখন পর্যন্ত একেবারেই প্রবেশ করে নাই এবং এ'সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাও থাকিবার কথা নহে।

তাঁহার নিজের পরিবারে যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। এই অবস্থায় তিনি ইন্দুমতী এবং কমলমুখীকে উচ্চশিক্ষিতা বলিয়া কল্পনা করিয়াও, তাহাদের চরিত্র প্রকৃত উচ্চশিক্ষার আদর্শ দ্বারা গঠন করিতে পারেন নাই। প্রকৃত উচ্চশিক্ষিতা নারী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা তখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। ইন্দুমতীর আচরণে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার কোন প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার উচ্চশিক্ষার পরিচয় কেবলমাত্র অপরিচিত পুরুষের সহিত অসংযত প্রগল্‌ভতার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। চাপকান-পরিহিতা ইন্দুমতী প্রথম দর্শনেই অপরিচিত নিমাইর সহিত যে আচরণ করিয়াছে, তাহা কোনমতেই তাহার উচ্চশিক্ষার যোগ্য আচরণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না। অতঃপর নিমাইর কবিতার খাতা লইয়াও ইন্দুমতী নিমাইর সঙ্গে যে আচরণ করিয়াছে, তাহাও তাহার পরিচয়ানুযায়ী হয় নাই। এই হিসাবে কমলমুখীর চরিত্র বরং অনেকটা সংযত ও তাহার পরিচয়ানুযায়ী হইয়াছে; তথাপি তাহার আচরণের মধ্যে কতকগুলি অসম্ভব ঘটনা আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া ইহারও সম্যক্ রসস্ফূর্তি হইতে পারে নাই।

'গোড়ায় গলদে'র এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, ইহার বিশেষ কতকগুলি গুণ সম্পর্কেও উদাসীন থাকা যায় না তাহাদের মধ্যে প্রধান এই যে, ইহাই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র নির্দোষ হাস্যরসাত্মক রচনা—ইহার মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা শ্লেষের কোন পরিচয় নাই, তাঁহার পরবর্তী প্রহসনগুলি এই ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। ইংরেজীতে যাহাকে প্রকৃত humour বলে রবীন্দ্রসাহিত্যে তাহার নিদর্শন সন্ধান করিতে হইলে, এই 'গোড়ায় গলদ' ব্যতীত অন্যত্র তাহা খুব সুলভ হইবে না। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক রচনা ইংরেজী সংজ্ঞায় wit ও satire-এরই অন্তর্ভুক্ত, humour-এর অন্তর্ভুক্ত নহে—'গোড়ায় গলদ'ই রবীন্দ্রসাহিত্যে নির্দোষ হাস্যরসাত্মক বা humour জাতীয় রচনার একটি দুর্লভ নিদর্শন। যদিও ইহার সংলাপের মধ্যে অনেক স্থলেই চরিত্রসমূহের অপরিসীম উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি এ'কথা সত্য যে, এইগুণ ইহা তাহার পরবর্তী প্রহসন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং 'চিরকুমার সভা'র মত এতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই; বাগবৈদগ্ধ্য ইহার মধ্যে থাকিলেও, তাহা তখনও humour-এর পর্যায় ছাড়াইয়া 'wit'-এর পর্যায়ে উঠিতে পারে নাই; ইহার সংলাপের মধ্যে প্রধানত প্রত্যক্ষোক্তিরই

(directness of expression) পরিচয় পাওয়া যায়; বিশেষতঃ একমাত্র সংলাপের মধ্যেই নাটকের সকল রস সংহত হইয়া নাই, ঘটনারাশির মধ্যেই তাহা প্রধানত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। ইহা বিবেচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের অন্ততঃ এই রচনাটিকে তাঁহার পরবর্তী হাস্যরসাত্মক রচনার সমধর্মী বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। শাণিত ক্ষুরধারের মত বুদ্ধিদীপ্ত রসচৈতন্যের তখনও তাঁহার উদ্ভব হয় নাই, সেইজন্যই ইহা 'হিউমারে'র পর্যায়ে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের মনে তখনও সমাজ ও ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শবোধ গড়িয়া উঠে নাই বলিয়াই ইহার পরিকল্পনাটি তখনও তিনি তাঁহার ব্যক্তিচৈতন্যের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন, সেইজন্যই ইহা ব্যঙ্গাত্মক হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সেই যুগে প্রবেশ করিতে রবীন্দ্রনাথের আর অধিক বিলম্বও ছিল না।

'গোড়ায় গলদে'র যে-সকল ত্রুটির কথা উল্লেখ করা গেল, তাহাদের কতক সংশোধন করিয়া ছত্রিশ বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ ইহার একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহার নাম দেওয়া হয় 'শেষ রক্ষা'। 'গোড়ায় গলদে'র গোড়াকার ভুলের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ 'শেষ রক্ষা'য় নাট্যকাহিনীর সর্বশেষ পরিণতির উপর জোর দিয়াছেন। 'গোড়ায় গলদে'র নিমাইয়ের নামটি পরিবর্তিত করিয়া 'শেষ রক্ষা'য় গদাই রাখা হইয়াছে। ভূমিকা-লিপির দিক হইতে আর বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। 'শেষ রক্ষা' 'গোড়ায় গলদ' হইতে অধিকতর অভিনয়-সাফল্য লাভ করিয়াছে। কারণ, ইহাতে ঘটনাবিন্যাস অধিকতর সংহত, সংলাপ সংক্ষিপ্ত ও অধিকতর প্রত্যক্ষগণ-সম্পন্ন করা হইয়াছে। কিন্তু ঘটনা-বিন্যাসের দিক দিয়া ইহার উন্নতি সাধিত হইলেও চরিত্র-পরিকল্পনায় মৌলিক ত্রুটিগুলির ইহাতে কোন সংশোধন করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না।

'বৈকুণ্ঠের খাতা'

'গোড়ায় গলদে'র পরই রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রকাশিত হয়। ইহা রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলীতে 'প্রহসন' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু 'বৈকুণ্ঠের খাতা' 'গোড়ায় গলদে'র মত অবিমিশ্র প্রহসন নহে, ইহার মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে একটি প্রচ্ছন্ন করুণ রসের আবেদন আছে, তাহা এই ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্যখানিকে এক অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। 'গোড়ায় গলদ' এবং 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র মধ্যে বাহিরের দিক হইতে কতকটা ঐক্য অনুভব করা গেলেও, ইহাদের অন্তর্মুখী পরিচয়ের সুদূর পার্থক্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আলোচনার সুবিধার জন্য ইহাদিগকে এক অধ্যায়ভুক্ত করা হইলেও, বিস্তৃত বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাদের পার্থক্য অনুভব করা যাইতে পারে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র কাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

বৈকুণ্ঠ বিষয়বুদ্ধিহীন লোক, জীবনে তাঁহার একমাত্র নেশা লেখা, ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি একখানি বই লিখিতেছেন এবং তাহা লইয়াই দিবারাত্র মত্ত হইয়া আছেন। বিপত্নীক জীবনে তাঁহার বিধবা কন্যা নীরু বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সেবাযত্নের ভার লইয়াছে। ভাই অবিনাশও দাদাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকে। অবিনাশের বয়স হইয়াছে, সংসার-বুদ্ধিহীন বৈকুণ্ঠ এখনও তাহার বিবাহ দেন নাই। সে চাকুরি করিয়া অর্থও যথেষ্ট উপার্জন করে। তাহারও একটি নেশা আছে—তাহা গাছের নেশা; রাজ্যের যত উড়ে মালী লইয়া বাগানে নানা জাতীয় গাছপালা লাগাইয়া সে অবসর সময় কাটায়। তাহাদের পুরাতন ভৃত্য ঈশানই প্রকৃতপক্ষে এই সংসারটির অভিভাবক। কেদার এক অতি ধূর্ত লোক। সে এক বিবাহ-যোগ্যা শ্যালিকা লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। অবিনাশের হাতে তাহাকে কোন রকমে সমর্পণ করিবার আশায়, সে বৈকুণ্ঠের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল এবং বৈকুণ্ঠের দুর্বলতাটুকুর সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। সে বৈকুণ্ঠের লেখার প্রশংসা করে, বৈকুণ্ঠও ইহাতে উৎসাহিত হইয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। কেদারের অভিসন্ধি সফল হইল, অবিনাশকে বৈকুণ্ঠ কেদারের শ্যালিকাকে বিবাহ করিতে বলিলেন; অবিনাশ কেদারের শ্যালিকাকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য নিজেও ব্যগ্র হইয়া পড়িল। বিবাহের

অধিক বিলম্ব হইল না। বিবাহের পর কেদার ও তাহার দূর সম্পর্কীয় যত দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন ছিল, তাহারা সদলে নূতন আত্মীয়তার সূত্র ধরিয়া বৈকুণ্ঠের বাড়ীতে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের উৎপীড়ন আরম্ভ হইল, কেদারের এক পিসী বৈকুণ্ঠের বিধবা কন্যাকে অপমানিত করিল, অন্য একজন আত্মীয় বিপিন বৈকুণ্ঠকে তাঁহার এতকালের ব্যবহৃত লেখার ঘরটি ছাড়িয়া যাইবার জন্য উপদ্রব আরম্ভ করিল। অবিনাশ কিছু মনে করিতে পারে ভাবিয়া বৈকুণ্ঠও মুখ ফুটিয়া তাহাদিগকে কিছু বলিলেন না, বরং নিজেই তাঁহার গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। ইহাদের উপদ্রব যখন একেবারে চরমে পৌঁছিল, তখন একদিন অবিনাশ নিজেই তাহাদের সকলকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। কেদারকেও বাড়ীর বাহির হইয়া যাইতে হইল। বৈকুণ্ঠ নিজের ঘরটি ফিরিয়া পাইলেন।

'বৈকুণ্ঠের খাতা'র কাহিনীটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজ পারিবারিক জীবনের কিছু ছায়াপাত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠের চরিত্রটি বিশেষভাবেই তাঁহার কোন নিকট আত্মীয়কে সম্মুখে রাখিয়া রচিত, এতদ্ব্যতীতও কাহিনীর সমগ্র পরিবেশটির মধ্যেও তাঁহার নিজ পারিবারিক জীবনের চালচলন এবং সামাজিকতাই উপজীব্য করা হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহার পূর্ববর্তী রচনা 'গোড়ায় গলদে'র তুলনায় ইহার বাস্তবগুণ অধিকতর প্রত্যক্ষ, রচনার দিক দিয়াও সেইজন্য ইহা অধিকতর শক্তিশালী।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত স্বল্পায়তন (মাত্র তিন দৃশ্যে সমাপ্ত) ক্ষুদ্র নাটক হইলেও, ইহার শিল্পগুণ রবীন্দ্রনাথের যে কোন হাস্যরসাত্মক নাট্য-রচনা অপেক্ষা অধিক। ঘটনা-বিন্যাস ব্যতীতও ইহার মধ্যে চরিত্র-সৃষ্টির যে কৃতিত্ব দেখা যায়, তাহা রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর আর কোন নাটকের মধ্যে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে চরিত্রগুলি সর্বত্রই অভিনব বৈশিষ্ট্য লইয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। ইহার বহিরঙ্গগত হাস্যচটুল রসাভিব্যক্তি ইহার অন্তর্মুখী ভাবঘন পরিচয়টির সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ইহার উপর সৌন্দর্য ও সংযমের একটি অপূর্ব রূপরেখা টানিয়াছে। ইহা কেবলমাত্র রসোচ্ছল যেমন নহে, তেমনই আবার কেবলমাত্র অন্তর্মুখী ভাবাশ্রয়ীও নহে—উভয়ের মিলনে ইহা যথার্থ সার্থক। এই হিসাবেই ইহাকে অবিমিশ্র হাস্যরসাত্মক প্রহসনের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না।

ইংরেজি ফার্স (farce) কথাটিকেই সাধারণতঃ বাংলায় প্রহসন বলিয়া

গ্রহণ করা হয়। ইংরেজি ‘কমেডি’ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা স্বতন্ত্র শ্রেণীর রচনা। তবে ফার্সকে low comedy অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর কমেডি বলা যায়। ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’ ফার্স অর্থাৎ প্রহসন নহে, স্বল্প পরিসরের মধ্যে রচিত হইলেও ইহাকে ‘কমেডি’ শ্রেণীর রচনা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ফার্স বা প্রহসনের মধ্যে অঙ্গভঙ্গি সহকারে ভাঁড়ামি সৃষ্টি করা হয়, ইহা অতিরঞ্জিত চিত্র ও চরিত্র দ্বারা ভারাক্রান্ত, ইহার চরিত্রগুলি type বা ছাঁচ মাত্র। কিন্তু ‘কমেডি’তে হাস্যরস জীবনের গভীরতম স্তর হইতে উৎসারিত হয়, ইহার মধ্যে চরিত্রগুলি ক্রমবিকাশ লাভ করে ও চিত্র এবং চরিত্রের বাস্তব গুণ কদাচ ক্ষুণ্ণ হয় না। তবে কাহিনীর উপরিস্তরে ইহাতে হাস্যরস (humour) প্রাধান্য লাভ করে। ফার্স বা প্রহসনের আবেদন ক্ষণিক; কিন্তু ‘কমেডি’র আবেদন দীর্ঘস্থায়ী। ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’ কমেডি শ্রেণীর রচনা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কাহিনীর উপরিস্তরে ইহার যে হাস্যরস সৃষ্টির দাবী আছে, ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’র সর্বত্র সে দাবী পূর্ণ করা হয় নাই। কোন কোন সময় কাহিনী অত্যন্ত করুণ হইয়া উঠিয়াছে। এই কারুণ্য কখনও কাহিনীর ধারায় স্বাভাবিক, কখনও বা অস্বাভাবিক হইয়াছে। কোন ভুল বুঝার অবসান কিংবা কাহারও হাস্যকর আচরণের সংশোধনের ভিতর দিয়াও কমেডির কাহিনী সমাপ্তি লাভ করে। কিন্তু বৃহত্তর কোন জীবন-সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়া কমেডির কাহিনীর উপসংহার হয় না, তাহা নাটকের গুণ। বৈকুণ্ঠের খাতায় এই গুণ সামান্য হইলেও আছে।

বৈকুণ্ঠের চরিত্র এই নাটকের এক অনবদ্য সৃষ্টি। অবশ্য পূর্বেই বলিয়াছি, এই চরিত্র-পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষদৃষ্ট অভিজ্ঞতা বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল; তথাপি ইহার মধ্যে নাট্যকারের সৃজনী-প্রতিভার স্পর্শও অনুভব করা যায়। বৈকুণ্ঠ বিষয়-নিস্পৃহ সংসার-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি সর্বদা নিজের খেয়াল লইয়াই মত্ত আছেন; কিন্তু তাঁহার একটি দুর্বলতা এই যে, তিনি নিজের লেখা একজনকে শুনাইতে ভালবাসেন। তাহার লেখার পাঠক, কিংবা শ্রোতা বড় জোটে না, কেবলমাত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কেদার আসিয়া জুটিয়াছে; তিনি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহার খেয়াল চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হইলেন। বৈকুণ্ঠ নিরীহ প্রকৃতির লোক, সংসারের লোক তিনি চেনেন না। নিজের খেয়াল সম্পর্কে দুর্বলতা থাকিলেও তিনি নিতান্তই যে অচেতন, তাহাও নহে। এইখানেই বৈকুণ্ঠের চরিত্রের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। কেদার যখন বৈকুণ্ঠের লেখার কপট প্রশংসা জানাইয়া বলিল,—

'লেখা যা হয়েছে সে পড়্‌তে পড়তে ওর নাম কী—শরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠে।'

ইহা যে উপহাস মাত্র বৈকুণ্ঠের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না, তখনই অভিমানাহত হইয়া তিনি বলিলেন, 'হা হা হা হা! রোমাঞ্চ! আপনি ঠাট্টা করছেন।.. ঠাট্টার বিষয় বটে, ও' আমার পাগ্‌লামি। হা হা হা হা! সঙ্গীতের উৎপত্তি ও ইতিহাস—মাথা আর মুণ্ডু। দিন খাতাটা। বুড়ো মানুষকে পরিহাস কর্‌বেন না, কেদারবাবু।'

খেয়ালী বৃদ্ধের এই নিদারুণ অভিমানাহত কণ্ঠস্বর যেন চকিতে দর্শকের হৃদয় গভীর ভাবে স্পর্শ করিয়া যায়। কিন্তু কেদারের ধূর্ততার নিকট বৈকুণ্ঠের মত ব্যক্তির পরাজয় অতি সহজ। আবার সে বৈকুণ্ঠের মন ভুলাইয়া লইয়া তাঁহার আত্মসচেতনতাকে কিছুক্ষণের জন্য বিলুপ্ত করিয়া দিল।

বৈকুণ্ঠ খেয়ালী হইলেও সম্পূর্ণ যে আত্মনির্লিপ্ত, তাহা বলিতে পারা যায় না। সেইজন্যই বৈকুণ্ঠ প্রহসন বা ফার্সের চরিত্র হইতে পারে না।

আত্মস্থ হইয়া মধ্যে মধ্যে যখন তিনি ভাবিতে বসেন, তখন সবই স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। তবে সংসারের কঠিন হৃদয়হীনতা প্রত্যক্ষভাবে তিনি সহ্য করিতে পারেন না। অপ্রিয়-সত্যবাদী ভৃত্য ঈশানকে তিনি বলিতেছেন, 'দেখ্‌ ঈশেন, তোর কথাগুলো বড় অসহ্য। তুই একটা কথা বানিয়েও বলতে পারিস্‌ নে?'

বৈকুণ্ঠ তাঁহার আচরণের ভিতর দিয় পাঠকের নিকট হইতে আন্তরিক সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শেষ দৃশ্যে যখন অবিনাশের আত্মীয়বর্গ কর্তৃক তাঁহাকে নানাভাবে লাঞ্ছিত হইতে দেখা যায়, তখন এই অসহায় বৃদ্ধের প্রতি দর্শকের মমতাবোধ দুর্নিবার হইয়া উঠে। বৈকুণ্ঠের প্রতি দর্শকের এই সহানুভূতি হইতেই শেষ দৃশ্যে তাঁহার উপর অন্যায় অবিচারকারী কেদার, বিপিন ও নেপথ্যবাসিনী কেদারের পিসির উপব বিরক্তি জন্মিয়া থাকে। শেষ দৃশ্যে অসহায় বৃদ্ধের এই চিত্রটি কি করুণ।

'বৈকুণ্ঠ। আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। এখানে জায়গাতেও আর কুলোচ্ছে না—এঁদের সকলেরই অসুবিধে হচ্ছে দেখ্‌তে পাচ্ছি—তা ছাড়া অবিনাশের এখন ঘর-সংসার হল—তার টাকাকড়ির দরকার, তার উপরে ভার চাপাতে আমার আর ইচ্ছে নেই—আমি এখান থেকে যেতে চাই।

ঈশান। সে তো মন্দ কথা নয়, কিন্তু!

বৈকুণ্ঠ। ওর আর কিন্তু-টিন্তু নেই, ঈশেন। সময় উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হতে হয়।

ঈশান। তোমার লেখাপড়ার কি হবে?

বৈকুণ্ঠ। (হাসিয়া) আমার লেখা! সে আবার একটা জিনিষ! সবাই হাসে, আমি কি তা জানি নে ঈশেন! 'ওসব রইল পড়ে। সংসারে লেখায় কারও কোনও দরকার নেই—' (৩য় দৃশ্য)

বৈকুণ্ঠের মধ্যে দুইটি পরিচয় আছে—একটি তাঁহার আত্মভোলা স্বরূপ, আর একটি আত্মসচেতন স্বরূপ। বার্ধক্যের অলস খেয়ালের মধ্য দিয়া তাঁহার আত্মভোলা স্বরূপ যখন জাগিয়া থাকে, তখন তাঁহার আত্মসচেতনতা লুপ্ত হইয়া যায়; আবার কঠিন সংসারের নির্মম আঘাতে যখন তাঁহার আত্মসচেতনতা ফিরিয়া আসে, তখন তাঁহাকে আর কেহ বিষয়-বুদ্ধিহীনতার জন্য ধিক্কার দিতে পারে না। তাঁহার উপরি-উদ্ধৃত শেষ কথাটি স্মরণ করিলেই এ কথা বুঝিতে পারা যাইবে,—'আমার লেখা, সে আবার একটা জিনিস! সবাই হাসে, আমি কি তা জানিনে, ঈশেন?' স্বপ্ন ও সত্যের মিশ্র উপাদানে গঠিত বৈকুণ্ঠের এই চরিত্রটি রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি সার্থক সৃষ্টি।

বৈকুণ্ঠের পরই বৈকুণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশের চরিত্রটির উল্লেখ করিতে হয়। অবিনাশ বৈকুণ্ঠের সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী চরিত্র। বৈকুণ্ঠ কথাগুলিকে বিস্তৃত করিয়া বলিতেই ভালবাসিতেন, কোন কিছুই গোপন করিতে চাহিতেন না; সেইজন্য তাঁহার রচিত গ্রন্থের এক অস্বাভাবিক সুদীর্ঘ নামকরণ করিয়াছিলেন, এমন কি, তাহাতেও যেন তাহার তৃপ্তি হয় নাই, ইহাকে আরও দীর্ঘ করিতে পারিলে খুশী হইতেন; কিন্তু অবিনাশ মনোরমার নিকট আংটির সঙ্গে একটি চিঠি লিখিতে প্রত্যেকটি কথা লইয়া বার বার ভাবিয়াছে, ইহাকে সংক্ষিপ্ততম রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ দুই ভ্রাতার আচরণের মধ্য দিয়া এই ভাবে বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়া কাহিনীর নাট্যিক গুণ বৃদ্ধি করিবার সার্থক প্রয়াস পাইয়াছেন।

মনোরমাকে প্রথম দেখিবার পর হইতে অবিনাশের আচরণ যে সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল, এমন কি, তাহার আজন্ম পালিত গাছের নেশা পর্যন্ত দূর হইয়া গেল, তাহার মধ্য দিয়া তাহার চরিত্রটি স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত বাস্তবধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পরিবর্তিত মানসিক অবস্থার ভিতর দিয়াও দাদার প্রতি তাহার শ্রদ্ধাবোধ অবিচল রহিয়াছে, তাহা বিন্দুমাত্র শিথিল হইতে

পারে নাই। দাদার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির গুরুত্বটুকু সর্বদাই সে রক্ষা করিয়া কাহিনীর পরিণতিকে সুখকর করিয়াছে। ইহা নাটকের চরিত্র, প্রহসন বা ফার্স, এমন কি, কমেডির চরিত্র বলিয়াও মনে হইতে পারে না।

চরিত্র হিসাবে অবিনাশের পরই নাম করিতে হয় তিনকড়ির। তিনকড়ি কেদারের সহচর; কিন্তু কেদারের সহধর্মী নহে। কেদার ধূর্ত, কিন্তু তাহার ধূর্ততার উপর একটা আবরণ আছে, তিনকড়ির তাহা নাই। সে যাহা চায়, তাহা সহজ ভাবেই লোকের নিকট হইতে হাত পাতিয়া চাহিয়া লয়। তাহার প্রবৃত্তি ও শিক্ষা কেদার হইতে স্বতন্ত্র, অথচ কি ভাবে যে ইহারা একত্র দুইজন মিলিত হইয়াছে, তাহা নাটকের মধ্যে খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। অবিনাশের চরিত্রটিও সুচিত্রিত হইয়াছে। নাট্যকাহিনীটি শেষ পর্যন্ত ট্রাজিডির পথ হইতে তাহারই গুণে রক্ষা পাইয়াছে। চরিত্রটির আনুপূর্বিক কোথাও অসঙ্গতি নাই।

এই নাটকের মধ্য কোনও স্ত্রীচরিত্র নাই, কিন্তু একটি নেপথ্যচারিণী নারী এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়াও যেন দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে সর্বদা আবির্ভূত রহিয়াছে—তাহা বৈকুণ্ঠের বিধবা কন্যা নীরুর চরিত্র। এই কুণ্ঠিতা বাল-বিধবা দৃশ্যপটের অন্তরালে থাকিয়াই বরং তাহার উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ করিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র হাস্যরসাত্মক পরিবেশটি এই ভাগ্যহীনা নারীর প্রচ্ছন্ন মর্মবেদনা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কি না, তাহাও বিবেচনার বিষয়। একদিন বৈকুণ্ঠ তাঁহার লেখার মত্ততায় যখন কেদার ও তিনকড়ির মধ্যাহ্ন-ভোজনের সদ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য ভৃত্য ঈশানকে আদেশ করিলেন, তখন ঈশান বলিল,—'তা জানি, তাঁকে বল্‌লেই তিনি ছুটে যাবেন—কিন্তু আজ সমস্ত দিন একাদশী ক'রে আছেন। বাবু, আজকের মতো তোমরা ঘরে গিয়ে খাও গে।' এই কথাটির ভিতর দিয়া দৃশ্যপটের অন্তরালচারিণী এই নারীর যে মর্মান্তিক দৈনন্দিন জীবন-চিত্রের আভাস পাওয়া গেল, তাহা অলক্ষিতে দর্শককে আঘাত না করিয়া পারে না। আবার একদিন ঈশান আসিয়া যখন বৈকুণ্ঠকে জানাইল, 'আমাদের ছোটো মার মাসি না পিসি না কে এক বুড়ি এসে দিদি ঠাকরুণকে যে দুঃখ দিচ্ছে, সেতো আমার সহ্য হয় না।' তখন দর্শক ও পাঠকের নিকটও তাহা দুঃসহ হইয়া উঠে। কেবলমাত্র দুঃখভোগ করিবার জন্যই এই বাল-বিধবা নাটকের নেপথ্যে সঞ্চরণ করিয়াছে। তাহার বিষণ্ণ মূর্তিটি চোখে না

দেখিয়াও দর্শক তাহার বেদনাটুকুর আঘাত সহ্য করিয়াছে। নাট্য-কাহিনীর জন্য ইহার যে যথার্থ কারণ ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই হাস্যরসাত্মক নাটকের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে নাট্যকার এই বাল-বিধবার করুণ জীবন-চিত্র আনিয়া সংযুক্ত না করিলেই ভাল করিতেন; নাটকের প্রচ্ছন্ন করুণ রসের প্রবাহ এই নেপথ্যচারিণী নারীর অদৃশ্য মর্মবেদনায় ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আছে।

'চিরকুমার সভা'

রবীন্দ্রনাথ ১৩০৭ সালের গোড়ার দিকে যখন শিলাইদহে বাস করিতে-ছিলেন, তখন 'ভারতী' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদিকা স্বর্গতা সরলা দেবী তাঁহাকে একটি 'কৌতুকময় সামাজিক প্রহসন' লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কাব্য-জীবনে তখন তাঁহার 'ক্ষণিকা'র যুগ। তিনি প্রধানত 'ক্ষণিকা'র কাব্য-মনোভাবের পটভূমিকার উপর 'চিরকুমার সভা'র ভিত্তি স্থাপন করেন। 'ক্ষণিকা'র একটি কবিতায় তিনি ইতিপূর্বেই লিখিয়াছিলেন,

> আমি হবো না তাপস, হবো না হবো না
> যেমনি বলুন যিনি,
> আমি হবো না তাপস নিশ্চয় যদি
> না মেলে তপস্বিনী।

একটি পরম কৌতুককর পরিবেশের মধ্য দিয়া প্রধানত এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া তিনি 'চিরকুমার সভা' নামক রঙ্গোপন্যাস রচনা করিয়া 'ভারতী'তে প্রকাশ করেন। ইহা যখন পুনরায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন ইহার নামকরণ করা হয় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ।' অতঃপর রবীন্দ্রনাথ ইহা নাট্যাকারে পবিবর্তিত করেন। তখন পুনরায় ইহার নামকরণ করা হয় 'চিরকুমার সভা'। ইহার এই নাট্যরূপই জনসাধারণের নিকট অধিকতর পরিচিত। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ—

অক্ষয়কুমারের দুইটি অবিবাহিতা শ্যালিকার নাম নৃপবালা ও নীরবালা। 'নৃপ শান্ত স্নিগ্ধ, নীর তাহার বিপরীত, কৌতুকে এবং চাঞ্চল্যে সে সর্বদাই আন্দোলিত।' অক্ষয়ের আর একটি বিধবা শ্যালিকা আছে, নাম শৈল। অক্ষয়ের স্ত্রীর নাম পুরবালা, পুরবালা ভগিনীদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা। পিতৃ ও ভ্রাতৃহীনা বালিকাদিগের জামাতা অক্ষয়ই একমাত্র অভিভাবক। নৃপ ও নীরর বিবাহের বয়স হইয়াছে, কিন্তু পাত্র জুটিতেছে না, জননী জগত্তারিণী সে জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। চিরকুমার সভা আজীবন কৌমার্য-ব্রতধারীদিগের একটি প্রতিষ্ঠান—চিরকৌমার্য ও সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে সমাজ ও দেশের সেবা করা ইহার সভ্যদিগের উদ্দেশ্য। অধ্যাপক চন্দ্রমাধববাবু চিরকুমার সভার সভাপতি—শ্রীশ, বিপিন ও পূর্ণ ইহার সভ্য।

চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে সভার অধিবেশন বসিয়া থাকে। অক্ষয়ের চেষ্টায় চিরকুমার সভার অধিবেশনের স্থান চন্দ্রমাধববাবুর বাড়ী হইতে অক্ষয়ের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়া আসিল ; বিধবা শৈল পুরুষের বেশে অবলাকান্ত এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া সভার সভ্য হইল, এক অবিবাহিত বৃদ্ধ রসিকও সভার সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হইল। পূর্ণর চিরকুমার সভার সভ্য হইবার একটু ইতিহাস ছিল— সে চন্দ্রবাবুর ছাত্র, চন্দ্রবাবুর এক বিবাহ-যোগ্যা ভাগিনেয়ী ছিল, নাম নির্মলা। একদিন চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে নির্মলাকে দেখিয়া পূর্ণর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিল, সেই হইতেই সে সভার সভ্য হইল। সভা অক্ষয়ের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হওয়াতে তাহার আপত্তি ছিল। নির্মলাও সভার সভ্যা হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। চন্দ্রবাবু সভার সম্মতি গ্রহণ করিয়া সভায় স্ত্রীসভ্যও গ্রহণ করা স্থির করিলেন এবং নির্মলাকে সভ্য করিয়া লইলেন। নির্মলা প্রকাশ্য সভায় যোগদান করিতে লাগিল।

অক্ষয়ের গৃহে চকিতে একদিন নৃপকে দেখিয়া শ্রীশ এবং নীরকে দেখিয়া বিপিন মুগ্ধ হইয়া গেল। নৃপ একটি রুমাল অক্ষয়ের বৈঠকখানায় ফেলিয়া গেল, শ্রীশ তাহা কুড়াইয়া পাইল, বিপিনও একদিন অক্ষয়ের গৃহে নীরর একখানি গানের খাতা খুঁজিয়া পাইল। দুইজনেই ইহা লইয়া মাতিয়া উঠিল। শৈল ও রসিক তাহাতে ইন্ধন জোগাইতে লাগিল। একদিন পূর্ণ চন্দ্রবাবুর কাছে নির্মলাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। চন্দ্রবাবু মহাবিব্রত হইয়া পড়িলেন, চিরকুমার সভায় যাতায়াতের ফলে নির্মলার অবলাকান্তবাবুর প্রতি একটু আকর্ষণ জন্মিয়াছিল, তবে পূর্ণর জন্য তাহার যে কোনও আকর্ষণ ছিল না, তাহা নহে। চন্দ্রবাবু চিরকুমার সভায় সভ্যদিগের কৌমার্যব্রত গ্রহণ করিবার বাধ্যবাধকতা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতে চাহিলেন, সভ্যগণ সাগ্রহে তাহাতে সম্মতি দিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় শৈল পুরুষের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ বেশ ধারণ করিল। নির্মলার সহিত পূর্ণর নৃপর সহিত শ্রীশের এবং নীরর সহীত বিপিনের বিবাহ হইবার আর কোনও বাধা রহিল না।

প্রায় সমসাময়িক কালে প্রবর্তিত স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শকে ব্যঙ্গ করাই মুখ্যতঃ এই নাট্যকাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া, এই নাটকের অনেক সমালোচকই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। এ কথা সত্য যে, ব্যক্তিজীবনে সন্ন্যাসধর্ম পালনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কোন

শ্রদ্ধা না থাকিলেও, স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের জীবন ও সমাজ-সেবার আদর্শের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাহীন ছিলেন না। বিবেকানন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা-বোধ অন্যত্রও প্রকাশ পাইয়াছে। 'চিরকুমার সভা'য় যে জীবনকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, তাহা নিষ্ঠাবান্ প্রকৃত সন্ন্যাসীর জীবন নহে, বরং তাহার বিপরীত। শক্তিহীনের মূঢ়তাই এখানে ব্যঙ্গের বিষয়, প্রকৃত শক্তিমানের আদর্শ-সেবা এখানে ব্যঙ্গের লক্ষ্য নহে। চিরকুমার সভার সভ্যদিগের কৌমার্য ও সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের যে প্রকৃত সামর্থ্য নাই, তাহা তাহাদিগের চরিত্রের একেবারে প্রথম হইতেই নির্দেশ পাওয়া যায়। পূর্ণ, শ্রীশ, বিপিন ইহারা কেহই সন্ন্যাসী নহে, সন্ন্যাসী হইবার শক্তিও নাই,—ডন্ কুইক্‌সটের বীরত্ব অর্থাৎ শক্তিহীনের ব্যর্থ আস্ফালনই এই নাটকে ব্যঙ্গের বিষয় এবং ইহা দ্বারাই ইহাতে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা উচ্চাঙ্গ হাস্যরসেরই বিষয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 'চিরকুমার সভা'র একজন সমালোচক এই কথাটাকেই ভুল করিয়াছেন,—তিনি লিখিয়াছেন, 'যে-চিরকুমারদের ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য রমণীর দরকার হয় না, শুধু গানের খাতা বা রুমাল হইলেই চলে, তাহাদের পরাজয়ে যে হাস্যরসের সঞ্চার হয়, উহা উচ্চাঙ্গের নহে।' এই সমালোচকের মতে মনে হয়, নিষ্ঠাবান্ সন্ন্যাসীর ব্রতভঙ্গে উচ্চাঙ্গে হাস্যরসের সৃষ্টি হইত, ইহাদের নিষ্ঠাও যেমন কম, সেই পরিমাণে ইহাদিগের দ্বারা হাস্যরসেরও সৃষ্টি যাহা হইয়াছে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু একথা সত্য নহে, প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ সন্ন্যাসীর ব্রতভঙ্গের বিষয় হাস্যরসের বিষয় নহে। এ কথা কেহই স্বীকার করিবেন না যে, 'চিত্রাঙ্গদা'য় অর্জুনের ব্রতভঙ্গে খুব উচ্চাঙ্গের হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার মধ্যে বরং জীবন-দর্শনের একটা গভীরতর ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। ব্যক্তিচরিত্রের মানবিক দুর্বলতাই প্রকৃত উচ্চাঙ্গ হাস্যরসের উপজীব্য। চরিত্রের মধ্যে কোন উচ্চাদর্শ পালনের অনমনীয় দৃঢ়তা-গুণ থাকিলে তাহা দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি সম্ভব নহে; এইজন্যই চিরকুমার সভার সভ্যদিগের মধ্যে যে মানবিক দৌর্বল্যগুলির সন্ধান করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেই নাটকের প্রকৃত হাস্যরসের সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করাই যদি রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি বিবেকানন্দের সম্প্রদায়ভুক্ত প্রকৃত সন্ন্যাসীর মধ্য হইতেই এই নাটকের নায়ক সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু চিরকুমার সভার সভ্যগণ সাধারণ মানুষ হইতে স্বতন্ত্র নহে—তাহারা কেহ গৃহও ত্যাগ করে নাই, সন্ন্যাসও গ্রহণ করে নাই, সমাজ

সেবার ক্ষেত্রে কেহ পদার্পণও করে নাই, নূতন সমাজ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আত্মত্যাগ ও স্বার্থবিসর্জনের কথা মুখে বলিয়া থাকে সত্য, কিন্তু কেহই তাহা কর্মের ভিতর দিয়া গ্রহণ করে নাই। সেইজন্য ইহাদের কাহিনী পড়িতে বসিয়া বিবেকানন্দের স্বার্থত্যাগী শিষ্য-সম্প্রদায়ের কথা মনেই হইতে পারে না। অতএব 'চিরকুমার সভা'র ভিত্তিভূমিতে যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের সুমহান্ আদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অশ্রদ্ধার সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুবিচার করেন নাই।

'চিরকুমার সভা'য় হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে প্রধানতঃ ইহার অপূর্ব বাগ্‌বৈদগ্ধ্য দ্বারা, ঘটনা-সংস্থাপনা দ্বারা নহে। ঘটনা-সংস্থাপনা বিষয়ে ইহার পূর্ববর্তী প্রহসনগুলির যে গুণ ছিল, ইহার তাহাও নাই। কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত সমৃদ্ধ সংলাপের গুণে ইহার সেই অভাব অনেকটা পূর্ণ হইয়াছে। তথাপি এ কথা সত্য যে, নাটকের মধ্যে কাহিনীর ক্রিয়া (effect) কাহিনীই সৃষ্টি করিতে পারে, সংলাপের ক্রিয়া সংলাপ দ্বারাই সৃষ্ট হয়—একের দৈন্য অন্যের দ্বারা কিছুতেই ঘুচে না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, 'চিরকুমার সভা'র সংলাপ যতই রস-সমৃদ্ধ হউক না কেন, একটি কেন্দ্রগত সক্রিয় কাহিনীর অভাবে এই সংলাপ যেন অনেকটা নিরবলম্ব ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে—ইহার আভ্যন্তরিক শক্তি তেমন অনুভূত হয় না। ইহার সংলাপের সৌন্দর্য যেন মুহূর্তোদ্ভাসিত ক্ষীণায়ু বিদ্যুদ্দীপ্তির মত, কিংবা বুদ্বুদগাত্রে প্রতিভাত সূর্যরশ্মির মত—মুহূর্তে মুহূর্তেই মিলাইয়া যায়। ইহার আকস্মিক দীপ্তিতে চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যায়, কিন্তু পর মুহূর্তেই ইহার আর কোন ক্রিয়া অনুভূত হয় না।

এই নাটকের মধ্যে চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রে একটু বৈশিষ্ট্য আছে, চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়া ইহা কতকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। 'গোড়ায় গলদে'র অনতিপরিস্ফুট নিবারণ, 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠ 'চিরকুমার সভা'র চন্দ্রমাধববাবুর রূপ লাভ করিয়াছে। এই চরিত্রটির পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে বর্ণিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা চন্দ্রবাবুর চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুকূল। মনে হয়, তাঁহাকেই সম্মুখে রাখিয়া এই চরিত্রটি চিত্রিত হইয়াছে। তাহা ছাড়াও দেশের সেবা সম্বন্ধে চন্দ্রবাবুর মুখে যে সকল কথা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই

রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা। চিরকুমার সভায় কৌমার্য-ব্রতধারী সভ্যদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে চন্দ্রবাবু যে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ কথাই রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা বলিয়াই সমসাময়িক কালে রচিত কতকগুলি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। চন্দ্রবাবুর বক্তৃতার সঙ্গে ১ ১২ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' নামক প্রবন্ধ তুলনা করিয়া পাঠ করিলেই এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। চন্দ্রবাবুর কথার যদি সত্যই এমন একটা ব্যবহারিক মূল্য থাকে, তবে তাহা দ্বারা প্রকৃত হাস্যরস সৃষ্টির কোন বাধা হইয়াছে কি না, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। কারণ, এ কথা সত্য যে, অসঙ্গতি ও অসম্ভাব্যতা দ্বারাই হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সঙ্গতি এবং যাথার্থ্যের মধ্যে প্রকৃত হাস্যরসের উপাদান নাই। সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, চন্দ্রবাবু দেশহিতের উৎসাহ-প্রাবল্যে এমন সব অকিঞ্চিৎকর বস্তু লইয়া এমন অসম্ভব পরিকল্পনাও করিয়াছেন, যাহা সহজেই হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। বলাই বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে চন্দ্রবাবুর মত ব্যবহারিক বুদ্ধির অভাবের পরিচয় দেন নাই। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, চন্দ্রবাবু হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার বাক্য দ্বারা নয়, কার্য দ্বারা। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে কোন দৃঢ়তা নাই—কুমারসভায় স্ত্রীসভ্য গ্রহণ করিতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না, শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের মূল বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতেও তিনি বিশেষ বিলম্ব করিলেন না। এই বৃদ্ধের জীবনে কি সত্য ছিল, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। এই কথাটি নাটকে খুব স্পষ্ট করিয়া অনুভব করা না গেলেও, একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নির্মলার প্রতি স্নেহই তাঁহার জীবনে সত্য ছিল। এই বৃদ্ধ একমাত্র নির্মলার জন্যই বার বার নিজের আদর্শকে বিসর্জন দিয়াছেন ; কিন্তু নাটকের মধ্যে এই বিষয়টি একটু গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার পরই শৈলর চরিত্রটি সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিতে হয়। এই নাটকের মধ্যে যে-সকল চরিত্র কাহিনীর দিক দিয়া নিতান্তই অবাস্তব বলিয়া মনে হইবে, শৈল তাহাদের অন্যতম। শৈলর কাজ প্রধানত রসিকই করিয়াছে, শৈলকে দিয়া তাহাদের পুনরভ্যাস করিবার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না। বিশেষতঃ এই হাস্যরসাত্মক নাটকের মধ্যে বাল-বিধবা শৈলর স্থান নিতান্ত সঙ্কুচিত হওয়াই স্বাভাবিক। মুখের কথায় এবং বাহিরের আচরণে তাহার জীবনের কারুণ্যের দিকটা সে যতই গোপন করুক না কেন, দর্শকের সম্মুখে তাহার উপস্থিতি

নাটকের নিরবচ্ছিন্ন হাস্যরসোপভোগের পক্ষে যে কতকটা বাধার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই নাট্যকাহিনীর সর্বত্র তাহার অবাধ গতি রহিয়াছে, সে অক্ষয়ের সঙ্গে আর দুইজন অবিবাহিত শ্যালিকার মতই মিশিয়াছে, অপরিচিত যুবকের সঙ্গে পুরুষের ছদ্মবেশ ধরিয়া বন্ধুর মত মিশিয়াছে, বৃদ্ধ রসিকের সঙ্গে অবাধ রসিকতার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, বিধবার কোন আচারই সে স্বীকার করিয়া নিজের আচরণকে কোন দিক দিয়া সংযত করে নাই; অর্থাৎ তাহার পরিচয়ে সে বিধবা, কিন্তু আচরণে সে বিধবা নহে। যদি তাহাই হয়, তবে নাট্যকাহিনীর দিক হইতে তাহার বিধবা বলিয়া পরিচয় দিবার কোন কারণ ছিল না। এই নাটকের পরম হাস্যোজ্জ্বল রস-চিত্রের মধ্যে তাহার অকাল-বৈধব্যের এই সকরুণ পরিচয়টি গোপন থাকিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

এই নাটকের শেষ দৃশ্যে শৈলর চিত্রটি কি করুণ! পরিপূর্ণ মিলনের আনন্দোৎসবের মাঝখানে বিধবাবেশিনী শৈল আসিয়া চন্দ্রবাবুকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন।' তাহাকে দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। অক্ষয় তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিল। সেই মুহূর্তেই নাটকের যবনিকা পড়িয়া গেল; কিন্তু সেই আনন্দোজ্জ্বল মিলন-চিত্রখানির মাঝখানে যে একটি কালির দাগ পড়িয়া গেল, নাট্যকার তাহা লক্ষ্য করিলেন না। অথচ ইহার কি প্রয়োজন ছিল?

নৃপ ও নীরর চরিত্র দুইটি সুচিত্রিত হইয়াছে। ইহারা ছোটবড় ভগিনীর মত নহে, বরং সমবয়সী সখীর মত পরস্পর একটি মধুর সম্পর্ক রচনা করিয়াছিল। নৃপ একটু 'স্নিগ্ধ শান্ত' হইলেও নীরর কৌতুকরসের হিল্লোলে সেও যে আন্দোলিত না হইত, তাহা নহে। কথায়, হাস্যে, সঙ্গীতে ইহারা কাহিনীটি সর্বত্র সরস ও জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

পূর্বেও বলিয়াছি, 'চিরকুমার সভা'র হাস্যরস বাক-চাতুর্যের মধ্যেই অধিকতর নিহিত, এই হিসাবে ইহা ইংরেজি wit শ্রেণীর রচনার অন্তর্গত, খাঁটি হাস্য বা humour শ্রেণীর রচনার অন্তর্গত নহে। বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের অন্তর্গত এক একটি চরিত্রের মুখে যে সকল রসবাক্য উচ্চারিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে প্রধানতঃ ইহার হাস্যরস উৎসারিত হইয়াছে। ইহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক দুর্লভ সম্পদ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার কাহিনীগত দৈন্যের জন্য ইহাকে সমগ্রভাবে একখানি উচ্চাঙ্গের প্রহসন বলা যায় না।

•

'মুক্তির উপায়'

শেষ বয়সে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রহসনের নাম 'মুক্তির উপায়'। ইহা 'গল্পগুচ্ছে'র একটি গল্প অবলম্বনে রচিত, গল্পটির নামও 'মুক্তির উপায়'। একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ইহার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে নিজেই এই পরিচয় দিয়াছেন—

'ফকির স্বামী অচ্যুতানন্দের চেলা। গোঁপদাড়িতে মুখের বারো আনা অনাবিষ্কৃত। ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী। বাপের আদরের মেয়ে। তিনি টাকা রেখে গেছেন ওর জন্যে। ফকিরের বাপ বিশ্বেশ্বর পুত্রবধূকে স্নেহ করেন, পুত্রের অপরিমিত গুরুভক্তিতে তিনি উৎকণ্ঠিত। পুষ্পমালা এম.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে। দূর সম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়াগাঁয়ে বোনের বাড়ীতে সংসারটিকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কৌতূহলের সীমা নেই। কৌতুকের জিনিসকে নানা রকমে পরখ ক'রে দেখ্‌ছে কখনো নেপথ্যে, কখনো রঙ্গভূমিতে। ভারি মজা লাগ্‌ছে। সকল পাড়ায় তার গতিবিধি, সকলেই তাকে ভালবাসে। * * পাশের পাড়ার মোড়ল ষষ্ঠীচরণ। তার নাতি মাখন দুই স্ত্রীর তাড়ায় সাত বছর দেশ ছাড়া। ষষ্ঠীচরণের বিশ্বাস, পুষ্পর অসামান্য বশীকরণের শক্তি, সেই পারবে মাখনকে ফিরিয়ে আনতে। পুষ্প শুনে হাসে আর ভাবে, যদি সম্ভব হয় তবে প্রহসনকে সে সম্পূর্ণ করে দেবে। এই নিয়ে রবি ঠাকুর নামক একজন লেখকের সঙ্গে সে পত্র ব্যবহার করেছে।' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি দ্বারা এই প্রহসনের ভিতর তাঁহার নিজের কি বক্তব্য ছিল, তাহা পরিস্ফুট হইলেও, যাহা ইহার ভিতর দিয়া প্রকৃতই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা একটু স্বতন্ত্র। সেইজন্য কাহিনীটি সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

ফকির সর্বদা গুরুনাম জপ করে, বৃদ্ধ পিতা বিশ্বেশ্বর তাঁহার পেন্‌সনের টাকায় সংসার চালান। স্ত্রী হৈমবতী তাহার নিজের পিতৃদত্ত ধন দিয়া স্বামীর খেয়াল মিটায়। একদিন বিশ্বেশ্বর পুত্রবধূকে এমন ভাবে ফকিরকে টাকা দিতে নিষেধ করিয়া তাহার অলসতাকে প্রশ্রয় দিতে বারণ করিলেন। শিষ্যদিগের কাঞ্চনের প্রতি আসক্তি দূর করিবার ছলনায় গুরু তাহাদের নিকট হইতে নিজে সোনার মোহর ও গহনা আদায় করে, তাহাদের সঙ্গে

কেহ কেহ নোটও আনিয়া তাহার ঝোলায় ফেলিয়া দেয়। পুষ্পমালা কলেজে সংস্কৃত-পড়া মেয়ে, সে তাহার দিদির বাড়ীতে আসিয়া ফকিরকে এই ভ্রান্ত পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে সঙ্কল্প করিল। তারপর নিজে একদিন তাহার গুরুর নিকট গিয়া তাহাকে পুলিশের ভয় দেখাইল। ভয়ে গুরু ঝোলা ফেলিয়া পলাইয়া গেল, শিষ্যগণ তাহাদের সোনাদানা ফিরিয়া পাইল; কিন্তু গুরুর সঙ্গে ফকিরও পলাইল। হৈমবতী তাহার স্বামীকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পুষ্পকে ধরিল, পুষ্প তাহাকে আশ্বাস দিল। প্রতিবেশী ষষ্ঠী-চরণের নাতি মাখন দুই স্ত্রীর জ্বালায় বাড়ী হইতে বহুকাল নিরুদ্দেশ। ষষ্ঠী তাহার নাতিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পুষ্পকে ধরিল; পুষ্প তাহাকেও আশ্বাস দিল। মাখনের চেহারার বর্ণনা শুনিয়া পুষ্পমালা তাহার আকৃতির বর্ণনা করিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিল যে, সখের থিয়েটারে হনুমান সাজিবার জন্য তাহার এই প্রকার একটি লোক চাই। মাখন আসিয়া ধরা দিল, কিন্তু তাহাকে তাহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট উপস্থিত করিবার পূর্বেই এক গোল বাঁধিল। মাখনের দুই স্ত্রী তাহাদের স্বামী ফিরিয়াছে এই কথা মাত্র শুনিয়া স্বামী মনে করিয়া যে এক ব্যক্তিকে নিজেদের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল, সে প্রকৃতপক্ষে পলাতক ফকির। যাই হোক, পুষ্পর মধ্যস্থতায় অবশেষে হৈম আসিয়া নিজের স্বামীকে চিনিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল, মাখনের দুই স্ত্রীও মাখনকে লইয়া নিজেদের ঘরে গেল।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের নাটকগুলির মধ্যে যেমন বৃষ্টির ধারা অপেক্ষা বিদ্যুতের দীপ্তিই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে, ইহার মধ্যেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। শাণিত ক্ষুরধারের মত ইহার ভাষা, অথচ ইহার প্রধান ত্রুটি এই যে, যে-সমাজটি তাঁহার এই প্রহসনের ক্ষেত্ররূপে নির্বাচিত হইয়াছে, তাহা এই ভাষার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। 'শেষের কবিতা' ও 'বাঁশরী'র ভাষার সঙ্গে যেমন তাহাদের পরিবেশের নিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছে. ইহার মধ্যে তাহা হয় নাই। মাখনের দুই স্ত্রীর মুখে যে গালিগালাজের ভাষা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি দক্ষ ছিলেন না বলিয়া তাহাও যেন প্রাণহীন বলিয়া বোধ হয়। বহুকাল পূর্বে দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'জামাই-বারিকে'র দুই সপত্নীর কোন্দলের মধ্য দিয়া যে জীবন্ত ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে তাহারই অত্যন্ত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র

শোনা যায়। ভণ্ড সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত লইয়া রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে যে সকল ছোটগল্প ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদের মত এত শক্তিশালী রচনা নহে। ছোটগল্পের আকারে এই কাহিনীটির মধ্যে যে রসস্ফূর্তি হইয়াছে, প্রহসনের মধ্য দিয়া তাহা হয় নাই, ছোট গল্পটির রস জমাট বাঁধিয়াছিল, প্রহসনের মধ্যে তাহা যেন কেমন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার প্রধান চরিত্র পুষ্পমালা। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ চরিত্রটির যে পরিচয় দিয়াছেন, কাহিনীর ভিতর দিয়া ইহার সেই পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'এই প্রহসনের বাইরে পুষ্পমালার জীবনের আর একটি প্রহসন আছে।' তাহা এই প্রহসনের বাহিরে বলিয়াই বোধ হয় তাহার চরিত্রটি সমগ্রভাবে এখানে সুপরিস্ফুট হয় নাই। ছোটগল্পের মধ্য দিয়া তাহার যে পরিচয়টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ইহার মত এত অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে না। যে সকল ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরবর্তী জীবনে নাটক-প্রহসনের আসরে নামাইয়া তাহাদের রসের হানি করিয়াছেন, ইহা তাহাদের অন্যতম।

পঞ্চম অধ্যায়

ঋতু-নাট্য

বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে একটি চিরসঞ্চরণশীল গতি-প্রবাহ অনুভব করিয়াছেন, তাহাই তিনি তাঁহার ঋতু-বিষয়ক নাটকগুলির মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। বাহিরের দিক হইতে নিত্য পরিবর্তমান হইয়াও, অন্তরের দিক হইতে বিশ্বপ্রকৃতির অপরিবর্তনীয় যে এক নিত্যরূপ কবির ধ্যান-দৃষ্টির লক্ষ্য-গোচর হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার এই শ্রেণীর নাটকের উপজীব্য হইয়াছে। প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও নাটক উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণবান্ ও সরস বলিয়া অনুভব করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি-বিষয়ক গীতি-কাব্যগুলি হইতে প্রকৃতি-বিষয়ক নাটকগুলি এক স্বতন্ত্র গৌরব লাভ করিয়াছে। কারণ, নাটকের ধর্ম গতি এবং প্রকৃতির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সেই গতির স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন, প্রকৃতির এই গতির অনুভূতি হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ তাঁহার ঋতু-বিষয়ক নাটকগুলির প্রেরণা লাভ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে জীব-জগতের মত প্রকৃতি-জগতও সুসম্পূর্ণ। মানব-জীবনের অন্তর্লীন এক অখণ্ড রস-প্রবাহ যেমন তাহার বাহ্যরূপের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেছে, তেমনই প্রকৃতি-জগতেও রসপ্রবাহের এক অখণ্ড ধারা প্রকৃতির চিরপরিবর্তমান বহিঃসৌন্দর্যের ভিতর দিয়া নিত্য অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে। একদিকে মানব, আর একদিকে প্রকৃতি—উভয়ে মিলিয়া বিশ্বসৌন্দর্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতেছে। এই প্রকৃতি-বোধ হইতেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিষয়ক নাটকগুলির প্রেরণা আসিয়াছে।

এই শ্রেণীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতিজাত কাব্য-ধর্মী পরিকল্পনায় স্থূল নাট্যিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবার কথা। কারণ, নাটক যদি বাস্তব জীবনের সজীব আলেখ্য বলিয়াই বিবেচনা করি, তাহা হইলে এই শ্রেণীর রোমান্টিক পরিকল্পনার স্থান তাহাতে একেবারে নাই বলিলেই চলে। অতএব রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটককে স্থূল নাট্যিক আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ইহাদের নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে আনিয়া বিচার করাই সঙ্গত। ইহাদের নাট্যিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যস্থতায় কবির যে সত্যোপলব্ধি ইহাদের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর নহে। এক দিক দিয়া ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য অবিসংবাদিত।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ সরস, প্রাণবান্ ও গতিশীল বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। মানব জীবনেরও ইহাই ধর্ম। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলন অতি সহজ ভাবেই সম্ভব করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার প্রায়ই কোনপ্রকার রূপক-সঙ্কেতের সাহায্য গ্রহণ করিবারও প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু সর্বত্রই যে তিনি এই বিষয়ক নাটক রচনায় রূপক কিংবা সঙ্কেতকে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাহাও নহে। মাত্র দুই একখানি নাটকের মধ্যে ইহাদের আশ্রয়েও তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিষয়ক নাটকগুলির মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্য খুব অধিক নাই—থাকিবার কথাও নহে। কিন্তু বিষয়গত বৈচিত্র্যের মধ্যে ইহাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় নাই, ইহাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পাইয়াছে ইহাদের বর্ণনার ভঙ্গির মধ্যে। বিষয়বস্তু ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত দীন, অনেক সময় একই পটভূমিকার উপর প্রায় অভিন্ন প্রকৃতির চরিত্র আনিয়া সংস্থাপন করা হইয়াছে, একমাত্র বিষয়ের ঈষৎ অনৈক্যই ইহাদের পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধারণ নাট্যিক আদর্শ হইতে ইহারা বহু দূরবর্তী—যেমন বাহিরের দিক দিয়া, তেমনই অন্তরের দিক দিয়াও ইহারা গীতিকাব্যেরই স্বধর্মী। এমন কি, এই শ্রেণীর অনেক রচনা নাটক বলিয়া উল্লেখিত হইয়া অভিনীত হইলেও, ইহারা বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি-বিষয়ক গীতিকবিতার সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

রবীন্দ্রনাথের ঋতু-বিষয়ক নাটক বা গীতিনাট্যের মধ্যে এই কয়টির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে—'শেষ বর্ষণ', 'শারদোৎসব', 'বসন্ত', 'সুন্দর', 'ফাল্গুনী', 'ঋতু-চক্র', 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'; ইহাদের মধ্যে 'ঋতু-চক্র' তাঁহার 'প্রবাহিণী'র অন্তর্গত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন গানের সমষ্টি। যদিও ভাবগত আদর্শের দিক দিয়া 'ঋতুচক্র' তাঁহার অন্যান্য ঋতুবিষয়ক নাটকের সঙ্গে অভিন্ন, তথাপি বাহিরের দিক হইতে ইহার নাট্যিক কোন পরিচয় নাই। 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' নৃত্যগীত-আবৃত্তিযোগে অভিনীত হইয়া থাকিলেও, ইহা অভিনয়যোগ্য নাটক নহে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও ইহাকে পালাগান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কোন পালা নাই, কেবল গানই আছে। অতএব তাহাও

গীতিকাব্যের মধ্যে আনিয়া বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে 'ফাল্গুনী' নাটকখানির প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র, তদ্ভিন্ন অন্যান্য নাটকগুলির প্রকৃতিগত কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও, ইহাদের বাহ্য পরিচয়ের মধ্যে পরস্পর কোন পার্থক্য নাই; ইহাদের পটভূমিকার পরিকল্পনাও সম্পূর্ণ অভিন্ন। সংস্কৃত নাটকের prelude বা সূচনা-ভাগ অনুযায়ী ইহাদের মধ্যেও সূত্রধার-নটের অনুরূপ চরিত্রের মধ্য দিয়া নাটকাখ্যানগুলির সূচনা হইয়াছে। নাট্যিক বিষয়ের সঙ্গে দর্শক-সাধারণের পরিচয় করাইয়া দিবার যে রীতিটি সংস্কৃত নাটকের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, এই সকল নাটকের মধ্যেও তাহা অনুসরণ করা হইয়াছে। সংস্কৃত নাটক যেমন বিশেষ কোন ঋতু, বিশেষতঃ বসন্ত ঋতুর উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইত, রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলিও শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন ঋতুকালীন উৎসব উপলক্ষে অভিনীত হইবার জন্য রচিত হইত। এই সমস্ত ঋতু-উৎসব-বিষয়ক নাটক রচনাকালে রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট নৃত্য, গীত ও অভিনয় ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত। রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন নাট্যরচনার বিশেষ কোন মঞ্চব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলেও, তাঁহার ঋতুবিষয়ক নাটকগুলি সাধারণতঃ শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদিগের অভিনয়-বৈশিষ্ট্য ও তথাকার নৃত্যগীতের প্রচলিত আদর্শ দ্বারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কারণ, এই সকল নাটকের প্রথম অভিনয়-স্থান শান্তিনিকেতন কিংবা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কলিকাতার বসতবাটী এবং ইহাদের প্রধান দর্শক থাকিতেন তিনিই নিজে; শুধু তাহাই নহে, সম্ভব হইলে তিনি অন্যের সঙ্গে অভিনয়ে যোগদান করিতেন।

বাহিরের উৎসব উপলক্ষ করিয়া এই শ্রেণীর নাটক রচিত হইত বলিয়া সাধারণত ইহাদের বাহিরের দিকটা যতখানি রস-সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ, ইহাদের অন্তরের দিকটা ততখানিই দীন। ইহাদের মধ্যে মানব-জীবনকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে আনিয়া গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করা হয় নাই; শুধু তাহাই নহে, মানব-মনের উপর প্রকৃতির যে গভীর প্রভাব কবি অন্যত্র অনুভব করিয়াছেন, তাহারও নির্দেশ ইহাতে অত্যন্ত গৌণ। এমন কি, কালিদাস-রচিত সংস্কৃত নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'র চতুর্থ অঙ্কে পতিগৃহ-গমনোন্মুখা শকুন্তলার সঙ্গে আশ্রম-প্রকৃতির যে নিবিড় যোগ কবি অনুভব করিয়াছেন তাহাও ইহাদের মধ্যে নাই। মনে হয়, উৎসবের রং বাহির হইতে ইহাদের গায়ে লাগিয়াছে এবং তাহারই ঔজ্জ্বল্যে তাহারা চিক্‌চিক্ করিতেছে, অন্তরতম

প্রদেশ পর্যন্ত তাহার কোন প্রেরণা সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। প্রকৃতির রাজ্যে বিচিত্র উৎসবের অনুষ্ঠান চলিতেছে, মানুষ দূরে দাঁড়াইয়া তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছে মাত্র।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহাদের মধ্যে 'ফাল্গুনী' নাটকখানির প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র। ইহা ঋতু-উৎসব বিষয়ক নাটক হইলেও ইহার মধ্যে প্রকৃতি-দর্শন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট একটি বক্তব্য বিষয় আছে এবং তাহা তিনি ইহাদের মধ্যে অন্যান্য নাটকের মত সহজ ও প্রত্যক্ষ করিয়া বলেন নাই—একটি রূপকের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ঋতুবিষয়ক আর কোন নাটকের মধ্যে কোন রূপক বা অপ্রত্যক্ষোক্তি নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'ফাল্গুনী' প্রকৃতি-বিষয়ক নাটক হইলেও, ইহা রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাঙ্কেতিক নাট্যরচনার যুগের রচনা। 'ফাল্গুনী' রচনার পূর্ববর্তী মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি একাদিক্রমে তাঁহার তিনখানি প্রসিদ্ধ রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক যথা, 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর' রচনা করেন এবং ইহাদের পরই তাঁহার 'ফাল্গুনী' রচিত হয়। অতএব 'ফাল্গুনী'র মধ্যে স্বভাবতঃই এই রূপকের প্রভাব আসিয়া গিয়াছে, নতুবা অন্যান্য ঋতুবিষয়ক নাটকগুলির মতই ইহাও তিনি রূপক-সঙ্কেতের ভার-মুক্ত করিয়া সহজ ও প্রত্যক্ষভাবেই রচনা করিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও 'ফাল্গুনী'র রূপক নিতান্ত সাধারণ। এমন কি, ইহা এতই সাধারণ যে, রূপকের মধ্য দিয়া প্রকাশ না করিলে বক্তব্য বিষয়টির সৌন্দর্য একেবারেই নষ্ট হইত। বসন্ত ঋতুর বহিরঙ্গগত সৌন্দর্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে রূপকের অকিঞ্চিৎকর তত্ত্বকথাটি 'ফাল্গুনী'র মধ্য দিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা নাটকের সৌন্দর্যবৃদ্ধিরই কারণ হইয়াছে।

এক হিসাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে মনে হইবে, রবীন্দ্রনাথের ঋতু-বিষয়ক নাটকগুলি একটি অখণ্ড গীতিনাট্যের মালিকা, একটি হইতে অপরটি বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই। তাঁহার 'শেষ-বর্ষণ'-এর নটরাজ নিজেও বলিয়াছেন, 'বর্ষাকে না জানলে শরৎকে চেনা যায় না', তেমনই 'ফাল্গুনী'র মধ্যেও তিনি বলিয়াছেন, 'ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তা'র বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন'। ঋতুচক্রের নিত্য আবর্তনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির অখণ্ডতা অনুভব করিয়াছেন, মানবের জীবন-মৃত্যুর মধ্যে সেই অখণ্ডতারই প্রতিরূপ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। প্রকৃতিকে কোন খণ্ডরূপে তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই,

ইহাকে কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া লইয়া তাহার স্বতন্ত্র কোন রূপের সার্থকতাও তিনি স্বীকার করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ঋতুবিষয়ক নাটকগুলির মধ্য দিয়া এই কথাই সর্বত্র ব্যক্ত হইয়াছে।

এই ঋতুবিষয়ক নাটকগুলির মধ্যে যে সকল মানব-চরিত্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই নাট্যিক চরিত্র হিসাবে স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে নাই। তাহাদের অধিকাংশই 'টাইপ' বা ছাঁচ প্রকৃতির, তাহারা প্রায়শঃই এক একটি তত্ত্বের বাহন; এতদ্ব্যতীত তাহাদের আর কোন মানবীয় পরিচয় নাই। তাহারা রাজা, কবি, ঠাকুরদাদা ইত্যাদি বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগকে প্রত্যেক নাটকের মধ্যেই পাওয়া যায়, ইহারা সর্বত্র একই তত্ত্বেরই যে বাহন মাত্র, তাহাই নহে—একই স্বরের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি মাত্র। এই দিক দিয়া এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে যে একটু বৈচিত্র্যের অভাব আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হয়। ঠাকুরদাদার মত ভাবসর্বস্ব, কবির মত আদর্শগত-প্রাণ এবং রাজার মত জীবন-জিজ্ঞাসুর সর্বত্র অবতারণা না করিয়াও যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঋতু-দর্শনের বিশিষ্ট মতবাদ ব্যক্ত করিতে না পারিতেন, তাহা কখনই নহে; অথচ একই প্রকৃতির চরিত্রের সর্বত্র অবতারণার জন্য নাটকগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যসৃষ্টি সম্ভবপর হয় নাই। ইহা এই শ্রেণীর নাটকগুলির একটি গুরুতর ত্রুটি। কিন্তু কি প্রকৃতির রাজ্যে, কি মানুষের রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ বাহ্য খণ্ড বৈচিত্র্য সৃষ্টি অপেক্ষা ইহাদের অন্তরের গভীরতম ঐক্যটির সন্ধান করিয়াছেন, প্রকৃতি-উৎসবের বাহ্য বৈচিত্র্য অপেক্ষা অখণ্ড প্রকৃতি-রূপের চির-স্থির বাণীরূপটির তিনি সন্ধান করিয়াছেন; সেইজন্য সম্ভবতঃ তিনি ইহাদের বহিঃসৌন্দর্যের বৈচিত্র্যসৃষ্টিতে তত মনোযোগী হইতে পারেন নাই।

'শেষ-বর্ষণ'

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে 'শেষ-বর্ষণ'-ই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়ক নাট্যগুলির মধ্যে রচনার দিক দিয়া যে ইহা সর্বপ্রথম, তাহা নহে—ঋতুনাট্যগুলির বিষয়-পারম্পর্য বিবেচনা করিলে ইহাকে সর্বপ্রথমই স্থান দিতে হয়। গ্রীষ্মঋতু বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের কোন নাট্যরচনা নাই। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই ঋতুনাট্যগুলি শান্তিনিকেতন আশ্রমে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ঋতু-উৎসবে অভিনীত হইবার জন্যই রচিত হইত। গ্রীষ্মের সময় শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-ভবন ও বিদ্যালয়-বিভাগ বন্ধ থাকিত; সেইজন্য গ্রীষ্মকালে কোনও উৎসব অনুষ্ঠিত হইত না। এইজন্যই হউক, কিংবা রবীন্দ্র-কবিমানসের বিশিষ্ট আদর্শ বিরোধী বলিয়াই হউক, গ্রীষ্ম সম্বন্ধে তাঁহার কোন নাট্যরচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ হেমন্ত ঋতু বিষয়ক কোন নাটক রচনা করেন নাই। স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথনে রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন, 'আমাদের দেশের হেমন্তের কোন রূপ নেই। অন্য ঋতুগুলির নিজস্ব রূপ বা তাৎপর্য আছে, অন্তরের অর্থ আছে, হেমন্তের তেমন কিছু নেই।' (রবি-রশ্মি ২, পৃঃ ৮৪)। ইহার পর তিনি হেমন্তের একটা তাৎপর্য বাহির করিলেও এবং ছয়ঋতু সম্বন্ধেই নাটক রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াও (দ্রষ্টব্য, ঐ) তিনি গ্রীষ্ম এবং হেমন্তকে অবলম্বন করিয়া কোন পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই

'শেষ-বর্ষণ' বর্ষাঋতু-বিষয়ক রচনা। কিন্তু ইহা বর্ষার বোধন-নাট্য নহে, বর্ষার বিদায়-নাট্য। বর্ষা-সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য অপেক্ষা অন্য একটি গূঢ়তর তাৎপর্য ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ঋতুচক্রের নিরবচ্ছিন্ন নিত্য আবর্তনের অনুভূতিই রবীন্দ্রনাথের ঋতু-নাট্যগুলির ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। 'শেষ-বর্ষণ'-এর ভিতর দিয়া এই কথাই প্রকাশ করা হইয়াছে। 'ফাল্গুনী' নাটকেরও ইহাই বিষয়। এই সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য এই যে, যে-রূপে আমরা ঋতুকে প্রত্যক্ষ করি, তাহা ইহার নিত্যরূপ নহে, ছদ্মরূপ মাত্র। ঋতুতে ঋতুতে এক একটা ছদ্মরূপ খসিয়া গিয়া তাহার নূতন আর একটা ছদ্মরূপ প্রকাশ পায় মাত্র। তিনি 'শেষ-বর্ষণ'-এ বলিয়াছেন, '…বাদল লক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিন্‌তে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎ-প্রতিমা।

বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলি বনে তাঁরই গান, মালতী বিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।' 'ফাল্গুনী'র মধ্যেও দেখিতে পাই, শীতের জড়তার মধ্যেই তিনি বসন্তের নবজীবনের উদ্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু 'শেষ বর্ষণে'র বৈশিষ্ট্য এই যে, এই তত্ত্বকথাটি ইহার মধ্যে খুব প্রাধান্য লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহার মধ্যে বর্ষার রস-সৌন্দর্যের বিস্তারই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে ইহার বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে।

'শেষ-বর্ষণ' ক্ষুদ্রায়তন একটি গীতি-নাট্য। ইহা ভাব-সমৃদ্ধ না হইলেও রস-সমৃদ্ধ বটে। ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে ভাব অপেক্ষা রসই অধিকতর প্রয়োজনীয়; এই দিক দিয়া ইহার সার্থকতা অবিসংবাদিত। ইহার কাহিনী-ভাগ খুব সংক্ষিপ্ত। কাহিনীটি নাট্যের উপযোগী নহে, কাব্যেরই উপযোগী। তাহা এই প্রকার—আশ্বিন মাসে রাজা ঋতু-উৎসব করিবার জন্য দেশান্তর হইতে নটরাজ, নাট্যাচার্য ও গায়ক-গায়িকার দলকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। কবিশেখর-রচিত একটি পালাগান এই উপলক্ষে অভিনীত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ষাকে আহ্বান করিয়া নটরাজ উৎসবের সূচনা করিল। নটরাজের গানের দলের সঙ্গীতে অন্তরের আকাশে বর্ষা যখন ঘনাইয়া আসিল, তখনই বর্ষার বিদায়ের পালা শুরু হইল। বর্ষার অন্ধকারের প্রান্তে শরৎ-প্রত্যূষের শুকতারা দেখা দিল। শরতের মাধুরী বাতাসে বাতাসে আভাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহারই ছায়ারূপ কবির গানের মধ্যে ধরা দিল। বর্ষার অবগুণ্ঠন ঘুচিয়া গেল, শরতের রূপ মূর্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার মধ্যেও এই যাই-যাই ভাব। নটরাজ বলেন, এই যাওয়া আসায় স্বর্গমর্ত্যের মিলন-পথ বিরহের ভিতর দিয়া খুলিয়া যায়। এইখানেই কবির বাঁশী নীরব হইল।

ভাষণ ও সঙ্গীতের রচনা-কুশলতায় এই অপরিসর গীতিনাট্যটি নিবিড় রসঘন হইয়া উঠিয়াছে। যে প্রকৃতি-বন্দনা এই শ্রেণীর নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা ইহার মধ্যে অপূর্ব সার্থক হইয়াছে। মানব-মনের উপর প্রকৃতির প্রভাবের চিত্রটি ইহাতে এত নিপুণভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ইহার পরিকল্পনায় প্রকৃতি ও মানুষের পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে, ইহার কথা এবং সঙ্গীতের অনবদ্য ধ্বনি-তরঙ্গে মানবের অন্তরের আকাশ এবং বাহিরের আকাশ একাকার হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়।

ইহার বিষয়বস্তু যেমন বৈচিত্র্যহীন গীতিকাব্যের অনুকূল, তেমনই ইহার রচনা-ভঙ্গীও সম্পূর্ণ গীতিকাব্যেরই বিধান-সম্মত। তবে ইহার মধ্যে কোন তত্ত্বকথার জটিলতা নাই, ইহার সহজ সৌন্দর্য-বন্দনার দিকটা অনায়াসেই সকলকে মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের ঋতুবিষয়ক উৎকৃষ্ট কতকগুলি সঙ্গীত ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'কল্পনা' কাব্যের বর্ষামঙ্গল কবিতাটিও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

‘শারদোৎসব’

রবীন্দ্রনাথের ঋতু-বিষয়ক নাটকগুলির মধ্যে ‘শারদোৎসব’ই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা। ‘শেষ-বর্ষণ’ নামক ক্ষুদ্র গীতিনাট্যখানিকে ‘শারদোৎসবে’রই prelude বা প্রস্তাবনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। ইহা সামান্য পরিবর্তিত আকারে ‘ঋণ-শোধ’ নামে প্রচারিত হয়। ‘ঋণ-শোধে’র কাহিনী সংক্ষেপে এই—

শরৎকাল উপস্থিত। সম্রাট্ বিজয়াদিত্যের মন্ত্রী তাঁহাকে তাঁহার কৌলিক প্রথানুযায়ী সসৈন্যে নূতন রাজ্য জয় করিতে বাহির হইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাট্ শরতের এই আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করিতে চাহিলেন না; কিন্তু সৈন্যবল পরিত্যাগ করিয়া বিনা আড়ম্বরে একাকী বাহির হইতে চাহিলেন। মন্ত্রী ও সেনাপতি ইহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইলেন না। তারপর সম্রাট্ এক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সভাকবি শেখরকে মাত্র সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। বেতসিনী নদীর তীরে বালকগণ শরৎকালের বন্দনা-গান গাহিতেছিল, নিকটবর্তী গৃহ হইতে এক শ্রেষ্ঠী বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। শ্রেষ্ঠীর নাম লক্ষেশ্বর। ঠাকুরদাদা আসিয়া বালকদিগের সঙ্গে মিশিলেন এবং তাহাদিগের আনন্দের সঙ্গী হইলেন। উৎসব-মত্ত বালকগণ ঠাকুরদাদাকে লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বীণাকার সুরসেন শ্রেষ্ঠী লক্ষেশ্বরের নিকট কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন। এই ঋণ শোধ করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার এক বালক শিষ্য ছিল, নাম উপনন্দ। উপনন্দকে নিরাশ্রয় অবস্থা হইতে আশ্রয় দিয়া সুরসেন তাহার জীবিকা-সংস্থানের উপায়-স্বরূপ চিত্র-বিচিত্র করিয়া পুঁথি নকল করিবার বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই কার্য দ্বারাই উপনন্দ গুরুর ঋণ-শোধ করিবার ভার স্বেচ্ছায় নিজের উপর গ্রহণ করিল। শারদ প্রকৃতির রাজ্যে বালকগণ ঠাকুরদাকে লইয়া যখন উৎসব আনন্দে মত্ত, তখন উপনন্দ এক কোণে বসিয়া নিজের মনে পুঁথি নকল করিয়া যাইতেছিল। সন্ন্যাসি-বেশী সম্রাট্ বিজয়াদিত্য আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন; বালকগণ এই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর চেলা সাজিল এবং উপনন্দকেও গিয়া তাঁহার চেলা সাজিয়া খেলা করিবার জন্য বারবার মিনতি করিতে

লাগিল। কিন্তু উপনন্দ তাহার হাতের কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। রাজ-সন্ন্যাসী তাহার পাশে আসিয়া সস্নেহে তাহার কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; উপনন্দ তাহার ঋণের কথা বলিল। শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন, তাহার কার্যে তিনি তাহাকে সাহায্য করিতে চাহিলেন, তাহা দেখিয়া বালকের দল আসিয়া উপনন্দর পুঁথি লেখার কার্যে লাগিয়া গেল, কিন্তু অল্পক্ষণেই শ্রান্ত হইয়া পড়িল। উপনন্দ তাহার কাজ করিয়া চলিল।

বিজয়াদিত্যের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, নাম সোমপাল। তিনি ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া বিজয়াদিত্যের বিরুদ্ধে বিজয়-লাভের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন; শ্রেষ্ঠী লক্ষেশ্বরও তাঁহার নিকট আসিয়া অর্থ-লাভের জন্য বর প্রার্থনা করিল। উভয়ের নিকটই পরিচয় গোপন রাখিয়া নিজের সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা সন্ন্যাসী পরম কৌতুকের সৃষ্টি করিলেন। উপনন্দ এক প্রান্তে বসিয়া পুঁথি নকল করিয়া যায়। লক্ষেশ্বর তাহাকে আসিয়া একবার অকারণে অপমান করিল; সে মনে করিল, লক্ষেশ্বরের এই অপমান দিয়াই তাহার প্রভুর ঋণ চুকাইয়া দিবে, কিন্তু আবার তাহার মনে গ্লানির সঞ্চার হইল; আবার পুঁথি নকল করিয়া ঋণশোধের আয়োজন করিতে লাগিল। বিশ্বের প্রকৃতিতে শারদার আবির্ভাব হইয়াছে; কবিশেখর বালকদিগকে লইয়া আনন্দে মত্ত। বিজয়াদিত্যের অনুচরবর্গ তাহাদের সম্রাটের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত লক্ষেশ্বর রাজ-সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে তাহার সমস্ত সম্পদ আনিয়া রক্ষা করিল। অবশেষে সন্ন্যাসীর পরিচয় জানিতে পারিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সামন্ত রাজা সোমপাল সর্বতোভাবে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন, লক্ষেশ্বরও একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। উপনন্দ এই কয়দিন পুঁথি লিখিয়া তিন কাহন অর্জন করিয়াছে, কিন্তু লক্ষেশ্বরের নিকট তাহার প্রভুর সহস্র কার্ষাপণ ঋণ। সম্রাট্ উপনন্দর নিকট হইতে তাহার অর্জিত তিন কাহন মুদ্রা চাহিয়া লইলেন এবং লক্ষেশ্বরকে সহস্র কার্ষাপণ গুণিয়া দিবার আদেশ করিলেন; উপায়ন্তর না দেখিয়া লক্ষেশ্বর তাহাই করিল, এই অর্থ দ্বারা উপনন্দকে ঋণমুক্ত করিয়া নিঃসন্তান সম্রাট্ তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন, সোমপালকেও ক্ষমা করিলেন। তারপর সোমপালের রাজ্যের প্রজা ঠাকুরদাদাকে সঙ্গে লইয়া নিজের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই নাটকের বিষয়-বিন্যাস ও রচনা-ভঙ্গি যদিও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য

সাঙ্কেতিক ও রূপকনাট্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ, তাহা হইলেও ইহা মুখ্যত সকল প্রকার রূপক ও সঙ্কেত-বর্জিত নাটক। ইহার কোন অংশে রবীন্দ্রনাথের আসন্ন সাঙ্কেতিক নাটক রচনার যুগের পূর্বগামী আভাস অনুভব করা গেলেও, সমগ্রভাবে ইহার মধ্যে তেমন কোন ভাবেরই অস্তিত্ব নাই। এমন কি, পূর্বাপর সুসঙ্গত কোন ভাব-প্রকাশের দায়িত্ব এই নাটকাখ্যানের মধ্যে কবি নিজেও গ্রহণ করিতে যান নাই। এই সম্বন্ধে 'শারদোৎসবে'র ভূমিকায় তিনি রাজমন্ত্রীর মুখ দিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিবার যোগ্য। 'শারদোৎসবে'র বিষয়-বস্তু সম্পর্কে মন্ত্রী রাজাকে বলিতেছেন যে, 'সেটা গানেতে গন্ধেতে রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না-গোছের জিনিস। ......তা' শরৎকালের উপযোগী খুব হাল্‌কা রকমের ব্যাপার। তা'র মধ্যে ভার এতটুকুও নেই।......শরৎকালের মেঘ যে হাল্কা, তা'র কোন প্রয়োজন নেই, তা'র জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী'।

হয়ত 'শারদোৎসব' রচনায় রবীন্দ্রনাথের মূলতঃ ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যখন তিনি ইহাকে 'ঋণ-শোধ' নামে পরিবর্তিত করিলেন, তখনই ইহাতে লঘুভার শরৎ-মেঘের কিছুই-না-গোছের এই হাল্কা ভাবটুকুর স্থানে একটি তত্ত্বকথার প্রাধান্য দিতে চাহিলেন। 'শারোদৎসবে'র মধ্যে যাহা নিতান্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, তাহাই 'ঋণ-শোধে'র মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। 'ঋণ-শোধে'র মধ্যে যে তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে 'কিছুই-না-গোছের' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না; ইহার মধ্যে প্রকৃতি-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি-সৌন্দর্যের মর্ম-কথাটি এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—'যদি তাকিয়ে দেখ, তবে দেখবে, সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর। এই যে ধানের ক্ষেত আজ সবুজ ঐশ্বর্যে ভ'রে উঠেছে, এ'র শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা কিছু ও পেয়েচে সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ ক'রে দিলে। তাই ত চোখ জুড়িয়ে গেল।' প্রকৃতি-রাজ্যে এই ঋণ-শোধের প্রচ্ছন্নলীলা অনবরত চলিতেছে, সেইজন্য প্রকৃতি এত সুন্দরী। প্রকৃতি-রাজ্যের এই তত্ত্বটিই রবীন্দ্রনাথ শারদোৎসবের উপনন্দ চরিত্রের ভিতর দিয়া রূপ দিয়াছেন। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেও লিখিয়াছেন,—'রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন

তাঁ'র সাথী। পথে দেখলেন, ছেলেরা শরৎ প্রকৃতির আনন্দে যোগ দে'বার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তা'র প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যে নিভৃতে ব'সে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেছে, কেন না ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎ প্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ-শোধ করছে, সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম।' (—প্রবাসী, ১৩২৪, পৃঃ ২৯৭)

মানব-জীবনের দুঃখকে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই মহান্ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, এই দুঃখকেই তিনি এইখানেই সুন্দরের রূপে অনুভব করিলেন; কারণ, রবীন্দ্রনাথের মতে যাহা মহান্, তাহাই সুন্দর, তাহাই পরিপূর্ণ। প্রকৃতির রাজ্যে আনন্দ-মিলনের ক্ষণ-মুহূর্তে উপনন্দ প্রেমের ঋণশোধের দুঃখকেই একান্ত করিয়া লইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ শারদ প্রকৃতির সমগ্র সৌন্দর্যের মধ্যে বালকের এই দুঃখকেই বড় করিয়া দেখিলেন; তিনি অনুভব করিলেন, প্রেমের ঋণ-শোধের দুঃখেই শারদ-প্রকৃতি সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে—'শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসে উপনন্দ তা'র প্রভুর ঋণ-শোধ করছে। রাজ-সন্ন্যাসী এই প্রেম-ঋণ শোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখতে পেলেন। তাঁর তখনি মনে হলো, শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণ-শোধের সৌন্দর্য। ......উপনন্দ তার প্রভুর নিকট হ'তে প্রেম পেয়েছিল, ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বেয়ে সে যতই সেই প্রেম-দানের সমান ক্ষেত্রে উঠ্‌ছে, ততই যে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করছে। দুঃখই তাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সঙ্গে ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাই কুশ্রীতা।' (—বিচিত্রা, ১৩৩৬, পৃঃ ৪৯১)

এখন এই তত্ত্ব কি ভাবে নাটকের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই দেখিতে হইবে। এ' কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, সৌন্দর্য সম্বন্ধীয় রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট তত্ত্ব-দৃষ্টি এই নাট্যকাহিনী কিংবা নাট্যিক কোন চরিত্রের গভীরতম স্তরে গিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যখন 'শারদোৎসব' রচনা করেন, তখন তাঁহার মনে এই তত্ত্ব-কথার উদয় হয় নাই। ইহাতে শারদ আকাশের বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় নাট্যিক খণ্ড চিত্রগুলি অসংলগ্নরূপে যদৃচ্ছ ভাসমান করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার 'ফাল্গুনী'র রচনার ভিতর দিয়া রূপক ও সঙ্কেতের

সহায়তায় নানা তত্ত্বকথার অবতারণ করিলেন, তখন তাঁহার পূর্ব-রচিত রূপক ও সঙ্কেত-বর্জিত এই সাধারণ নাটকটির ভিতর হইতেও ঋণ-শোধের এই তত্ত্ব-কথাটি উদ্ধার করিলেন। ইহাই 'শারদোৎসবে'র 'ঋণ-শোধে' পরিণতির ইতিহাস। সেইজন্য এই নাটকের এই তত্ত্বগত উদ্দেশ্য নাট্যিক চিত্র এবং চরিত্রগুলির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে জড়িত নহে। অতএব এই নাটকের সৌন্দর্য উপভোগ করিতে হইলে, এই তত্ত্বকথা বাদ দিয়া ইহার বহিঃসৌন্দর্যই উপভোগ করিতে হয়। নাটকের এই বহিঃসৌন্দর্যকেই 'শারদোৎসবে'র 'ভূমিকা'য় গানেতে গন্ধেতে রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না-গোছের জিনিস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহার উপরই নাটকের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু এই নাটক যখন ঋণ-শোধে পরিবর্তিত হয়, তখন ইহার বহিঃসৌন্দর্যের এই গুরুত্ব নির্দেশের অংশ বা এই 'ভূমিকা' পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার তথাকথিত আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব-কথা কোন ভাবেই গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

তত্ত্বের কথা বাদ দিয়া কেবল যদি ইহা বহিঃসৌন্দর্যের দিক হইতেও বিচার করা যায়, তাহা হইলেও এই নাটকের একটি গুরুতর ত্রুটি চোখে পড়ে। ইহাতে বহিঃপ্রকৃতি নাট্যোক্ত কোন চরিত্রেরই মনের উপর গভীর ভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; ইহাতে উৎসবের তাগিদটি মানবের অন্তর হইতে আসে নাই, সম্পূর্ণ বাহির হইতে আসিয়াছে। গীতিকাব্যের মধ্যে এই পরিকল্পনা একেবারে ব্যর্থ না হইলেও, নাটকের মধ্যে ইহার খুব উচ্চ স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ, প্রকৃতি এখানে যখন একটি প্রধান অংশ অভিনয় করিয়াছে, তখন নাট্যোক্ত অন্যান্য চরিত্রের উপর তাহার গভীর প্রভাব নির্দেশ করা প্রয়োজন ছিল; তাহা না হইলে প্রকৃতি ও মানব ইহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া পড়ে। 'ঋণ-শোধে'র তত্ত্বকথা এই নাটকের সঙ্গে যেমন অতি ক্ষীণতম যোগসূত্রে আবদ্ধ করা হইয়াছে, তেমনই শারদোৎসবের আনন্দও মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণা হইতে জাত বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই। তবে এ' কথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিষয়ক নাটকগুলিকে সাধারণ নাট্যিক আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করা সমীচীন হয় না; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের মূল্য গীতিকাব্যগত, নাট্যিক নহে; ইহাদের মধ্যে নাট্যিক চরিত্র-সৃষ্টির যেমন প্রয়াস নাই, তেমনই নাট্যগত ঘটনা সংস্থাপনারও কোন দায়িত্ব

পালন করিতে দেখা যায় না ; অতএব রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটককে স্বতন্ত্র আদর্শে তাহাদের নিজেদের পরিবেশের মধ্যেই বিচার করা সমীচীন।

অতএব বাহিরের প্রকৃতি-উৎসবের দিক হইতেই ইহার বিচার করা যাইতেছে। এই হিসাবেও নাটকটির ত্রুটি নিতান্ত অল্প নহে। 'শারদোৎসব'কে যদি এইভাবে বিচার করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, উৎসবের বর্ণনাও ইহার মধ্যে প্রধান কোন অংশ অধিকার করিয়া নাই ; প্রারম্ভেই সুসজ্জিত উৎসব-মণ্ডপে আসিয়া আমরা প্রবেশ করি, কিন্তু তাহার পর মুহূর্তেই আমাদিগকে এই উৎসব-ক্ষেত্র হইতে বহুক্ষণের জন্য সরিয়া দাঁড়াইতে হয় ; তারপর এই নাটকের একেবারে শেষ অংশে আবার উৎসবের সঙ্গে সামান্য একটু পরিচয়ের পরই নাটকের যবনিকা-পাত হইয়া যায়। ইহার মধ্যবর্তী অংশে কোন কোন স্থানে কাহারো কাহারো মুখে এই উৎসব সম্পর্কে দুই একবার উল্লেখ থাকিলেও তাহার প্রকৃত অনুষ্ঠানের কোন পরিচয় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ঋতুবিষয়ক গীতিনাট্য 'শেষ-বর্ষণ'কে এই 'শারদোৎসবে'র প্রবেশক বা prelude হিসাবে ধরা যায়। 'শেষ-বর্ষণে'ও এই সম্বন্ধে এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকের সূচনায় রাজা নটরাজকে 'শেষ-বর্ষণ'-এর বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

রাজা॥ ···পালাটা আরম্ভ হ'বে কী দিয়ে?

নটরাজ॥ বর্ষাকে আহ্বান? এই আশ্বিন মাসে?

রাজ-কবি॥ ঋতু উৎসবের শব-সাধনা? কবিশেখর ভূত কালকে খাড়া ক'রে তুল্‌বেন। অদ্ভুত রসের কী কীর্তন।

নটরাজ॥ কবি বলেন, বর্ষাকে না জান্‌লে শরৎকে চেনা যায় না। আগে আবরণ তারপরে আলো।

অতএব দেখা যাইতেছে, 'শারদোৎসবে'র স্বতন্ত্র কোন মূল্য আছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও দাবি করেন না। রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের মূল ধারাটি যেমন অখণ্ডনীয়, তেমনই এই গীতিকাব্যের সমপর্যায়ভুক্ত ঋতু-নাট্যগুলিও এক অখণ্ড যোগসূত্রে আবদ্ধ, অনেক সময়ই স্বতন্ত্র করিয়া বিচার করিলে ইহাদের কোন অর্থ উদ্ধার করিতে পারা যায় না।

এই নাটকের মধ্যে বিজয়াদিত্য (সন্ন্যাসী), লক্ষেশ্বর, উপনন্দ, ইহারাই উল্লেখযোগ্য চরিত্র। এতদ্ব্যতীত কবিশেখর ও ঠাকুরদাদা নাটকের মধ্যে

বিস্তৃত অংশ অধিকার করিয়া থাকিলেও চরিত্র হিসাবে নাটকের মধ্যে ইহাদের কোন প্রাধান্য নাই। বিজয়াদিত্যের মধ্যে প্রকৃতির সরল সৌন্দর্য-বোধ অপেক্ষা মানব-চরিত্র-বিষয়ক সূক্ষ্ম কৌতুক-বোধই অধিক বলিয়া অনুভব করা যায়। শারদ-প্রকৃতির উদার আহ্বানে তিনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা এই শরৎকালেই দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, রাজ-মন্ত্রী এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়াতেই তিনি প্রেম দিয়া বিশ্বের প্রেমের ঋণ শোধ করিবার জন্যই বহির্গত হইয়াছেন। মন্ত্রী তাঁহাকে তাঁহার 'রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় যে মানিকপুর আছে সেইটে জয় ক'রে নেবার' পরামর্শ দিয়াছিলেন, এই জয়ে বাহুবল প্রকাশের ঔদ্ধত্য ছিল, তিনিও জয় করিলেন সত্য, কিন্তু মানুষের হৃদয়ের রাজ্য জয় করিলেন; ক্ষমা ও উদারতার দ্বারা গোপন-বিদ্রোহী সামন্ত রাজা সোমপালকে এবং কুসীদজীবী শ্রেষ্ঠী লক্ষেশ্বরকে জয় করিলেন। এই নিতান্ত সাধারণ কথাটিই তাঁহার চরিত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে; অতএব তিনি এই নাটকে উৎসবানন্দের নায়ক নহেন, অত্যন্ত সাধারণ একটি তত্ত্বের পরিবেশক। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাকে উৎসবের পুরোহিত বলিয়া নির্দেশ করিতে চাহেন, তাহা এই জন্যই সমর্থনযোগ্য নহে।

ইহার পরই লক্ষেশ্বরের কথা বলিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই লক্ষেশ্বরকেও একটি তত্ত্ব হিসাবে উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহেন, 'নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবে বাধা কে? লক্ষেশ্বর, সেই বণিক আপনার স্বার্থ নিয়ে, টাকা উপার্জন নিয়ে সকলকে সন্দেহ ক'রে ভয় ক'রে ঈর্ষা ক'রে সকলের কাছ থেকে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন ক'রে বেড়াচ্ছে ('বিচিত্রা'—ঐ)।' এই নাটকে উৎসবের আয়োজন যেমন ক্ষীণ, ইহার বাধাও তেমনই দুর্বল। উৎসবের যে দীনতম আয়োজনের ইঙ্গিতটিও এই নাটকের মধ্যে আছে, তাহারও বিরোধিতা করিয়া প্রবল নাট্যিক সংঘাত সৃষ্টি করিবার শক্তি লক্ষেশ্বর চরিত্রটির নাই। তবে নাটকের লঘু পরিবেশের মধ্যে তাহার সংস্থান একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। প্রকৃতির রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া সে যে নীচ ব্যবহারিক জীবনের স্বার্থপরতার মধ্যে আত্ম-নিমজ্জিত হইয়া আছে, তাহা সার্থকভাবেই দেখান হইয়াছে। কিন্তু নাট্যিক চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা ত কেবল এইখানেই নহে, বিরোধী প্রবৃত্তির সম্মুখীন হইয়া নাট্যিক

বিক্ষোভ যে কত উচ্চ গ্রামে উন্নীত হইতে পারে, এই শ্রেণীর নাট্যিক চরিত্রের মধ্যে তাহারই সন্ধান করিতে হয়। সেই দিক দিয়া এই চরিত্রের ত্রুটি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

তারপর উপনন্দ। এই চরিত্র-পরিকল্পনার মূলে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বগত কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উৎসবের দিনে প্রভুর প্রেমের ঋণ শোধ করিবার দুঃখকে জীবনে বরণ করিয়া সে প্রকৃত সৌন্দর্য ও আনন্দের অধিকারী হইয়াছে; কেহ আবার মনে করেন, উপনন্দের আত্মদান নিঃশেষিত হয় নাই বলিয়া ইহা নিবিড় ভাবে আমাদের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু উপনন্দর আত্মদান 'নিঃশেষিত' হয় নাই বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, উৎসবের দিনে দুঃখের সঞ্চয় তিন কাহন মুদ্রা কুসীদজীবী শ্রেষ্ঠীর অলস সঞ্চয় সহস্র কার্ষাপণের সমান, রবীন্দ্রনাথ উপনন্দর সঙ্গে বিজয়াদিত্যের অর্থ বিনিময়ের ভিতর দিয়া তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। উপনন্দ এখানে নিজেকে নিজের দুঃখের সাধনা দিয়াই মুক্ত করিয়াছে। এই চরিত্রটি এখানে একটি বিশেষ তত্ত্বের বাহন বলিয়া ইহার নাট্যিক পরিকল্পনা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। রাজা সোমপালের চরিত্রটি নাটকে ক্ষুদ্র হইলেও সুপরিস্ফুট। ঠাকুরদাদা ও কবিশেখরের চরিত্রের ভিতর দিয়া লেখক রূপ ও ভাবের যে আনন্দ-মিলনের চিত্র পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহা অনাবিল, শারদ-সৌন্দর্যের মতই স্নিগ্ধ ও পবিত্র।

'বসন্ত'

ইহার পর 'বসন্ত' নামক একখানি ক্ষুদ্র গীতি-নাট্য উল্লেখযোগ্য। ইহার রচনাকাল 'শেষ-বর্ষণ'-এর পূর্ববর্তী। ইহা আয়তনে 'শেষ-বর্ষণ' হইতেও ক্ষুদ্র। বিশেষতঃ 'শেষ-বর্ষণ'-এর মধ্যে যেমন কথায় সঙ্গীতে বর্ষার রূপ ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার মধ্যে কথার ভাগ নগণ্য, সঙ্গীতই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অতএব ইহা প্রকৃতপক্ষে গীতি-কবিতা, তবে বাহ্যতঃ নাটকের রীতিতে রচিত। ইহার বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে এই প্রকার—

বসন্ত-উৎসবের দিন রাজা মন্ত্রণা-সভা হইতে কবির নিকট পলাইয়া আসিয়াছেন। উৎসব উপলক্ষে কবি কি পালাগান রচনা করিয়াছেন, তাহা কবি রাজাকে শুনাইতে লাগিলেন—ঋতুরাজ আসিবেন, তাই আকাশে একটা ডাক পড়িয়াছে—নিজেকে পূর্ণ করিয়া সব কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে। বনভূমি, আম্রকুঞ্জ, করবী ইহারা সকলেই এই ডাকে সাড়া দিল। দখিনা হাওয়া জাগিয়া উঠিল, বাহিরের বেণুবন উতলা হইয়া উঠিল, কেবল ঘরের কোণে দীপশিখাটি শঙ্কিত হইয়া রহিল। চাঁপা ও করবীর ডালপালা ফুলে ভরিয়া উঠিল, পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল; মাধবী, শালবন, বকুলবীথি আকুল হইয়া উঠিল। এমন সময় শুক্‌না পাতা ঝরাইয়া উদাসীন বৈরাগীর বেশে ঋতুরাজের আবির্ভাব হইল। ঋতুরাজের চিরপথিক বেশ, নূতন-পুরাতনের মাঝখান দিয়া নিত্য যাতায়াতের পথ। ইনি বাস্তুছাড়ার দলপতি। অন্তরে ও বাহিরে উৎসব যখন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; তখনই ঋতুরাজের যাইবার সময় উপস্থিত হইল। 'পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা।' প্রকৃতির মধ্যে বিদায়ের সুর বাজিয়া উঠিল। রাজবেশ খসাইয়া দিয়া বৈরাগীর বেশে ঋতুরাজ বাহির হইয়া গেল।

'শেষ-বর্ষণ'-এর অনুরূপ ভঙ্গিতে ইহা রচিত হইলেও, ইহার রস 'শেষ-বর্ষণ'-এর মত এত নিবিড় হইয়া উঠে নাই। ইহার বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব আছে। 'শেষ-বর্ষণ' ও 'ঋণ-শোধে' মুখ্যতঃ কবি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহাই প্রায় ইহারও বক্তব্য। ইহার মধ্যে প্রকৃতিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, মানবাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের নির্দেশ ইহাতে নাই—প্রকৃতির রাজ্যে যে উৎসবায়োজন চলিতেছে, মানুষ যেন তাহা মুগ্ধ-বিস্ময়ে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতেছে মাত্র। ইহার সঙ্গীত-ভাগের রচনা অনবদ্য।

'ফাল্গুনী'

রবীন্দ্রনাথের ঋতু-বিষয়ক নাটকগুলির মধ্যে 'ফাল্গুনী'ই সর্বোৎকৃষ্ট। এই নাটকের রচনা-কাল রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সাঙ্কেতিক ও রূপক নাটক রচনা-কালের মধ্যবর্তী। ১৩২১ সালে এই নাটকখানি রচিত হয় এবং ইহার কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থখানি এই নাটকের সমসাময়িক রচনা এবং 'ফাল্গুনী' এবং 'বলাকার' মধ্যে ভাবগত সম্পূর্ণ ঐক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইখানি গ্রন্থ রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সদ্য পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতালব্ধ আদর্শ দ্বারা অনেকখানি উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিলেন। সে কথা পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

'ফাল্গুনী'-নাটকের আখ্যানভাগ যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে—রাজার মন বিষণ্ণ; কারণ, গত রাত্রিতে মহিষী তাঁহার কণ্ঠে মল্লিকার মালা পরাইতে আসিয়া তাহার কানের কাছে দুইটি পাকা চুল দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। রাজা বুঝিতে পারেন, ইহা দ্বারাই যমরাজ তাঁহার কানের কাছে নিমন্ত্রণ পত্র ঝুলাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। উপস্থিত রাজকর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি পণ্ডিত শ্রুতিভূষণের সাহচর্যে বৈরাগ্য সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। এমন সময় কবিশেখর আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কবি রাজাকে বলিলেন, 'চলার মধ্যেই প্রকৃত বৈরাগ্য সাধনা, খালি খালি আঁকড়ে বসে থাকবার মধ্যে নয়।' কবি রাজাকে এই 'প্রাণের সদর রাস্তায়' বাহির হইয়া পড়িয়া 'যৌবনের বৈরাগীর দলে' যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। চলিষ্ণুতার চির-অনাসক্তির মধ্যে তিনি রাজাকে চির-যৌবনের সৌন্দর্যের সন্ধান দিলেন। তিনি রাজাকে বুঝাইয়া বলিলেন, গতিশীলতাই জীবনের নিত্যত্ব রক্ষা করিতেছে, জীবনের মধ্যে এই গতিবেগকে যে অনুভব করে না, সে-ই মৃত্যু দ্বারা পীড়িত। রাজা কবির এই বাণীতে জড়তা হইতে মুক্ত হইলেন এবং চির-যৌবনের জয়গান করিয়া একটা কিছু রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইবার জন্য কবিকে অনুরোধ করিলেন। কবি তাঁহাকে 'ফাল্গুনী' নাটক উপহার দিলেন।

'ফাল্গুনী' নাটকের মধ্যে কবি দেখাইলেন—বিশ্ব-প্রকৃতি বসন্তের প্রথম-

শিহরণ অনুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ-চঞ্চল একদল যুবক পথে বাহির হইয়া আসিল। তাহারা নিজেদের মধ্যেই যে শুধু চঞ্চল জীবনের প্রবাহ অনুভব করিল, তাহা নহে—তাহারা জলে স্থলে সর্বত্রই এই জীবনের চাঞ্চল্য অনুভব করিল। যুক্তিতর্ক দ্বারা জটিল ও স্থূলবুদ্ধি দ্বারা ভারাক্রান্ত দাদাকেও তাহারা পথে বাহির করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার সংস্কার দূর করিতে পারিল না। যুবদলের কোলাহল শুনিয়া সর্দারও বাহির হইয়া আসিল; সর্দার তাহাদিগকে একটা নূতন খেলা খেলিবার পরামর্শ দিল—খেলাটা আর কিছুই নহে, কেবল একটা বুড়োকে খুঁজিয়া বাহির করা। বুড়োটাকে কেহই চোখে দেখে নাই, সে কোথায় থাকে, তাহাও কেহ জানে না; তাহাকেই খুঁজিয়া বাহির করিবার খেলা খেলিবার জন্য সর্দার যুবদলকে বলিল। যুবদল বুড়ার সন্ধানে বাহির হইল। ঘাটের মাঝি, গাঁয়ের কোটাল ইহাদের নিকট যুবকেরা বুড়ার খোঁজ লইল, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাইল না। অবশেষে এক অন্ধ বাউলের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, বাউল তাহাদিগকে বুড়ার পথের পরিচয় বলিয়া দিল। অন্ধ বাউলের প্রদর্শিত পথে গিয়া যুবকদিগের নায়ক চন্দ্রহাস এক অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। বাউল বলিল, 'এই গুহার মধ্যেই বুড়ো বাস করে।' যুবকদল বাহিরে থাকিয়া অধীর আগ্রহে চন্দ্রহাসের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। চন্দ্রহাস গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সে বুড়াকে ধরিয়াছে, বুড়া আসিতেছে; কিন্তু সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল, গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিল সর্দার। এই সর্দারই চিরকালের। কেহই তাহার সম্মুখ হইতে সবখানি দেখিতে পায় না; সেইজন্য তাহার পরিপূর্ণ পরিচয় জানিতে পারে না, পিছন হইতে খানিকটা মাত্র দেখিয়া তাহার রূপ এক একজন এক এক রকম অনুমান করে মাত্র। দাদা যুবকদলের সঙ্গে তাল রাখিয়া এতদূর এক সঙ্গে আসিতে পারে নাই, এতক্ষণে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহাদের সঙ্গ লইল, যুবকদল তাহাদের মনের রঙে দাদাকেও আজ রাঙাইয়া তুলিল; তারপর সর্দারকে লইয়া সকলে উৎসবে মত্ত হইল।

এই নাট্যাখ্যানকে রবীন্দ্রনাথ তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশ স্পষ্টতঃই 'ফাল্গুনী'র মূল নাটকাখ্যান হইতে স্বতন্ত্র—ইহার নাম 'সূচনা'। রাজার বৈরাগ্য-সাধনার কথা ইহার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া এই অংশের অন্য নাম 'বৈরাগ্য-সাধন'। ইহার কাহিনী এবং পরিকল্পনা

'শারদোৎসব' নাটকের প্রস্তাবনার সম্পূর্ণ অনুরূপ। এই অংশের সঙ্গে 'ফাল্গুনী'র মূল নাটকাখ্যানের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও 'ফাল্গুনী'র বক্তব্য বিষয়ের ভূমিকা হিসাবে ইহার প্রযোজনা অত্যন্ত সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে; বিশেষতঃ 'ফাল্গুনী'র অলোক-পথে পদার্পণ করিবার পূর্বে কবিশেখরের মুখে তাহার যে প্রথম নির্দেশটি ইহাতে পাওয়া যায়, তাহা এই অস্পষ্ট কুয়াসা-লোকের মধ্যে অনেকখানি দিঙ্‌নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিশেষতঃ এই সামান্য কাহিনীভাগের মধ্যে নাট্যকার যে চঞ্চল প্রাণ-বেগের সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা 'ফাল্গুনী'র গতিবাদের মর্মকথার প্রত্যক্ষ উদাহরণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। মূল নাটকাখ্যানের মধ্যে যে অলোক-জগতের কথা রহিয়াছে, এই অংশে তাহার একেবারেই উল্লেখ নাই বলিয়া ইহা সাধারণ পাঠকমাত্রেরই অতি সহজে চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে। ইহার বাস্তব পরিবেশের মধ্যে নাট্যকার যে তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাই পরবর্তী নাট্যাংশে রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে এই অংশও এই নাটকের একটি বিশিষ্ট অংশ বলিয়া মনে হইবে।

দ্বিতীয় অংশকে এই নাটকের গীতি-ভাগ বলা যাইতে পারে। ইহা মূল নাটকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও মূল নাটকের অলোক-পরিবেশ হইতে স্বতন্ত্র। এই অংশের নায়ক-নায়িকা ও পাত্র-পাত্রী সকলেই প্রকৃতি-লোকের অন্তর্ভুক্ত। 'বেণুবন', 'পাখীর নীড', 'ফুলন্ত গাছ' কি ভাবে বসন্তের প্রথম শিহরণ অনুভব করিল, সঙ্গীতের ভাষায় তাহাই প্রথম দৃশ্যের গীতি-ভাগে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির বিচিত্র চৈতন্যানুভূতির কথা সঙ্গীতের মধ্য দিয়া কবি এখানে ব্যক্ত করিয়াছেন—এই প্রকৃতি-লোকের সঙ্গে পরবর্তী নাট্যাংশে উল্লেখিত মানব মনের মিলন যে খুব নিবিড হইয়াছে, তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। ইহার প্রকৃতি-লোক তাহার সুখদুঃখের সমগ্র চৈতন্য লইয়া যেন এই নাটকের অলোক-বিহারী চরিত্রসমূহের সান্নিধ্য হইতে দূরে রহিয়াছে। ইহা প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর প্রকৃতি-বিষয়ক নাটকের একটি গুরুতর ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই নাটকের মধ্যে প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন; ইহার মানব-চরিত্রগুলি রূপক, কিন্তু ইহার প্রকৃতি-জগৎ প্রত্যক্ষ—প্রত্যক্ষ লোকের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ লোকের সংমিশ্রণ ঘটিতে দেন নাই; এইজন্যই প্রকৃতি-লোককে 'ফাল্গুনী'র অলোক-জগতের পটভূমিকায় রক্ষা করা হইয়াছে।

ইহার তৃতীয় অংশই প্রকৃত নাট্যাংশ; ইহাকে নাট্যভাগ বলা যাইতে পারে। ইহার আবার চারিটি দৃশ্য চারিটি ভাগ—পথ, সন্ধানে, সন্দেহ ও প্রকাশ। এই চারিভাগ অবশ্য কাহিনীর ক্রমপরিণতির ধারারই অন্তর্ভুক্ত এবং ইহাদের মধ্যে কোন গভীর বিরাম নাই। 'ফাল্গুনী'র কেবলমাত্র এই নাট্য-ভাগই অলোক-সংজ্ঞা বা রূপকের সহায়তায় প্রকাশ করা হইয়াছে।

'ফাল্গুনী' রূপক ও সঙ্কেত মিশ্র নাটক, ইহা অত্যোপান্ত রূপক নাট্য কিংবা সাঙ্কেতিক নাট্য নহে, ইহার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিবার জন্য রূপক ও সঙ্কেত উভয়েরই সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের মধ্যে এই কথাই বলিয়াছেন যে, জরার কোন রূপ নাই, কোন পরিচয় নাই; মৃত্যুও তেমনি, মৃত্যুরও কোন রূপ নাই, কোন পরিচয় নাই, কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। জীবনের প্রকৃত পরিচয়ের অজ্ঞতার মধ্যেই জরার জন্ম, জীবনের অপরিচিত অংশেই মৃত্যুর গুহা সংস্থাপিত। যাহাকে জরা বলিয়া ভুল করি, তাহা চিরনবীন জীবনেরই এক পরিবর্তিত রূপ, যাহার মধ্যে মৃত্যুর আতঙ্ক অনুভব করি, তাহা জীবনেরই এক অপরিচিত অধ্যায়। জীবনের চিরনবীনতা ভোগ করিবার প্রকৃত অধিকারী কে? মৃত্যুর অন্ধকার গুহাদ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহার রূপ যে নিরীক্ষণ করিবার দুঃসাহস রাখে সে-ই! তাহারাই 'ফাল্গুনী'র চিরনবীনের দল। তাহাদেরই স্পন্দিত জীবনের উন্মত্ত চরণাঘাতে জরার জীর্ণতা নিষ্ফল কুয়াসার মত ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

সদ্য ইউরোপ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তথাকার সমাজ-জীবনের মধ্যে যে প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই এই নাটকের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য জীবনের তুলনায় আমাদের সমাজ-জীবনের মধ্যে পদে পদে যে বাধা, জড়তার যে তামসিক অবসাদ, উদ্দেশ্যের লক্ষ্যহীনতা ইহার সম্মুখপথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, 'ফাল্গুনী' তাহারই বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহের অন্যতম অভিব্যক্তি মাত্র। পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের নিকট 'ফাল্গুনী' যে প্রকৃত সমাদর লাভ করিতে পারে নাই, ইহার একমাত্র কারণ এই যে, যে-জীবনকে আদর্শ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে কীর্তন করিয়াছেন, সেই জীবনেই নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের সমাজ-জীবনের জড়ত্বের পরিমাপও পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা করিতে পারেন নাই; এইজন্য এই নাটকের প্রকৃত গুরুত্ব তাঁহারা অনুমান করিতে সমর্থ

হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন'-এ যেমন একটা দুর্জয় শক্তিদ্বারা এই জড়ত্ব হইতে মুক্তির কথা রহিয়াছে, ইহার মধ্যেও জীবনের সেই দুর্জয় শক্তির জয়গান রহিয়াছে। ইহার প্রেরণা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য, আমাদের জড়-ধর্মী সমাজ-জীবনের উপর পাশ্চাত্ত্যের প্রাণধর্মী শক্তির আঘাত এই নাটকের বিষয়-বস্তুকে যে অপূর্ব গৌরবদান করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের এই আদর্শগত বৈপরীত্যের সংঘর্ষের দিকটা যাঁহারা গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই, তাঁহারাই ইহার নাট্যিক পরিকল্পনা বৈশিষ্ট্যহীন বলিয়া পরিতাপ করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনা নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়া যে কি ভাবে রূপায়িত হইয়াছে, তাহাই এখন বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে। প্রথমেই সর্দার চরিত্রের উল্লেখ করিতে হয়। সর্দারের চরিত্র নাটকের মধ্যে কোন ব্যাপক অংশ অধিকার করিয়া নাই সত্য, তথাপি উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ইহা নাটকের সর্বপ্রধান চরিত্র। সর্দার একটি রূপক চরিত্র। তাহাকে যৌবনের জীবনীশক্তির রূপক বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। জীবনের উচ্ছৃঙ্খল প্রাণশক্তি তাহার নির্দেশে নিজের আনন্দের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিতে শিখে। প্রাণশক্তির অসংহত প্রাচুর্যের অনুভূতির মধ্যে জীবনের কল্যাণ নিহিত নাই, তাহাকে প্রকৃত আনন্দের সন্ধানে নিয়োজিত করার মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ, সর্দারের মধ্যে যৌবনের এই জীবনীশক্তি নিয়মিত। এই সর্দার নিত্যকালের; জীব ও প্রকৃতি-লোকে যে অনন্ত প্রাণশক্তির নিত্যলীলা অভিনীত হইতেছে, তাহার যেমন কোন বিরাম কিম্বা বিকার নাই, সর্দারও তেমনই নিত্যকাল ব্যাপিয়া বিরাম ও বিকারহীন; যাহাকে জরা ও মৃত্যু বলিয়া ভ্রম করি, তাহাতে এই সর্দারেরই জীবনীশক্তির আনন্দময় নিত্য-রূপ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। জড়তার অবসাদ এবং মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে মুক্ত হইয়া এই অনন্ত প্রাণধারার সম্মুখীন হইতে পারিলে জীবনের সত্যকার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। ইহার পরই দাদা চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। 'ফাল্গুনী'র লঘুভার আনন্দ-পরিবেশের মধ্যে দাদাই গুরুভার বস্তুতান্ত্রিকতার রূপক। নাটকের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই চরিত্রটি সকল দিক দিয়াই সুন্দর বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়া ইহার নাট্যিক মূল্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাহার স্থিতি স্থূল, গতি মন্থর; তাহার মতে জীবনের আনন্দের অংশ অনাবশ্যক, ব্যবহারিক জীবনে যাহা অপ্রয়োজনীয়, তাহা অর্থহীন। নাটকের উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট

করিবার জন্য এই প্রকার বিপরীতধর্মী চরিত্রের পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথে নূতন নহে। এই শ্রেণীরই বৈপরীত্যমূলক চরিত্র কতকটা 'শারদোৎসব'-এর লক্ষেশ্বরও বটে। কিন্তু দাদার মধ্যে একটু পার্থক্য এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শেষ পর্যন্ত সে তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিল না, উৎসবের দিনে নবপল্লবের মুকুট পরিয়া তাহাকে যুবদলের আনন্দ-কলরবে আসিয়া যোগদান করিতে হইল।

ইহার পরই 'ফাল্গুনী'র যুবকদলের কথা বলিতে হয়। এই যুবকদল জরামৃত্যুর ভয়হীন চিরযৌবনের প্রতীক্। জীবনের মধ্যে যে যৌবন-শক্তিকে আমরা অভ্যাস ও সংস্কারের দাসত্বে শৃঙ্খলিত রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া মৃত্যুমন্ত্র জপ করিতেছি, এই যুবকদলের মধ্যে সেই যৌবন-শক্তিকে উদ্বোধন করা হইয়াছে। নাট্যকার বলিতে চাহেন, এই শক্তি মানুষের জীবনে আদিঅন্তহীন বা নিত্য; অতএব জীবনের মধ্যে যৌবনের কোনদিন অবসান হইতে পারে না, মানুষ চিরযৌবনের অধিকারী। জড়ত্ব মনের এক ব্যাধি, তাহা ক্রমে অভ্যাস ও সংস্কারে পরিণত হইয়া জীবনের যৌবন-শক্তি আচ্ছন্ন করিয়া দেয়; কিন্তু যুবকদলের সর্দারের নির্দেশে তাহারা এই জড়ত্বের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত জীবনের অধিকারী হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যুবকদলের মধ্য দিয়াই নাটকের মূল বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করা হইয়াছে।

অন্ধ বাউলের চরিত্রটিও একটি রূপক চরিত্র। বাউল অন্ধ অর্থাৎ তাহার ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই সে অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধান দিতে পারিল। যুবক দল যে বস্তুর সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা অনুভূতি-সাপেক্ষ। জরা ও মৃত্যুর রূপ তাহারা নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা নিরীক্ষণ করিবার বস্তু নহে। কারণ, দেহেন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অবস্থিতি। অতএব বাইরের দিক হইতে দেহের ইন্দ্রিয় যে যত বেশী নিরুদ্ধ করিয়া অন্তরেন্দ্রিয়ের সাধনা করিতে পারিয়াছে, সে-ই এই পথের সন্ধান দিতে তত বেশি সক্ষম। অন্ধ বাউলের মধ্য দিয়া নাট্যকার ইহাই নির্দেশ করিতে চাহেন। অন্ধ বাউলের চরিত্রগত কোন পরিচয় নাই, সে এই তত্ত্বের বাহন মাত্র।

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের নাটক 'ফাল্গুনী' ও কাব্যগ্রন্থ 'বলাকা' শুধু যে সমসাময়িক রচনা, তাহাই নহে—উভয়ের মধ্যে একই সমাজ-চৈতন্যের অভিব্যক্তির পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে। উভয়ের মধ্যে আমাদের এতদ্দেশের

তামসিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী ঘোষিত হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ প্রকৃতির সহায়তায়ই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্য বিষয় রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। এই নাটকের ঘটনার দৈন্য বিষয়ের গৌরব দ্বারা অনেকখানি পূর্ণ করা হইয়াছে।

'শ্রাবণ-গাথা'

রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ ঋতুনাট্য 'শ্রাবণ-গাথা' তাঁহার অন্যান্য ঋতুনাট্যগুলির রচনার যুগ অবসান হইবার বহু পরবর্তী কালে রচিত বলিয়া তাঁহার এই বিষয়ক অন্যান্য নাটকের সঙ্গে কোন প্রকার যোগসূত্রে আবদ্ধ নহে। ইহা ১৩৪১ সালে শ্রাবণ মাসে রচিত হয় এবং সেই মাসেই নৃত্যগীত সহযোগে শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনীত হয়। শান্তিনিকেতনে নৃত্যাভিনয় করিবার মুখ্য উদ্দেশ্যেই ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহার নৃত্যাভিনয়ের ভিতর দিয়াই রবীন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্যের যুগে উত্তীর্ণ হন; কারণ, 'শ্রাবণ-গাথা' রচনার দুই বৎসর পরই তিনি 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' রচনা করেন; ইহার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি আর কোন নাটক রচনা করেন নাই। অতএব 'শ্রাবণ-গাথা' ঋতুনাট্যই; রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী নাটকগুলির সঙ্গে পরবর্তী যুগের নৃত্যনাট্য-গুলির যোগসূত্র রচনা করিয়াছে। অতএব ইহাতে তাঁহার পূর্ববর্তী নাটিকা ও পরবর্তী নৃত্যনাট্য ইহাদের উভয়েরই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইবে।

'শ্রাবণ-গাথা' রসপ্রধান রচনা—ইহার মধ্যে তত্ত্বের লেশমাত্র নাই। শ্রাবণের রসপুষ্ট রূপটির প্রত্যক্ষ বন্দনাগীতিই এখানে শুনিতে পাওয়া যায়, এই বন্দনাও কোনও নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা পথ ধরিয়া অগ্রসর হয় নাই, ইহা শ্রাবণ-হাওয়ার মতই এলোমেলো। শ্রাবণের যে রূপটির পরিচয় এখানে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাহার ধারাবর্ষণের রূপ নহে—শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণের ভিতরও একটা বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির সুর আছে; কিন্তু শ্রাবণের যে রূপ কবি এখানে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা রসৈশ্বর্যময়—ইহা কখনও ভৈরব, কখনও স্নিগ্ধ; কখনও মিলনের আনন্দে ইহা অন্তর পূর্ণ করিয়া দেয়, কখনও আবার বিরহের আভাস জাগাইয়া দিয়া অন্তরের মধ্যে বেদনার স্পর্শ দান করে; তাহার সুরে কখনও বজ্রনাদ, আবার কখনও বংশীনাদ। ইহার মধ্যে যেমন প্রশান্তি, শুদ্ধতা ও 'জীবন-মরণের সম্মিলন' গান শুনিতে পাই, আবার তেমনই ইহার মধ্যে ব্যাকুলতা, মুখরতা ও বিচ্ছেদের কথাও আছে। সন্ধ্যারাত্রির ভৈরবানন্দের ভিতর দিয়া ইহার সূচনা, শেষরাত্রির 'রসদান-যজ্ঞে'র পূর্ণাহুতির রিক্ততায় ইহার সমাপ্তি, অকিঞ্চিৎকর নাট্যকাহনীর মধ্যে ইহাই ইহার এক-মাত্র নাট্যিক গতির নিদর্শন।

সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার ভিত্তির উপর এই নাটকটি রচিত হইয়াছে; ইহার চরিত্রের মধ্যে কেবল নটরাজ, রাজা ও সভাকবি; অন্যান্য চরিত্র কেবল নৃত্য ও সঙ্গীতের রূপ দিয়াছে। শ্রাবণের ভিতর দিয়া গ্রীষ্মের রিক্ত তপস্যা যে কি ভাবে শরতের পূর্ণতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের ভিতর দিয়া তাহাই দেখাইয়াছেন, কিন্তু ইহা তত্ত্বদর্শন নহে, ইহা রসোপলব্ধি মাত্র। রসোপলব্ধির অভিব্যক্তি হিসাবে এই নাটকখানি সার্থক হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক

ভারতীয় সাহিত্যে রূপকের ব্যবহার চিরদিন প্রচলিত থাকিলেও সঙ্কেতের ব্যবহার আধুনিক। অবশ্য সাহিত্যে সঙ্কেতের ব্যবহার না থাকিলেও ধর্মীয় এবং অন্যান্য বহুবিধ আচরণে সঙ্কেতের ব্যবহার এদেশে অপ্রচলিত নহে। ভারতীয় হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার মধ্যে রূপক এবং সঙ্কেত উভয়েরই ব্যবহার দেখা যায়। তাহাতে মনের কোন অমূর্ত ভাবকে যেমন বিশেষ কোন রূপের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হয়, তেমনই যে ভাবকে কোন রূপের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে না, তাহার বিষয়ে সঙ্কেতের ব্যবহার করা হয়। এই কথা সত্য, পৌত্তলিকতার মধ্যে সচেতন ভাবে যে এই সংস্কারকে অনুসরণ করিয়া আমরা চলি, তাহা নহে। এই বিষয়ে একটি সংস্কার গড়িয়া উঠে, তাহাকেই আমরা অনুসরণ করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়া যাই। ভারতীয় উপনিষদ এবং দর্শন এ কথা বার বার প্রচার করিয়াছে যে, ঈশ্বরকে কোন বিশেষ জাগতিক রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাহা সত্ত্বেও পৌরাণিক হিন্দুধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কে কোন সঙ্কেত ব্যবহারের পরিবর্তে তাহার একটি পরিপূর্ণ বিগ্রহ কল্পনা করিয়া আমরা উপাসনা করিয়া থাকি ; সুতরাং দার্শনিক চিন্তায় আমাদের মধ্যে সঙ্কেতের স্থান থাকিলেও প্রত্যক্ষ জীবনাচরণের মধ্যে আমরা তাহার প্রভাব অনুভব করিতে পারি না। সাহিত্যের মধ্যেও সেই সূত্রেই এদেশে সঙ্কেত ব্যবহারের রীতি প্রচার লাভ করিতে পারে নাই।

একথা সত্য, মানুষের জীবন প্রধানতঃ সঙ্কেত-নির্ভর। আমরা যে কথা বলি, তাহাও সঙ্কেত মাত্র। ভাব-প্রকাশের জন্য যে অঙ্গ ভঙ্গি করি, তাহাও সঙ্কেত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাহিত্য কেবলমাত্র সঙ্কেত-নির্ভর হইতে পারে না ; কারণ, কেবলমাত্র ভাবের প্রকাশ নহে, ভাবের সরস প্রকাশই সাহিত্য। বোবার ইঙ্গিত মাত্র সাহিত্য হইতে পারে না। সাহিত্যের মধ্যে কেবলমাত্র ভাষাই আবশ্যক নহে, ভাষার সুষ্ঠু প্রকাশও একান্ত আবশ্যক। নীরব কবি কথাটি যেমন অর্থহীন, সাঙ্কেতিক সাহিত্যও তেমনই। কারণ, টেলিগ্রাফের Code-এর ব্যবহারিক জীবনে যে মূল্যই থাকুক না কেন, তাহা দ্বারা সাহিত্য

সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং সাহিত্যে যে সাঙ্কেতিকতার কথা বলা হয়, আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্কেত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। অতএব এখানে ব্যবহারিক জীবন কিংবা ধর্মীয় আচার আচরণের সঙ্কেত ব্যবহারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় নাটকের প্রত্যক্ষতার গুণ সর্বাধিক সেইজন্য ইহাতেই সাঙ্কেতিকতা কিংবা রূপকের স্থান সর্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্রেও সাঙ্কেতিকতার ব্যবহার করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে কয়েকজন নাট্যকার কেবলমাত্র সাঙ্কেতিক নাটক লিখিয়াই যশস্বী হইয়াছেন। জাতির রস-চেতনায় যখন প্রত্যক্ষ জীবনবোধ লুপ্ত হইয়া যায়, তখনই তাহার নাট্য-সাহিত্যে নানা অপ্রত্যক্ষ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার সেই অভাব পূর্ণ করিবার প্রয়াস করা হয়। ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় যুগে জাতির জীবন-চেতনা যখন বলিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ ছিল, তখন তাহার মধ্যে সাঙ্কেতিক নাটক সৃষ্টি হইবার কোন অবকাশ পায় নাই; কিংবা এই বিষয়ে কোন চিন্তারও উদয় হইতে পারে নাই। কিন্তু জাতির জীবন হইতে ক্রমে যখন সেই চেতনা শিথিল হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল, প্রত্যক্ষ জীবনের রূপ অস্পষ্ট এবং তাহার বৈচিত্র্য হ্রাস পাইতে লাগিল, তখনই তাহার মধ্যে নানা অপ্রত্যক্ষ উপকরণ অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার প্রয়াস দেখা দিল। যে জাতির জীবনে কোনদিন শ্রেষ্ঠ বাস্তবধর্মী নাটক রচনা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই, সাঙ্কেতিক নাটক রচনার প্রয়াস তাহার মধ্যেই সর্বাধিক সা..ফল্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাঙ্কেতিক নাটক প্রকৃত নাটকের ধর্ম-বিরোধী, যাহার প্রত্যক্ষতার গুণ নাই, তাহা নাটক নহে, নাটকের বহির্মুখী আকার তাহার থাকিলেও আত্মার পরিচয়ে ইহা কাব্য কিংবা অন্য কিছু, কদাচ নাটক নহে। সেইজন্য প্রাচীন কিংবা আধুনিক ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে সাঙ্কেতিক নাটক রচনার রীতি ব্যাপক প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথই এই বিষয়ের প্রথম প্রবর্তক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও এই বিষয়ে যাহা করিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্ত্য সাঙ্কেতিক নাটকের সম্পূর্ণ অনুকরণ নহে, ইহাদের সঙ্গে রবীন্দ্র কবি-মানসের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। সেইজন্য স্বাধীন রচনা হিসাবে ইহাদের বিশেষ কোন স্থান নাই, রবীন্দ্র-সাধনার অখণ্ড সূত্রে ইহারা গ্রথিত। ইহাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে সাঙ্কেতিক নাটকের রূপ বিকাশ লাভ করিবার পরিবর্তে রবীন্দ্র-সাধনার ধারায়

একটি বিশেষ রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে মাত্র। রবীন্দ্র-মানসের সেই বিশেষ রূপটি কি, তাহাই এখানে বুঝিবার বিষয়। স্বাধীনভাবে রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞা বিশ্লেষণের বিষয় নহে।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে, ভারতীয় সাহিত্যে সাঙ্কেতিক নাট্যরচনার অভাব থাকিলেও রূপক নাটক রচনার কোনদিনই অভাব ছিল না। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে কৃষ্ণমিশ্র নামক একজন সংস্কৃত নাট্যকার 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নামক একখানি রূপক নাটক রচনা করেন। ইহাও সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের অধঃপতিত (decadent) যুগের রচনা। ইহার মধ্যে কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক ভাব, যথা বিবেক, মোহ, শম, দম, ক্ষমা ইত্যাদিকে কতকগুলি নাটকীয় চরিত্ররূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা আদর্শ রূপক নাটকের লক্ষণ। এমন কি, বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি যুগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও এই শ্রেণীর একখানি রূপক নাটক রচনা করেন। ইহার পরবর্তী কালে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই প্রকার নৈর্ব্যক্তিক কতকগুলি ভাবকে নাটকীয় চরিত্রের রূপ দিয়া কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। আধুনিক কাল পর্যন্তও বাংলা সাহিত্যে এই নাটক রচনার ধারা লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ যুগের কয়েকখানি নাটক রূপকাশ্রিত হইলেও এই প্রকার অবিমিশ্র রূপক চরিত্র অবলম্বন করিয়া কোন নাটকই তিনি রচনা করেন নাই। তাঁহার এই শ্রেণীর নাটকগুলির প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তাহা তাঁহার নিজস্ব। সুতরাং সেইদিক হইতেই ইহাদের বিচার করা আবশ্যক। কোন পাশ্চাত্ত্য কিংবা সংস্কৃত নাটকের সংজ্ঞা দ্বারা তাহা বিচার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনার ক্ষেত্রে প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ জীবন ও জগৎ এবং তারপর অতীত এবং কল্পনার জগৎ অতিক্রম করিয়া যখন 'গীতাঞ্জলি'র মধ্য দিয়া ক্রমে অধ্যাত্মলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন, তখন তাঁহার রূপক-সঙ্কেত নাটক রচনার যুগের সূত্রপাত হইল। এই যুগের ভূমিকা রূপে তিনি যে নাটকখানি সর্বপ্রথম রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'প্রায়শ্চিত্ত।' ইহার আলোচনা দিয়াই এই অধ্যায়ের সূচনা করা যাইবে।

'প্রায়শ্চিত্ত'

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম জীবনে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' অবলম্বন করিয়া 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। ইহার মধ্যে তিনি নূতন একটি চরিত্র সংযোগ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে রূপ দিবার প্রয়াস পান। ইতি-পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম জীবনে রচিত অন্যতম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজর্ষি' অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'বিসর্জন' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। রচনার দিক দিয়া 'রাজর্ষি' হইতে 'বিসর্জন' অনেক বিষয়েই উন্নততর হইয়াছিল; কিন্তু 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র বিষয়বস্তু অবলম্বন করা সত্ত্বেও ইহা স্বতন্ত্র প্রকৃতির রচনা বলিয়া অনুভূত হইবে। ইহার মধ্যে একটি নূতন যুগোপযোগী ভাবের অবতারণা করিয়া ইহাকে ঐতিহাসিক নাটকের পরিবর্তে রোমান্টিক নাটকের রূপ দেওয়া হইয়াছে। ইহার কাহিনী সংক্ষেপে এই প্রকার—

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য যুবরাজ উদয়াদিত্যকে মাধবপুর পরগণার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। পরদুঃখকাতর যুবরাজ দুর্গত প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে অসমর্থ বলিয়া প্রতাপাদিত্য তাঁহার নিকট হইতে উক্ত পরগণার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন। ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে মাধবপুরের প্রজাগণ যশোরে আসিয়া যুবরাজকে ফিরাইয়া লইতে চাহিল। প্রতাপ ধনঞ্জয়কে কারাগারে বন্দী করিলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহার বৃদ্ধ খুল্লতাত বসন্ত রায়কে বধ করিবার জন্য দুইজন পাঠান নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্য উদ্ধার হইল না, সরল হৃদয় বৃদ্ধকে বধ করিতে পাঠান অস্বীকৃত হইল। প্রতাপাদিত্যের কন্যার নাম বিভা, চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। রামচন্দ্র অপদার্থ লোক ছিলেন। জামাতা রামচন্দ্রের উপর প্রতাপাদিত্যের বিদ্বেষ ছিল, কন্যাকে পতিগৃহে যাইতে দিতেন না। বসন্ত রায়ের ইচ্ছায় রামচন্দ্র যশোরে নিমন্ত্রিত হইলেন, রামচন্দ্রের এক ভাঁড় প্রতাপের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রতাপের পত্নীর সঙ্গে রসিকতা করিবার অপরাধে প্রতাপ রামচন্দ্রকে বধ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। যুবরাজের কৌশলে যশোরের প্রাসাদ হইতে রামচন্দ্র কোনমতে পলাইয়া গিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। যুবরাজের পত্নীর নাম সুরমা, সুরমাও স্বামীর মত দয়াধর্মে দীক্ষিতা ছিলেন। এইজন্য প্রতাপ তাঁহার প্রতিও

বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে প্রাসাদ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য রাজমহিষীকে আদেশ দিলেন, রাজমহিষী তাঁহার এক পরিচারিকার সহায়তায় বিষ প্রয়োগ করিয়া সুরমার প্রাণনাশ করিলেন। মাধবপুরের প্রজাগণ প্রতাপের বিরুদ্ধে দিল্লীশ্বরের নিকট নালিশ করিতে গিয়া ধরা পড়িল। প্রজারা প্রতাপের পরিবর্তে উদয়কে রাজা করিতে চায়, এইজন্য প্রতাপ উদয়কে এই কার্যের জন্য দায়ী করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। বসন্ত কৌশলে উদয়কে কারাগার হইতে উদ্ধার করিলেন, ধনঞ্জয়ও এই সঙ্গে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিল। বসন্ত রায়ের উপর প্রতাপের ক্রোধ এইবার একেবারে দুর্জয়হ ইয়া উঠিল, তিনি এক অতি কৃতঘ্ন লোক নিযুক্ত করিয়া এইবার সহজেই দ্ধকে বধ করাইলেন। যুবরাজ পুনরায় বন্দী হইলেন। রাজার নিকট বিচারের জন্য নীত হইলে তিনি সিংহাসনের অধিকার পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন, তৎপূর্বে ভগিনী বিভাকে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী পৌছাইয়া দিতে চাহিলেন। রাজা সম্মত হইলেন ; কিন্তু বিভা যেদিন যুবরাজের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীর দ্বারে আসিয়া পৌছিল, সেইদিন রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। উদয় ও বিভা লক্ষ্যহীন হইয়া পথিমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ধনঞ্জয় বৈরাগীও আসিয়া পথে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত'কে ঐতিহাসিক নাটক বলিয়া নির্দেশ করিবার উপায় নাই। নাটকখানির 'বিজ্ঞাপনে' রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করিয়াছেন, 'মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতই হইয়াছে।' ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই পরিবর্তন সাধিত হয় নাই, বরং তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমই হইয়াছে, সেইজন্য যদিও নাট্যকার ইহাকে 'ঐতিহাসিক নাটক' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তথাপি আদর্শত ইহা তাঁহার এই যুগের অন্যান্য রোমান্টিক নাটক বা নাট্যকাব্যগুলিরই সমধর্মী, কিন্তু রচনার দিক দিয়া ইহা অন্যান্য নাট্যকাব্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকগুলির সমগোত্রীয়।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার যুগ শেষ হইয়া সবে মাত্র রূপক ও সাঙ্কেতিক নাট্যরচনার যুগের সূত্রপাত হইতেছে। ইহার এক বৎসর পূর্বেই তাঁহার 'শারদোৎসব' নাটক রচিত হইয়াছে ; যদিও

'শারদোৎসব' নাটক তাঁহার রূপক কিংবা সাঙ্কেতিক নাটক নহে, তথাপি ইহার মধ্যে দুই একটি এমন চরিত্রের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা তাঁহার পরবর্তী নাট্যরচনার যুগেই পূর্ণাঙ্গ রূপক-পরিচয় লাভ করিয়াছে। 'প্রায়শ্চিত্তে'র দুই একটি চরিত্রের মধ্যেও 'শারদোৎসব' নাটকের কোন কোন চরিত্রের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা ধনঞ্জয় বৈরাগী ও বসন্ত রায়। ধনঞ্জয় বৈরাগী 'শারদোৎসব'-এর ঠাকুরদাদার স্বদেশী সংস্করণ মাত্র, বসন্ত রায়ের মধ্যেও ঠাকুরদাদা এবং কবিশেখর উভয়েরই মিশ্র প্রভাব অনুভব করা যায়। 'প্রায়শ্চিত্ত' রূপক ও সাঙ্কেতিকতা বর্জিত সম্পূর্ণ বস্তুধর্মী নাটক মাত্র নহে। কেহ কেহ ইহার মধ্যেও অলোক-ধর্ম (mysticism) ও সাঙ্কেতিকতার (symbolism) সন্ধান পাইয়াছেন। ইহাকে রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক ও রূপক নাট্যরচনার যুগের ভূমিকারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৩১৬ সাল অর্থাৎ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনার বৎসর 'গীতাঞ্জলি'র অর্ধেকের কিছু বেশী গান রচিত হয়। ১৩১৭ সালে অর্থাৎ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনার পরের বৎসর 'গীতাঞ্জলি' রচনা সম্পূর্ণ হয়। অতএব ইহার অন্যতম চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগীর সঙ্গীতগুলি 'গীতাঞ্জলি'রই গান বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের রূপ 'গীতাঞ্জলি'র সুর ও ভাবের আবহ-মধ্যে পরিকল্পিত হইয়াছে।

এই নাটকের প্রধান ত্রুটি যেমন ইহার চরিত্র-পরিকল্পনায়, তেমনই ঘটনা-বিন্যাসেও ইহার ত্রুটি ইহার সংক্ষিপ্ততায়। এই দুইটি বিষয়ই একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। অত্যাচারী শাসকের প্রতিনিধিরূপে প্রতাপাদিত্যকে নাট্যকার চিত্রিত করিয়াছেন। এ চরিত্র-পরিকল্পনায় ইতিহাসের মর্যাদাই যে শুধু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা নহে—ইহার মধ্যে সর্বপ্রকার সঙ্গতি এবং স্বাভাবিকতাও নির্মমভাবে বলি দেওয়া হইয়াছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের প্রতাপাদিত্য রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনা 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটকের রাজা চরিত্রের পূর্বাভাস; ইহারাও নিষ্ঠুর, কিন্তু সত্যসন্ধানী। প্রতাপ তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে যে মানবিক পরিচয় আছে, প্রতাপাদিত্য চরিত্রে তাহার অভাব দেখা যায়। প্রতাপ যেন অত্যাচারের একটি প্রাণহীন যন্ত্রস্বরূপ, তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার মানবিক অনুভূতি নাই; বিশেষতঃ নাটকের নিতান্ত অনতিপ্রসর ক্ষেত্রে অধিকাংশ অত্যাচারের কারণগুলিই অস্পষ্ট রহিয়াছে বলিয়া তাহার প্রভাব পাঠকদের উপর কার্যকর হইতে পারে না। পুত্রবধূ সরমার সঙ্গে ব্যবহারে প্রতাপ যে আচরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার রাজোচিত

আভিজাত্যের অনুকূল নহে, বরং নিতান্ত নীচতার পরিচায়ক। এই নীচতা একেবারে গ্রাম্য স্তরের। ইংরেজি নাটকোক্ত অত্যাচারী স্বৈর-শাসকের চরিত্রের অনুকরণ করিতে গিয়া নাট্যকার এখানে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইয়াছেন। তাঁহার কথায় কথায় 'ছিন্ন মুণ্ড চাই' নাটকের সমগ্র পরিবেশের মধ্যে নিবিড় যোগ স্থাপন করিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে প্রতাপের সঙ্গে তাঁহার মহিষীর সম্পর্কের পরিচয়টি অত্যন্ত বাস্তব হইয়াছে। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে চরিত্রগত যে বৈপরীত্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা উচ্চ নাটকীয় গুণ সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয় নাই। রাজা সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের অলোক-বিশ্বাসের মধ্যে যে দুইটি শক্তি আছে, তাহাদের একটি অবিমিশ্রভাবে প্রতাপের চরিত্রের মধ্যে রূপ লাভ করিয়াছে—তাহা তাঁহার নিষ্ঠুরতার শক্তি। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'র মধ্যে যে শক্তি আছে, তাহা যখন স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, তখন নিষ্ঠুরতার পরিচয় লাভ করে, সেই শক্তিই পুনরায় করুণায় বিগলিত হইয়া অমৃতের সন্ধান দেয়। প্রতাপ রাজার সেই নিষ্ঠুর শক্তির প্রতিনিধি। ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে পিতৃব্য বসন্ত রায়ের হত্যা বিষয়ক যে তথ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই প্রতাপকে তিনি নিষ্ঠুর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। এই নাটকের অন্যান্য বিষয় অনৈতিহাসিক এবং রোমাণ্টিক ধর্মী।

তবে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রটির মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এই চরিত্রটি উপন্যাসে নাই, নাটকে নূতন। ধনঞ্জয় বিদ্রোহী প্রজাদিগের নায়ক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহার নির্ভীক অভিযান, অত্যাচারীর মুখের সম্মুখে সত্য ভাষণের দুঃসাহস, নির্যাতনের মধ্যেও তাহার অনির্বাণ সত্যনিষ্ঠা, তাহার চরিত্রকে এক অপূর্ব গৌরব দান করিয়াছে। তবে তাহার চরিত্র আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত; সেইজন্য ইহা নাট্যকাহিনীর বাস্তব পরিবেশের মধ্যে সহজ সংযোগ স্থাপন করিয়া উঠিতে পারে নাই—সমগ্র পরিবেশের মধ্যে ইহা যেন একটি বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি বলিয়া বোধ হয়। এই ধনঞ্জয়ই মাহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিমূর্তি। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের বসন্ত রায়ের চরিত্রটিই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকে ঠাকুরদা চরিত্রের রূপ লাভ করিয়াছে। ধনঞ্জয় রূপক চরিত্র রূপে অনুরূপ প্রায় সকল নাটকের মধ্যেই স্থান লাভ করিয়াছে।

এই নাটকে রাজকন্যা বিভা ও রাজ-জামাতা রামচন্দ্রের যে দুইটি চরিত্র

আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের সুচতুর শিল্পদৃষ্টির গুণে অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহাদের পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সংযত রাখিয়া বাস্তব দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়াছেন, সেইজন্যই ইহাদের মধ্য দিয়া নাটকীয় গুণের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিভা চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের বিবাহিতা; কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে রামচন্দ্রের রাজ্য-সংক্রান্ত বিবাদ সৃষ্টির ফলে সে পিতৃগৃহেই বাস করিতেছে, পতিগৃহে যাইতে পারে নাই। রামচন্দ্র নিজের অপমান স্বীকার করিয়া প্রতাপাদিত্যের গৃহ হইতে নিজের পত্নীকে লইতে আসিতে পারেন নাই। কিন্তু বিভার প্রতি তাঁহার যথার্থ প্রেমের কোনদিনই অভাব ছিল না। বিভাও স্বামিপ্রেমে বিশ্বাসিনী ছিলেন, সেই জন্য স্বামীকে অপমান স্বীকার করিয়া তাহার পিতৃগৃহ হইতে লইয়া যাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিভা বসন্ত রায়ের নিকট বলিতেছেন, 'তিনি যে মানী, তাঁর অপমান কেন হবে?' স্বামীর প্রেমে বিশ্বাসিনী বলিয়াই তাঁহাব অমর্যাদা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু বসন্ত রায়ের আমন্ত্রণে রামচন্দ্র শ্বশুর প্রতাপাদিত্যের গৃহে আসিতে সম্মত হইলেন, বিভার প্রতি সুগভীর প্রেমবশতই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার প্রতি এই নতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন, বিভার প্রেমের নিকট আত্মমর্যাদা জলাঞ্জলি দিলেন। নিষ্ঠুর প্রতাপ যেন রামচন্দ্রের উপর তাঁহার আক্রোশের প্রতিশোধ লইবার একটি পরম সুযোগ পাইলেন। রামচন্দ্রের এক ভাঁড় তাঁহার মহিষীর অপমান করিয়াছে এই বলিয়া রামচন্দ্রের ছিন্নমুণ্ড আনিবার আদেশ দিলেন। রামচন্দ্র পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন, কিন্তু ইহাতেও বিভার প্রতি তাঁহার প্রেম অক্ষুণ্ণ রহিল।

বিভার মধ্যে সুকঠিন অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল, স্বামীর অমর্যাদা ও পিতার নিষ্ঠুরতায় তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল,—বুঝি জীবনের সকল শক্তি হারাইয়া যায়। তাঁহার নিরাশ্রিত জীবনে ভ্রাতা উদয়াদিত্য এবং তাঁহার পত্নী সুরমার স্নেহই ছিল একমাত্র অবলম্বন। নিষ্ঠুর পিতা উদয়াদিত্যকে বন্দী করিলেন, বিষপ্রয়োগে প্ররোচিত করিয়া সুরমাকেও হত্যা করিলেন। বন্দী রাজপুত্রের সেবাশুশ্রূষার মধ্যে বিভা তাঁহার জীবনের সকল দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে চাহিলেন। এমন সময় রামচন্দ্রের নিকট হইতে তাঁহার আবার ডাক আসিল। বন্দী রাজপুত্রকে সেই মুহূর্তেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়া নীচ স্বার্থপরের মত তিনি সেদিন স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে পারিলেন না।

একমাত্র এই ঘটনাটির দ্বারা বিভার জীবনের করুণ পরিণতি অনিবার্য হইয়া উঠিল। সুতরাং ইহার স্বাভাবিকতা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। রামচন্দ্রের প্রতি বিভার প্রেম যেমন সত্য ছিল, ভ্রাতা উদয়াদিত্যের প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা তেমনই সত্য ছিল। কিন্তু নারীর জীবনে প্রেমের শক্তি বেশি, না শ্রদ্ধার শক্তি বেশি? এ কথা সকলেই বলিবেন যে, প্রেমেরই শক্তি বেশি। সুতরাং যে মুহূর্তে বিভা রামচন্দ্রের নিকট হইতে আহ্বান পাইয়াছে, সেই মুহূর্তে তাঁহার বন্দী ভ্রাতার প্রতি সকল কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া তাহারই ডাকে তাহার সাড়া দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই এ কথা বলিয়াছেন যে, প্রেম কখনও একান্ত স্বার্থপরতা দ্বারা সঙ্কীর্ণ হইতে পারে না, তাহা হইলে সেই প্রেমে কল্যাণ নাই। বিভার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কল্যাণী নারীশক্তিরই সন্ধান করিয়াছেন; সেইজন্য তাহার প্রেমের মধ্যে কর্তব্য বিষয়ে অন্ধতার প্রশ্রয় দিতে পারেন নাই। সুতরাং চন্দ্রদ্বীপের লোক তাহাকে ভুল বুঝিল, কিন্তু তাহাতে রামচন্দ্রের বিশ্বাস শিথিল হইল না; তিনি তথাপি বিভার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, সামান্য ভাঁড়ের সম্মুখেও নিজের চক্ষুলজ্জা রক্ষা করিতে সতর্ক হইয়া পড়েন; সুতরাং কেবলমাত্র পারিষদদিগের কথায় শেষ পর্যন্ত তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। এমন কি, বরবেশে যাত্রা করিবার মুহূর্তেও বিভার কথাই বারবার ভাবিতেছিলেন, যদি সে এখনও ফিরিয়া আসে, তবে তাঁহার জীবন সার্থক হয়! সেনাপতির নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতে গিয়া তিনি বলেন, 'ভাঁড় রমাইয়ের হাসি আমার ভাল লাগছে না,...আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, উঠে চলে যাই, গান বাজনা ভালো জমছে না, ফার্নাণ্ডিজ!'

রবীন্দ্রনাথ রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হইলেও কোন রাজার চরিত্রকেই তাঁহার নাটকের মধ্যে যথাযথ তাঁহার অভিজাত পরিচয় অনুযায়ী চিত্রিত করিতে পারেন নাই। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের চরিত্রকেও তাহার অভিজাত-পরিচয়োচিত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই বিভার জীবনের পরিণতি এত করুণ হইয়া উঠিল। যে নিজের ভাঁড়কে পর্যন্ত ভয় পায়, সে কি বলিবে, সেই ভয়ে নিজের কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হয়, সে আর যাহাই হউক, রাজা হইবার যোগ্য নহে। রামচন্দ্র শক্তিমান্ রাজা নহে, এই নাটকে সকল শক্তি দিয়া নাট্যকার কেবলমাত্র প্রতাপাদিত্যকেই গড়িয়াছেন, রাজা বসন্ত রায় কিংবা রাজা রামচন্দ্রের জন্য এতটুকু শক্তিও অবশিষ্ট রাখেন নাই। সেইজন্য প্রতাপাদিত্যের

যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এই নাটকে নাই, রাজা বসন্ত রায় ভক্তের এবং রাজা রামচন্দ্র ভীরু প্রেমিকের প্রতিনিধি। এমন কি, যে প্রেম আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে, সেই প্রেমের স্পর্শও রামচন্দ্রের মধ্যে নাই। সুতরাং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির প্রেমও অর্থহীন। সেইজন্য বিভার জীবনে রামচন্দ্রের প্রেম কোন কাজে আসিল না। বিভার জীবনের ইহাই অভিশাপ।

কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া উদয়াদিত্য বিভাকে চন্দ্রদ্বীপে তাঁহার স্বামিগৃহে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্র তাহা জানিতেন না। তবে রাজ্যে এ বিষয়ে গুজব রটিল, রাজ্যের রাণী এবার নিজেই আসিতেছেন। রামচন্দ্রও গুজবটা শুনিলেন। তিনি আশা করিলেন, 'গুজবটা কি সত্যি?' সেনাপতি অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, নিজের দিক হইতে রামচন্দ্রের এই বিষয়ে কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন রাজা আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, 'তা হলে কিন্তু, মন্ত্রী রমাই সবাই হাসবে।' কিন্তু তিনি এ' কথাও সেনাপতির নিকট অকপটে স্বীকার করিতেছেন, 'আমি তোমাকে গোপনে বলছি, কাউকে বলো না, আমি তাকে কিছুতে ভুলতে পাচ্ছিনে। কালই রাত্রে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি।' রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল নাটকেই ইতিহাসের রাজার পরিবর্তে মনের রাজা গড়িয়াছেন; সেইজন্য তাঁহারা রাজার পরিচয় লইয়াও সাধারণ মানুষ মাত্র। সুকঠিন ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করিবার পরিবর্তে তাহাদের চরিত্রের ভিতর দিয়া সংশয়, দ্বন্দ্ব এবং অবিশ্বাসই প্রকাশ পায়। প্রতাপাদিত্য তাহার একটি ব্যতিক্রম হইলেও রামচন্দ্রই ইহার সাধারণ প্রতিনিধি। মিতভাষণ এবং সংযত আচরণের ভিতর দিয়া রামচন্দ্রের চরিত্রটি অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটির সর্বপ্রধান বিশেষত্ব ইহার সংক্ষিপ্ততা। এইগুণে ইহা তাঁহার অন্যান্য রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের সমধর্মী। তবে ইহা অতি-নাট্যের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ইহার এই সংক্ষিপ্ততা একটি বিশেষ ত্রুটি বলিয়া মনে হয়। ইহা হত্যা, বিষপ্রয়োগ, ষড়যন্ত্র, অগ্নিদাহ, দুঃসাহসিক পলায়ন ইত্যাদি বহু লোমহর্ষক ঘটনা-সঙ্কুল হইলেও, ইহার রচনার ক্ষেত্র এত অপরিসর যে, ঘটনাগুলির সম্যক্ বিকাশ ইহাতে সম্ভব হয় নাই। নাটকটি পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ, তথাপি প্রত্যেক অঙ্কের অন্তর্গত ইহার দৃশ্যগুলি এত সংক্ষিপ্ত যে, ইহা দ্বারা অভিনয় কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। নাটকটি 'প্রায়শ্চিত্ত' নাম-

করণেরও বিশেষ কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার ভাষাও নাট্যোপযোগী নহে। ইহা গদ্যে রচিত। নাট্যকাব্য রচনার যুগে ইহার পূর্ববর্তী নাট্যরচনা 'শারদোৎসব' এবং 'মুকুট'ও গদ্যেই রচিত হইয়াছিল, সমসাময়িক কাল রবীন্দ্রনাথের প্রধানতঃ গদ্য রচনারই কাল; কিন্তু 'প্রায়শ্চিত্তে'-র ভাষা সমসাময়িক অন্যান্য গদ্যরচনা অপেক্ষা অনেক শক্তিহীন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এত নিকৃষ্ট গদ্যরচনার নিদর্শন বোধহয় আর নাই। ভাব ও ভাষায় এই নাটকের মধ্যে যে দৈন্য দেখা দিয়াছে, তাহার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সেই যুগের নাট্য-প্রতিভার অবসান হইয়াছে এবং এক সম্পূর্ণ নূতন আদর্শের মধ্য দিয়া পরবর্তী যুগের নবজন্ম সূচিত হইয়াছে। এই নাটকখানির ত্রুটি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথকেই সর্বাপেক্ষা পীড়া দিয়াছিল; সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অবলম্বন করিয়া তিনি ইহার পরবর্তী কালে ক্রমান্বয়ে দুইখানি নাটক রচনা করেন, একখানি রূপক ও সাঙ্কেতিক নাট্য রচনার যুগের 'মুক্তধারা' ও অপরখানি তাহারও পরবর্তী যুগের 'পরিত্রাণ' (১৯২৯)। রচনা ও ভাবগত বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া 'মুক্তধারা'র যথাস্থানে স্বতন্ত্র আলোচনাও করা হইয়াছে।

'রাজা'

পূর্বেই বলিয়াছি, 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনার পরই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায় 'গীতাঞ্জলি'র যুগের সূচনা হয়। এই যুগেই তাঁহার দুইখানি পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাটক রচিত হয়—'রাজা' ও 'ডাকঘর'। সাঙ্কেতিক নাটক ও রূপক নাটকের মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা অনেকেই অনুভব করিতে না পারিয়া রবীন্দ্রনাথের এই নাটক দুইখানিকেও অনেক সময় রূপক নাটক বলিয়াই ভুল করিয়া থাকেন। সেইজন্য রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের পার্থক্য সম্বন্ধে প্রথমেই দুই একটি কথা এখানে বলিয়া লওয়া প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি।

রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের সুস্পষ্ট পার্থক্য সম্বন্ধে W. B. Yeats তাঁহার *Ideas of Good and Evil* নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতে পারা যায়; তিনি লিখিয়াছেন, 'A symbol is indeed the possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame, while allegory is one of many possible representations of an embodied thing, or familiar principle, and belongs to fancy, and not to imagination; the one is revelation, the other an amusement.'

Symbolic কথাটিকেই বাংলায় সাঙ্কেতিক বলিয়া অনুবাদ করা হয়। যাহার কোন রূপ নাই, কেবল মাত্র অনুভূতিতেই যাহার অবস্থান, তাহার রস নিজে অনুভব করা সম্ভব হইলেও অন্যকে যখন তাহা অনুভব করাইবার প্রয়োজন হয়, তখনই সঙ্কেত বা ইঙ্গিতের সাহায্য গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয়; সেই বিষয়বস্তু লইয়া যে নাটক রচিত হয়, তাহাই সাঙ্কেতিক নাটক। ইহার মূল চরিত্রগুলি নিরবয়ব অনুভূতি-সাপেক্ষ, কোনও রূপের ভিতর দিয়া ইহাদিগকে প্রকাশ করা যায় না, করিলে ইহাদের গৌরব রক্ষা পায় না; সেইজন্য কেবল মাত্র আভাস, ইঙ্গিত ও সঙ্কেতের সাহায্যে তাহাদের পরিচয় দিতে হয়। 'রাজা' ও 'ডাকঘরে'র মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পূর্ণ-মাত্রায় রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু রূপক নাটকের পরিচয় স্বতন্ত্র। কোন বস্তু কিংবা ভাব যখন স্বতন্ত্র কোন বস্তু বা রূপ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, তখনই

তাঁহা রূপক বা allegory-র সংজ্ঞা লাভ করে। এই অনুসারে যে-কোন প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বস্তু যেমন যে-কোন স্বতন্ত্র রূপ লাভ করিতে পারে, তেমনই যে-কোন নৈর্ব্যক্তিক ভাবও—যেমন ভক্তি, দয়া, বিবেক, ধর্ম প্রভৃতি—ব্যক্তিরূপ লাভ করিতে পারে। অতএব দেখা যাইবে, যদিও সাঙ্কেতিক নাটক এ'দেশে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম রচনা করেন, রূপক নাটক রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও বাংলা সাহিত্যে রচিত হইয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকের রস তাঁহার অন্যান্য রচনার মতই তাঁহারই নিজস্ব সৃষ্টি।

'গীতাঞ্জলি'র যুগের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সাঙ্কেতিক নাটকই 'রাজা'। ১৩১৭ সালের শ্রাবণ মাসে 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরই পৌষমাসে 'রাজা' প্রকাশিত হয়। 'রাজা' প্রকৃতপ[illegible]াঞ্জলি'রই নাট্যরূপ মাত্র। 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, 'রাজা'র মধ্যেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার কাহিনীভাগ একটি বৌদ্ধ আখ্যান হইতে গৃহীত হইলেও, রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব কল্পনার স্পর্শ দান করিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ নূতন রূপে গড়িয়া লইয়াছেন। নাটকের কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ,—

রাজ্যে সেদিন বসন্তোৎসব। প্রজারা উৎসব দেখিতে আসিয়াছে, দেশান্তরের রাজাগণও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু যে-রাজ্যে তাহারা অতিথি, সে রাজ্যের রাজারই দেখা নাই। তিনি প্রকাশ্যে কখনও দেখা দেন না। এই লইয়া অভ্যাগতেরা নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া এক ব্যক্তি বহুমূল্য রাজপোষাক ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নিজেকে রাজা বলিয়া প্রচার করিল। তাহার সুন্দর কান্তি ও ভূষণের ঐশ্বর্য দেখিয়া জনসাধারণ তাহাকেই রাজা বলিয়া মনে করিল; কাঞ্চীরাজ তাহার কপটতা ধরিয়া ফেলিলেন, তবে তাহাকে দিয়া অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ভাবিয়া তাহাকে হাতে রাখিলেন। রাণী সুদর্শনা রাজাকে চোখে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; অন্ধকার ঘরে তাঁহার সঙ্গে রাজার নিত্য সাক্ষাৎ হয়, অন্ধকারের মধ্যে তিনি তাঁহার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না; সেইজন্য তাঁহাকে বাহিরে দশজনের মধ্যে দেখিতে চাহিলেন; রাজার কাছে সুদর্শনা এই প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা অগত্যা তাহাতেই সম্মতি দিলেন; কিন্তু বলিয়া দিলেন, উৎসবের মধ্যে বহু লোকের মাঝখান হইতে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে হইবে, কেহ তাঁহার পরিচয় তাহাকে বলিয়া দিবে না। প্রাসাদ-শিখর হইতে উৎসব-ক্ষেত্রে সুদর্শনা ভণ্ড রাজাকে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং তাহাকেই

রাজা বলিয়া মনে করিলেন। সহচরীর হাত দিয়া তিনি তাহার নিকট উপহার পাঠাইলেন, কাঞ্চীরাজ ভণ্ড রাজার কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া সেই সহচরীর হস্তেই সুদর্শনার নিকট প্রত্যুপহার পাঠাইলেন। সুদর্শনা সেই মালা লইয়া গলায় পরিলেন। কাঞ্চীরাজ রাজবেশীর সহায়তায় সুদর্শনার দর্শন লাভ করিতে চাহেন, এই উদ্দেশ্যে উভয়ে রাণীর অন্তঃপুরের উপবনে প্রবেশ করিলেন। সুদর্শনাকে প্রাসাদ হইতে বাহিরে আনিবার জন্য তিনি প্রাসাদের এক কোণে আগুন লাগাইয়া দিলেন, দেখিতে দেখিতে আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, লোকজন ভয়ে চারিদিকে পলাইতে লাগিল। কাঞ্চীরাজ এবং ভণ্ডরাজও প্রাণরক্ষার জন্য পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিলেন; এমন সময় বিপন্না রাণী আসিয়া ভণ্ড রাজাকেই তাঁহার রাজা মনে করিয়া তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, ভণ্ড রাজা নিজের পরিচয় দিয়া কহিল, সে রাজা নহে এবং তাহার নিজেকেই রক্ষা করিবার সাধ্য নাই। শুনিয়া রাণী লজ্জায় মরিয়া গেলেন। সুদর্শনা অন্ধকার ঘরে গিয়া আশ্রয় লইলেন, তাঁহার রাজা তাঁহাকে রক্ষা করিলেন; কিন্তু মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া অনুতাপে তিনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এই অনুশোচনায় তিনি নিজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া আসিলেন। ক্রুদ্ধ পিতা তাঁহাকে দিয়া দাসীবৃত্তি করাইতে লাগিলেন। তাঁহার অসহায় অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য দেশান্তরের রাজগণ আসিয়া তাঁহার পিতৃরাজ্য আক্রমণ করিলেন। সুদর্শনার পিতা বন্দী হইলেন। আক্রমণকারী রাজগণ স্থির করিলেন, সুদর্শনা স্বয়ংবরা হইবেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে যাঁহাকে ইচ্ছা বরণ করিয়া লইবেন। স্বয়ংবর সভায় রাজগণ সমবেত হইয়াছেন, এমন সময় রাজা সসৈন্যে আসিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করিলেন। সকলে পলাইল, এক কাঞ্চীরাজ যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেন। কাঞ্চীরাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া পথে পথে তাঁহার বিজয়ীর সন্ধান করিতে বাহির হইলেন। সুদর্শনাও রাজাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন, দীর্ঘকাল দুঃসহ প্রতীক্ষার পর তাঁহাকে সন্ধান করিয়া লইবার জন্য পথে বাহির হইলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া পুনরায় নিজের প্রাসাদের অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাজা এইবার অন্ধকার ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বাহিরের আলোকের রাজ্যে তাঁহাকে পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধসাহিত্যের অন্তর্গত জাতক গ্রন্থের 'কুশজাতক' এবং 'মহাবস্তু অবদানে'র 'কুশ জাতকে'র কাহিনী অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'রাজা' নাটক রচনা করিয়াছেন, কাহিনী দুইটিও পূর্বে আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করিয়াছি (ভূমিকা, পৃঃ ৭১-৭৫)। এখানে তাহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর সঙ্গে বৌদ্ধ কাহিনী দুইটির তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে।

জাতকের কাহিনী প্রধানতঃ ধর্মপ্রচারমূলক এবং অনেক ক্ষেত্রেই অলৌকিকতা দ্বারা প্রভাবান্বিত। কিন্তু এ'কথা সত্য, কুশজাতকের কাহিনীর মধ্যে ধর্মকথাই হউক, অলৌকিকতাই হউক, কোনটিই মুখ্যস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। জাতকের কাহিনীতে কুশরাজার সাত রাজাকে একাই পরাজিত করা এবং দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগ্রহে কুৎসিৎ আকৃতির পরিবর্তন করিয়া দিব্যরূপ লাভ করার বৃত্তান্ত মাত্র অলৌকিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

জাতকের কাহিনীতে দেখা যায়, কুশকুমার যৌবনে মদ্ররাজের যুবতী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু নাটকের কাহিনীতে রাজা সুদর্শনাকে তাহার কোন শৈশবে যে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা রাণী স্মরণ করিয়াও বলিতে পারিতেছেন না। জাতকের কুশকুমার রক্তমাংসের বাস্তব চরিত্র, রাজা নাটকের রাজা-চরিত্র সম্পূর্ণ অলোক-চারী বলিয়াই সুদর্শনার তাঁহাকে চোখে দেখিবার বাসনা কিছুতেই পূর্ণ হইতে পারে না।

জাতকের কাহিনীতে রাত্রির অন্ধকারে এবং অবদানের কাহিনীতে জ্যোতিঃহীন গর্ভগৃহে রাজা ও রাণীর সাক্ষাৎ হয়, 'রাজা' নাটকে তাহারই ইঙ্গিতটুকু অনুসরণ করিয়া 'অন্ধকার ঘরে' রাজা ও রাণীর সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বৌদ্ধকাহিনীর রাজা কুশকুমার প্রবল পরাক্রমশালী রাজা, তাহার শক্তি, ঐশ্বর্য কিছুরই অভাব নাই, একমাত্র অভাব তাহার দৈহিক রূপের, সেইজন্যই রাণীর নিকট হইতে তিনি আত্মগোপন করিয়া থাকেন। 'রাজা' নাটকের রাজাও রাণী সুদর্শনার নিকট অদৃশ্য হইয়া আছেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অন্য কারণে। এই রাজারও বীর্য, পরাক্রম এবং ঐশ্বর্যের অভাব নাই, তাহারও সুদর্শনার প্রতি প্রেম সত্য, কিন্তু তাহা কোন বিশেষ রূপের মধ্যে বিধৃত নহে। বৌদ্ধসাহিত্যের কুশকুমার বীর্য পরাক্রম ঐশ্বর্যের মূর্ত বিগ্রহ, কিন্তু 'রাজা' নাটকের রাজা ভাব-পরিকল্পনা মাত্র, তাহার কোন মূর্ত পরিচয় নাই।

বৌদ্ধ কাহিনীর কিংবা সুদর্শনার মত 'রাজা'র নায়িকা সুদর্শনাও অনিন্দ্য-সুন্দরী। বৌদ্ধ কাহিনীর কুব্জা রবীন্দ্রনাথের নাটকে অতি সহজেই সুরঙ্গমাতে পরিণত হইয়াছে। সুরঙ্গমা নামটিও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পরিকল্পিত। বৌদ্ধ-কাহিনীর রাজমাতা শীলবতী এবং অলিন্দা ইহারা উভয়েই কতকটা রবীন্দ্রনাথের নাটকে সুরঙ্গমার অংশেও অভিনয় করিয়াছেন। একমাত্র সুরঙ্গমা চরিত্রের মধ্য দিয়াই রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ কাহিনীর তিনটি চরিত্র যথা, শীলবতী, অলিন্দা এবং কুব্জার রূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

বৌদ্ধ কাহিনীতে দেখা যায়, বসন্তোৎসবের দিনে করভোদ্যানে চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তখন রাণী সেই প্রদীপ্ত অগ্নির আলোকে রাজা কুশকুমারের কুৎসিৎ রূপ প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন। 'রাজা' নাটকে একই অবস্থার মধ্যে সুদর্শনা মুহূর্তের জন্য যেন রাজার রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কালো, কালো। আমার মনে হয়, ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে, সেই আকাশের মতো কালো, ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো।' বৌদ্ধ কাহিনীতে রাজার যে রূপ বিশেষ একটি চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ অবলম্বন করিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র।

বৌদ্ধ কাহিনীতে রাণী রাজার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া যখন পিতৃগৃহে চলিয়া আসিলেন, তখন সাত জন রাজা প্রত্যেকেই তাঁহাকে লাভ করিবার আশায় তাহার পিতৃরাজ্য আক্রমণ করিলেন; নিরুপায় মদ্ররাজ নিজের কন্যাকে সাত খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও সুদর্শনার সংলাপের মধ্য দিয়া তাহার পিতার এই সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 'যুদ্ধে যাবার পূর্বে বাবা এসে বল্লেন, তুই একজনের হাত থেকে ছেড়ে এসে আজ সাতজনকে টেনে আনলি—ইচ্ছে কচ্ছে তোকে সাত টুকরো ক'রে ওদের সাতজনের মধ্যে ভাগ করে দিই।' বৌদ্ধকাহিনীতে রাজা কুশকুমার সাত রাজাকে পরাজিত করিয়া তাহাদের হস্তে সুদর্শনার সাত ভগ্নীকে সমর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকে কাঞ্চী রাজাকে পুরস্কৃত করিয়া অন্য রাজাদিগের দণ্ড-বিধান করিয়াছেন। কাঞ্চীরাজাকে পুরস্কৃত করিবার কারণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিয়াছি।

বৌদ্ধকাহিনীতে কুশরাজ যে বীণা হাতে করিয়া সুদর্শনার পিতৃরাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাহার উল্লেখ আছে।

'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্ট চরিত্র ঠাকুরদা। সুরঙ্গমাকে কবির নিজস্ব সৃষ্টি বলিতে পারা যায় না। যদিও ইহার নামটি নাটকে নূতন, তথাপি ইহা যে লীলাবতী এবং কুব্জার মিশ্র প্রভাবের ফলে পরিকল্পিত তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

বৌদ্ধকাহিনীর কুশকুমার চরিত্র হইতেই রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের রাজা চরিত্রের পরিকল্পনা করা হইলেও, এ'কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রাজা চরিত্রকে যে বিশেষত্ব দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজস্ব প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর অনুভব করা যায়। বৌদ্ধ কাহিনীর কুশকুমার পার্থিব চরিত্র, তাহার মধ্যে স্বাভাবিক নরনারীর কামনা-বাসনার স্পর্শ রহিয়াছে, তাহার আচরণ তাহা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কুশকুমাররূপী বোধিসত্ত্বের চরিত্রের মধ্য হইতে সকল পার্থিব মালিন্য দূর করিয়া তাহাকে অপার্থিব লোকে উত্তীর্ণ করিয়া লইয়াছেন। বাস্তবধর্মী নাটকের পক্ষে চরিত্রের এই অপার্থিব পরিচয় ক্রটিজনক হইলেও রূপক-সঙ্কেতধর্মী নাটকের মধ্যে ইহার স্থান অযৌক্তিক বলিয়া নির্দেশ করা যায় না।

পরম বীর্যবান্ পুরুষ নারীরূপের মোহাবিষ্ট হইলে কি প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকে, বৌদ্ধকাহিনীর এই নীতিকথা প্রচারই উদ্দেশ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাহিনী এই নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন সাধারণ নীতিকথা প্রচারের অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে, রাজা চরিত্রের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপার্থিব ঈশ্বরবোধের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন।

পরবর্তী কালে এই নাটকটির একটি অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভূমিকায় ইহার তাৎপর্য সম্বন্ধে যাহা নিজে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; তিনি এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের নাম দিয়াছিলেন 'অরূপ রতন'। তিনি ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

'সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজনখ্যাতি, সেইখানেই সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন, সেখানে

তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না; নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায়, তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ' কথা মানিল না, সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাঁধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু কোনো বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়, এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।'

'গীতাঞ্জলি'র পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'খেয়া' (১৩১৩)-র যুগ হইতেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'রাজা' সম্পর্কিত একটি অলোক-বিশ্বাস (mystic conception) জন্ম লাভ করে। 'গীতাঞ্জলি'র মধ্য দিয়া নানা ভাবে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়, অতঃপর 'রাজা' নাটকের মধ্যে তাহার পূর্ণতর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ধারা এখানেই শেষ হয় নাই, নাটকের মধ্য দিয়া ইহা সাঙ্কেতিক নাটক 'ডাকঘর' অতিক্রম করিয়া পরবর্তী নাটক 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী' পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং কাব্যের ক্ষেত্রে 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'র ভিতর দিয়া তাহা 'বলাকা'র পূর্ববর্তী যুগে আসিয়া একে..র সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'খেয়া' হইতে আরম্ভ করিয়া 'গীতালি' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার মধ্যে যে অলোক-ধর্মের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার এই যুগের নাটকগুলির মধ্যেও পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 'খেয়া'র 'শুভক্ষণ' কবিতার এই শেষ পংক্তিটিই 'রাজা' নাটকের মূল প্রেরণা দান করিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে,

ওরে, দুয়ার খুলে দে রে, বাজা শঙ্খ বাজা,
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা!
বজ্র ডাকে শূন্যতলে বিদ্যুতের ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এ'লো দুঃখ দিনের রাজা।

'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'রাজা' কথাটিকে তিনি যে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এই নাটকের মধ্যেও তাহার সেই অর্থ ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে; 'রাজা' শব্দটির তিনি নিজে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, প্রভু। এই 'প্রভু'ই 'গীতাঞ্জলি'র এক অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ ভগবান্। দুঃখের মধ্য দিয়া তাঁহার সঙ্গে অন্তরের পরিচয় নিবিড়তম হইয়া উঠে। বহির্জগতের সব কিছুর মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রকাশ, তিনি দেশে কালে ও রূপে অখণ্ডনীয়, তাঁহার উপলব্ধি সত্যের উপলব্ধি, তাঁহার আশ্রয় সত্যের আশ্রয়, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন নানা মিথ্যার জঞ্জাল চারিদিক দিয়া জড়াইয়া ধরে, বিশেষ কোন রূপের মধ্যে তাঁহাকে সন্ধান করিতে গেলে তাঁহাকে ত পাওয়া যায়ই না, বরং সংসারের নানা চোখ-ভুলানো জিনিসে অসত্যের পথে বিভ্রান্ত হইতে হয়। অতএব তাঁহার লক্ষ্যই জীবনে একমাত্র সত্যের লক্ষ্য, আর সব কিছুই মিথ্যার ছলনা। 'গীতাঞ্জলি'তে এই ভগবানের প্রতি বিশ্বাস, নির্ভরশীলতা এবং আত্ম-নিবেদনের মধ্যে যে তৃপ্তি এবং আনন্দের পরিচয় আছে, এই নাটকের দুইটি চরিত্রের মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে—চরিত্র দুইটি সুরঙ্গমা এবং ঠাকুরদাদা।

'রাজা' সম্পর্কিত এই সঙ্কেতটি এই নাটকের মধ্য দিয়া কতদূর সার্থকতার সঙ্গে প্রকাশ করা হইয়াছে, এখন তাহাই দেখিতে হইবে। 'রাজা' নাট্যরচনার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ ভাবলোকে সম্পূর্ণ এক নূতন যুগে প্রবেশ করিলেও, ইহার মধ্যে তাঁহার পূর্ববর্তী দুইখানি নাটকের বহিরঙ্গগত প্রভাব একেবারে পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। তাঁহার পূর্বরচিত নাটক 'শারদোৎসব'-এর ঠাকুরদাদা ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী এই দুইটি চরিত্রের প্রভাব এই নূতন যুগের সম্পূর্ণ নূতন ভাব-বস্তু লইয়া রচিত নাটকখানির মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ 'শারদোৎসব'-এর ঠাকুরদাদার চরিত্র ব্যতীতও তাহার উৎসবায়োজনের বাহ্য পরিচয়টিও 'রাজা' নাটকের মধ্যে আসিয়া কতকটা স্থানলাভ করিয়াছে। যদিও 'রাজা' নাটকের মধ্যে বসন্তোৎসবের কথা আছে, তথাপি উৎসবের বহিরঙ্গগত পরিচয় এখানে পরিস্ফুট হইবার অবকাশ পায় নাই; 'শারদোৎসব' নাটকের তাহাই লক্ষ্য ছিল, কিন্তু 'রাজা' নাটকের তাহা লক্ষ্য নহে; সেইজন্য 'রাজা' নাটকের মধ্যে তাহা যে-পরিমাণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহা এই নাটকের উদ্দেশ্যকেও ব্যাহত করিয়াছে। সাঙ্কেতিক নাটকের বাহ্য ঘটনা যত সংযত হয়, ততই

সমগ্র পরিবেশটি নিবিড়তা লাভ করিতে পারে; রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সাঙ্কেতিক নাটক 'ডাকঘর'ই ইহার প্রমাণ। অতএব এই নাটকে বাহ্যিক ঘটনা প্রাধান্য লাভ করায় ইহার অন্তর্নিহিত রসানুভূতির নিবিড়তা অনেকাংশে বিনষ্ট হইয়াছে। এই নাটকের মধ্যে এই প্রকার অনাবশ্যক ঘটনাবাহুল্য সৃষ্টি করিয়াছে প্রথমতঃ সঙ্গীতকারী বালকদল, দ্বিতীয়তঃ, 'রাজ'-ভক্ত সুরঙ্গমা ও তারপর ঠাকুরদাদা স্বয়ং।

রাণী সুদর্শনার সত্যদর্শনের কাহিনী লইয়াই এই নাটক রচিত। চারিদিকের অসত্য জয় করিয়া সত্যের পথে তাঁহার যাত্রাই ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। অসত্যের মধ্যে যে দুঃখ আছে, তাহার অভিজ্ঞতা হইতেই এই সত্যদর্শন আসিয়াছে, অন্য কোনদিক হইতে আসে নাই। অতএব সত্য-প্রতিষ্ঠ ঠাকুরদাদা কিংবা তাঁহার অনুচর বালকদল এবং সুরঙ্গমা তাহাদের নিজস্ব সত্যচৈতন্য দ্বারা সুদর্শনাকে কিংবা কাহাকেও কোনরূপে সহায়তা করিতে পারে না। সেইজন্য এই সকল চরিত্র এই নাটকের সাঙ্কেতিক কাহিনীর কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিতে পারে নাই; অথচ ইহাদের বক্তৃতায়, গানে, নাটকের প্রচ্ছন্ন সঙ্কেত কাহিনী পরিসমাপ্তির পূর্বেই উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়া ইহার রস বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। 'শারদোৎসব' ও অন্যান্য ঋতু-নাট্যে ঠাকুরদা এবং তাঁহার অনুচর বালকদের সার্থকতা থাকিলেও, এই সাঙ্কেতিক নাটকে তাহারা সম্পূর্ণই অবান্তর এবং পীড়াদায়ক। জ্ঞান অন্যের নিকট হইতে লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু অনুভূতি অন্যের নিকট হইতে লাভ করা যাইতে পারে না, তাহা নিজস্ব। রাজার পরিচয় জ্ঞান দ্বারা লভ্য নহে, ও অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধির বিষয়; সুরঙ্গমা এবং ঠাকুরদা সুদর্শনাকে রাজা সম্পর্কে জ্ঞান দান করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সুদর্শনা নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে না পারিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত সুরঙ্গমা এবং ঠাকুরদার কথায় তাঁহার কোন কাজই হয় নাই। অতএব নাটকের মধ্যে এই চরিত্র দুইটির বিশেষ কোনও সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সুদর্শনার চরিত্রই এই নাটকে একমাত্র জীবন্ত চরিত্র। এই সাঙ্কেতিক নাটকের মধ্যে এই চরিত্রটির বাস্তবধর্মিতা আদ্যোপান্ত অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। রাজাকে চোখে দেখিবার কৌতুহল সুদর্শনার যতই দুর্নিবার হোক, তাঁহাকে চোখে না দেখিয়াও তাহার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস কোনদিনই তাহার মনে শিথিল হইয়া যায় নাই; ইহাই এই চরিত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজাকে চোখে

না দেখিয়াও তিনি চিরদিনই এই বিশ্বাস অটুট রাখিয়াছেন যে রাজা আছেন, তিনি নাই এই সন্দেহ কোনদিন তাহার অন্তর অধিকার করিতে পারে নাই। সেইজন্যই শেষ পর্যন্ত তাহার সত্যদর্শন সম্ভব হইয়াছে। কবে কোন শৈশবে রাজার সঙ্গে তাহার পরিণয় হইয়াছিল, তাহার কথা আজ তাঁহার ভাল করিয়া মনেও নাই, কিন্তু তাঁহার প্রিয়তম যে তাঁহাকে সকল অন্তর দিয়া সেদিন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদবধি তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত না হইয়াও তাঁহার প্রতি তাহার প্রেমের নিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন, এই বিশ্বাস তাহার মধ্যে অবিচল। এখানেই তাঁহার প্রকৃত শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। চোখে দেখিবার কৌতূহলের মধ্যে তাঁহার সাধারণ নারীসুলভ চরিত্রের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, এই কৌতূহল পরিতৃপ্তির পথে তাহার যে বাধা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়াই তাহার দুঃখ তপস্যায় সিদ্ধি লাভ হইয়াছে, তাহা দ্বারাই তাহার মিলন শেষ পর্যন্ত সার্থক হইয়াছে।

বৌদ্ধ কাহিনীতে যেমন আছে যে সুদর্শনা করভোদ্যানের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মধ্যে রাজা কুশকুমারের কুৎসিত রূপ দেখিয়া ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, 'রাজা' নাটকে তাহার পরিবর্তে রাজার ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া সুদর্শনা ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, ঘৃণার ভিতর দিয়া রাজার প্রতি বৌদ্ধ কাহিনীর রাণীর ভক্তি দূর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভয়ের ভিতর দিয়া 'রাজা' নাটকের রাণীর রাজার প্রতি সম্ভ্রম জাগিয়াছিল, তাহার প্রতি ঘৃণা কিংবা অশ্রদ্ধার জন্ম হয় নাই। 'রাজা' নাটকের সুদর্শনা 'রাজা'র প্রতি শ্রদ্ধাভাব সর্বদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে কোন অবস্থাতেই তাহার মধ্যে শৈথিল্য প্রকাশ পায় নাই। বৌদ্ধ কাহিনীর সুদর্শনার চরিত্র নীচ প্রকৃতির ; কারণ, কেবলমাত্র রূপেরই তিনি উপাসিকা, শেষ পর্যন্ত কুশকুমার তাহাকে শক্তি দ্বারা জয় করিলেও ইন্দ্র কর্তৃক সুরূপ লাভ করিয়া তিনি রাণীর সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে মিলিত হইতে পারিয়াছিলেন ; কিন্তু 'রাজা' নাটকের রাণী সুদর্শনার চরিত্রের মধ্যে কেবল মাত্র রূপমোহ-ই ছিল না, আঘাতের মধ্য দিয়া এই মোহকে অতিক্রম করিয়া তিনি পরিণামে রাজার সঙ্গে পরিপুর্ণ মিলনের আনন্দ ভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভুল বশতঃ সুবর্ণকে নিজের কণ্ঠমালা উপহার পাঠাইয়া শেষ পর্যন্ত যখন প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, তখন গভীর অনুশোচনার মধ্য দিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার গৌরব লাঘব হয় নাই!

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'রাজা নাটকের সমালোচনা করিতে গিয়া নিজেই মিঃ সি. এফ্. এন্ড্রুজ মহাশয়ের নিকট লিখিত এক পত্রে সুদর্শনার চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 'Sudarsana is not more on abstraction than Lady Macbeth, who might be described as allegory representnig the criminal ambition in man's nature,' অর্থাৎ সুদর্শনার চরিত্র লেডী ম্যাকবেথের চরিত্র অপেক্ষা অধিক নৈর্ব্যক্তিক নহে, লেডী ম্যাকবেথকে মানব-মনের অন্যায় উচ্চাভিলাষের রূপক চরিত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

বলা বাহুল্য, লেডী ম্যাকবেথের চরিত্র এত জীবন্ত প্রত্যক্ষ এবং বাস্তবধর্মী যে তাহাকে রূপক বলিয়া কদাচ ভুল হইতে পারে না। যেখানে চরিত্র দুর্বল, অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন এবং অপ্রত্যক্ষ (indirect), সেখানেই চরিত্র রূপক হইতে পারে। লেডী ম্যাকবেথের প্রত্যেকটি আচরণ এবং সংলাপের মধ্য দিয়া তাঁহার হিংস্র মনোবৃত্তির বাস্তব রূপটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইহা একটি মনোভাবের যে রূপক মাত্র, তাহা কল্পনাতীত। সুদর্শনার চরিত্র তেমন নহে। অন্ধকার গৃহের মধ্যে সুদর্শনার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাহার সংলাপের ভাষায় ভাব এবং স্বপ্নবিলাসিতার স্পর্শ রহিয়াছে। বিশেষতঃ যাহার জন্য তাহার আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পার্থিব কোন বিষয় কিংবা সামগ্রী নহে। কিন্তু লেডী ম্যাকবেথ পার্থিব সম্পদ লাভ করিবার জন্য তাহার স্বাভাবিক নারী-প্রকৃতি লইয়া প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়াছে, তাহার হৃদয়-প্রবৃত্তিকে অনাবৃত করিয়া দিয়াছে। তাহার কোন অংশই সে গোপন করে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, অন্ধকার গৃহে অমূর্ত প্রেমিকের প্রেম-সাধনায় সুদর্শনার জীবন পরিচালিত হইয়াছে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদ্ধৃত উক্তির ভিতর দিয়া এই কথাই হয়ত বলিতে চাহিয়াছেন যে, সুদর্শনার চরিত্র বাস্তবধর্মী, ধরণীর ধূলি মাটিতে তাহার পদ-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে; কোন স্বপ্নলোকে তাহা কল্পঅভিসার করে নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সুদর্শনার সমগ্র জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে অলোকচারী রাজা, প্রত্যক্ষ জগতের রাজ-সিংহাসন নহে। অতএব সুদর্শনার চরিত্র বাস্তবধর্মী হইলেও যে অমূর্তের সাধনায় তাহার সকল লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল, তাহার প্রভাবেই তাহার চরিত্রের বাস্তবধর্মিতাও সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই।

কিন্তু লেডী ম্যাকবেথের চরিত্র কদাচ তাহা হইতে পারে নাই। পার্থিব বস্তুতে তাহার লক্ষ্য, পার্থিব জীবনাচরণই তাহার অভ্যাস। অপার্থিব বস্তুর স্বপ্নবিলাসিতায় তাহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইতে পারে নাই। সেইজন্য লেডী ম্যাকবেথের চরিত্রে যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, সুদর্শনার চরিত্রে তাহা পাইতে পারে নাই।

চরিত্র হিসাবে রাজা এই নাটকে কতদূর সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহাও বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রথমেই এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে রাজা নাটকীয় চরিত্র হইতে পারে না; কারণ, নাটকের মধ্যে সর্বত্রই ইহা অদৃশ্য। কেবল মাত্র তাঁহার কণ্ঠস্বর নেপথ্য হইতে ভাসিয়া আসিয়া সুদর্শনার সঙ্গে আলাপ করিয়াছে। এখানে একটি বিষয় বুঝিতে হইবে। রাজা যেখানে অদৃশ্য, অমূর্ত কিংবা অরূপ সেখানে তাহার কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাওয়া যাইবার কথা নহে। যাহার কোন মূর্তি নাই, অর্থাৎ যাহা অশরীরী তাহার কণ্ঠস্বরও নাই। সুতরাং নেপথ্যাগত রাজার কণ্ঠস্বর বুঝাইতে এখানে অন্য কিছু মনে করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, সুদর্শনা ব্যতীত রাজা আর কোন চরিত্রের সঙ্গে সংলাপে প্রবৃত্ত হন নাই; ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, অন্ধকার ঘর ব্যতীতও অন্য কোন দৃশ্যে সুদর্শনার সঙ্গে রাজার সংলাপ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং অন্ধকার গৃহের মধ্যে রাজার কণ্ঠে যে সংলাপ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা সুদর্শনারই অন্তরের অবচেতন কিংবা অচেতন মনের অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সমস্ত জাগতিক কোলাহল হইতে দূরবর্তী হইয়া সুদর্শনা যখন অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিতেন, তখনই রাজার সঙ্গে তাহার নিভৃত আলাপনের অবকাশ হইত। ইহার অর্থ, বাহিরের মত্ততায় চেতনার যে অংশ সুদর্শনার মনের মধ্যে লুপ্ত হইয়া থাকিত, তাহা অন্ধকার গৃহের নিভৃত অবকাশ লাভ করিয়া অন্তরের মধ্যে সক্রিয় হইয়া উঠিত। বাহিরের জগৎ হইতে যে সংস্কারকে জীবনে সুদর্শনা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে অন্তর্মুখী সত্য চেতনার তখন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইত। তাঁহার মনের এক অংশ দিয়া তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, অন্য অংশ হইতে তাহার উত্তর পাইতেন। এক অংশ ছিল সংস্কারের বশীভূত, আর এক অংশ ছিল সত্যের চেতনায় উদ্ভাসিত। সুদর্শনার মনের সংস্কারের বশীভূত যে অংশ, তাহা ছিল সচেতন এবং যে অংশে সত্যের উপলব্ধি হইতে পারিত, তাহা ছিল অচেতন; কেবল

মাত্র অন্ধকার গৃহের নিভৃত অবকাশে তাহার অন্তরের মধ্যে তিনি এই সত্যের অনুভূতি লাভ করিতে পারিতেন।

সুতরাং রাজা কোন চরিত্র নহে, সুদর্শনার অন্তরেরই সত্যের বহির্মুখী উপলব্ধি মাত্র। জাগতিক কোলাহলের মধ্যে মত্ত হইয়া থাকিলে তাহা অনুভব করা যায় না, কেবল মাত্র 'অন্ধকার ঘরে' অর্থাৎ অন্তরকে অন্তরের আলো দ্বারা উদ্ভাসিত করিতে পারিলেই তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

সুতরাং 'অন্ধকার ঘর' দৃশ্যটিও বিশেষ তাৎপর্যমূলক। ইহা প্রকৃতপক্ষে কোন 'ঘর' বা 'কক্ষ' নহে, ইহা সুদর্শনার অন্তঃকরণ। ইহাতে সত্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়াই ইহা অন্ধকার। ইহার আর কোন তাৎপর্য নাই।

সুদর্শনার 'অন্ধকার ঘরে'র পরিচারিকা সুরঙ্গমাও কোন নাট্যিক চরিত্র হইতে পারে না, তাহার কোন রক্তমাংসের পরিচয় নাই। সেও সুদর্শনার হৃদয়ের আর একটি অংশ হইতে পরিকল্পিত নিরবয়ব বাণীমূর্তি মাত্র। তাহা বিশ্বাস এবং ভক্তির অংশ। মানুষের মনের বিভিন্ন স্তরে যে কত বিচিত্র চেতনা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহা কোলাহলমুখর বহির্জগতের অভ্যস্ত কর্মে যে লিপ্ত হইয়া থাকে, সে উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু তাহা হইতে মুক্ত হইয়া গিয়া যদি অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে, তবেই তাহা সে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে। 'অন্ধকার ঘর' সুদর্শনাকে সেই অবকাশ দিয়াছিল বলিয়া তিনি সেখানেই তাহার হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি, বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণের যে প্রেরণা জীবনে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সুরঙ্গমার মধ্যে তাহারই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং সুরঙ্গমাও রাজা চরিত্রেরই মত সুদর্শনার মনঃকল্পিত অন্যতম ভাবমূর্তি; সেইজন্য অন্ধকার ঘর ব্যতীতও যে তাহাকে দুই একটি দৃশ্যে দেখা গিয়াছে, সেখানেও তাহার এই পরিচয়ের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি *King of the Dark Chamber* নামে ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে। উপরে অন্ধকার ঘরের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, 'রাজা' নামের এই অনুবাদ সার্থক নহে। কারণ, এখানে প্রকৃত 'ঘর' বলিয়া কিছু নাই, সুতরাং *Chamber*-এর কথা আসিতেই পারে না। বিশেষতঃ king কথার মধ্য দিয়া রাজার কেবলমাত্র ঐশ্বর্যের দিকটির পরিচয় প্রকাশ পায়, কিন্তু রাজার যে

সুদর্শনার সাহচার্যে একটি প্রেমিক সত্তা বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত মাত্রও তাহাতে নাই। অথচ ইহাই রাজা চরিত্রের প্রধানতম পরিচয়। কেবল মাত্র *The Beloved* কথাটি দ্বারা ইহার ইংরেজি অনুবাদ সার্থক হইতে পারে। সুতরাং যিনি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, তিনি ইহার মূল তাৎপর্যই বুঝিতে পারেন নাই।

'রাজা' তত্ত্বমূলক নাটক হওয়া সত্ত্বেও ইহা কতখানি নাট্যগুণান্বিত হইয়াছে, তাহাও বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। তত্ত্বমূলক নাটকেরও নাট্যগুণ থাকিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলিয়াছেন, 'the human soul has its inner drama, which is just the same as anything else that concerns Man.' নাটকীয় ঘটনা কেবলমাত্র যে বহির্বিশ্বেই সংঘটিত হয়, তাহা নহে, অন্তর্লোকেও নাটকীয় দ্বন্দ্বের নিত্য জয়-পরাজয় ঘটিতেছে। গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে উপলব্ধি করিতে পারিলেও তাহার মধ্যেও নাটকীয় উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। 'রাজা' নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মানব-মনের সেই অন্তর্জগতেরই সন্ধান করিয়াছেন এবং তাহার উপরই তাঁহার নাটকের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে বহির্ঘটনামূলক নাটকের আঙ্গিক দিয়া বিচার করা সমীচীন নহে। ইহার মধ্যেও প্রকৃত নাটক সংঘটিত হইয়াছে সুদর্শনার হৃদয়ে, বাহিরের জগতে নহে। সুদর্শনার অন্তর্জগতে রাজার সঙ্গে তাহার যে ব্যবধান ছিল, তাহা শেষ পর্যন্ত ঘুচিয়া গিয়া নাটকের এক মিলনাত্মক পরিণতি নির্দেশ করিয়াছে। সকল বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া প্রবল অবিশ্বাসকে জয় করিয়া সুদর্শনা শেষ পর্যন্ত যে সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহাই নাটকীয় গুণ লাভ করিয়াছে। এমন কি, রাজা-চরিত্র সুদর্শনার অন্তরে থাকিয়াও তাহার সকল ভ্রান্তি দূর করিবার যে সহায়তা করিয়াছে, তাহাও নাটকীয় চরিত্রের রূপ লাভ করিয়াছে। রাজা চরিত্র কাহিনীর মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া সুদর্শনার আচার-আচরণ এবং নাটকের সকল ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, ইহাতেই নাটকের মধ্যে তাহার নায়কোচিত গুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। ইহার ঘটনার ধারায় উত্থান পতন আছে, জীবনের পথে আশা নৈরাশ্য প্রকাশ পাইয়াছে এবং ঘটনার অগ্রগতি, ক্রমোন্নয়ন এবং সর্বশেষে একটি সুস্পষ্ট পরিণতিও প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে নাটকীয় গুণের অভাব দেখা যায় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। তবে ইহা বহির্জগতের

নাটক নহে, অন্তর্জগতের নাটক। প্রকৃত জগৎ অন্তর্জগৎ; কারণ, বহির্ঘটনার অন্তর্মুখী প্রতিক্রিয়ার উপরই নাটক রচিত হয়, সেইদিক হইতে 'রাজা' নাটকে নাটকীয় গুণের অভাব নাই।

'রাজা' নাটক রবীন্দ্রনাথের আনুপূর্বিক সাঙ্কেতিক, রূপক কিংবা বাস্তবধর্মী নাটক নহে; ইহার মধ্যে সাঙ্কেতিক চরিত্র রাজা প্রাধান্য লাভ করিলেও রূপক এবং বাস্তবধর্মী চরিত্রেরও অস্তিত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি এই শ্রেণীর নাটকের ইহাই বৈশিষ্ট্য। এমন কি, তাঁহার বাস্তবধর্মী নাটকের মধ্যেও সাঙ্কেতিক এবং রূপক চরিত্র থাকে। 'রাজা' নাটকেও রাজা সাঙ্কেতিক চরিত্র, কিন্তু সুরঙ্গমা এবং ঠাকুরদা রূপক চরিত্র, অবশিষ্ট আর প্রায় সকল চরিত্রই বাস্তবধর্মী। তবে সাঙ্কেতিক রাজা চরিত্র দ্বারাই ইহার কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে; সেইজন্যই ইহা সাঙ্কেতিক নাটক বলিয়া পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের নাটকে এক একটি বিষয় প্রাধান্য লাভ করে; যাহাতে সঙ্কেত প্রাধান্য লাভ করে, তাহাকে সাঙ্কেতিক নাটক, যাহাতে রূপক প্রাধান্য লাভ করে, তাহাকে রূপক নাটক এবং যাহাতে বাস্তব জীবন প্রাধান্য লাভ করে, তাহাকে বাস্তবধর্মী নাটক বলা হয় মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন নাটকই নিরবচ্ছিন্ন একটি মাত্র উপাদানে রচিত নহে। 'রাজা' নাটকও সঙ্কেত-প্রধান নাটক, এই মাত্রই বলিতে পারা যায়।

রাজা' নাটকের সঙ্গীতের ব্যবহার সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রায় প্রত্যেক নাটকেই সঙ্গীতের ব্যবহার করিলেও তাঁহার দুইখানি সাঙ্কেতিক নাটক 'রাজা' ও 'ডাকঘরে'র মধ্যে এই বিষয়ে একই নীতি অনুসরণ করেন নাই। রাজা নাটকে বহুসংখ্যক সঙ্গীত সংযোগ করিয়াছেন, কিন্তু 'ডাকঘর' নাটকে কোন সঙ্গীত নাই। এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'রাজা' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতরচনার যুগের নাটক, বিশেষতঃ 'রাজা'র মূল বক্তব্য এবং তাঁহার সেই যুগের গীতিরচনাগুলির মূল বক্তব্যে কোন পার্থক্য নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, 'রাজা' 'গীতাঞ্জলি'র নাট্যসংস্করণ মাত্র। সেইজন্য নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই ইহাতে সঙ্গীত আসিয়াছে। বিশেষতঃ ভাব বা আইডিয়া-মূলক নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং 'রাজা' নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার অযথা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ইহার সংলাপও গীতিধর্মী; সেইজন্য সঙ্গীত এবং সংলাপ ইহার মধ্যে সহজ সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারিয়াছে।

'ডাকঘরে'র রহস্যনিবিড় পরিবেশটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইহার মধ্যে সঙ্গীতের ব্যবহার না করিয়াই নাট্যকার কুশলী শিল্পীর পরিচয় দিয়াছেন।

এই নাটকের কাঞ্চীরাজের চরিত্র-পরিকল্পনাটি বড় সুন্দর ও তাৎপর্যমূলক। ইহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাট্যের কোন সমালোচকই বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু এই চরিত্রটির মধ্যে এই নাটকেব সঙ্কেতটি সুদর্শনার চরিত্র অপেক্ষাও গভীর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সুদর্শনা ভণ্ডরাজের রাজবেশ দেখিয়া ভুলিয়াছেন; কিন্তু কাঞ্চীরাজ ভুলেন নাই, তিনি তাহাকে দর্শন মাত্রই তাহার কপটতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। সত্যের সোনা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত আছে, কিন্তু দুঃখের দহনে তাহা তখন পর্যন্তও উজ্জ্বলতা লাভ করে নাই। তারপর পরাজয়ের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনে সেই দুঃখ যখন দেখা দিল, তখন সত্যদর্শনে তাহার আর কোন বাধা রহিল না। সেইজন্যই বাজা তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

রাজা নাটকের শেষ দৃশ্যটি বিশেষ তাৎপর্যমূলক। বাহিরের পথ হইতে উঠিয়া আসিয়া ঘরের সেই পরিচিত অন্ধকারে, যে অন্ধকার হইতে পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুভেদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেখানে যখন সুদর্শনা রাজার অনুভূতি লাভ করিল, তাঁহাব সেবাব অধিকাব চাহিল, নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া দিয়া তাঁহার কাছে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ কবিয়া দিল, তখন এই অন্ধকার ঘরের দ্বার চিবতবে খুলিয়া গেল, মহান মৃত্যুব মধ্য দিয়া চির আলোকের রাজ্যে তাঁহাব অন্তরতম রাজার সঙ্গে চিরমিলন সার্থক হইল।

'শাপমোচন'

'রাজা' নাটকের বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে আর একখানি সংক্ষিপ্ত রূপক নাট্য রচনা করেন, তাহার নাম 'শাপমোচন'। প্রকৃত পক্ষে ইহা রাজা নাটকের নৃত্যগীত সম্বলিত সংক্ষিপ্ত অভিনয়োপযোগী রূপ। ইহার গানগুলি রবীন্দ্রনাথের পুর্বরচিত অন্যান্য গীতিসম্বলিত নাটক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

১৯৩১ সনে ইহার প্রথম প্রকাশের পর ১৯৩৩ সনে ইহা কয়েকবার পরিমার্জনা লাভ করিয়া সর্বশেষ রূপ লাভ করে। প্রতিবারেই ইহাতে নূতন সঙ্গীত সংযোজিত ও পূর্ববর্তী সঙ্গীতের কোন কোনটি পরিত্যক্ত হয়। নাট্যকাহিনীর সঙ্গে ইহার সঙ্গীতগুলি এক সঙ্গে রচিত না হওয়ার ফলে ইহার সঙ্গীতাংশ ইহার সংলাপাংশের সহিত সহজ সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া উঠিতে পারে নাই। সেইজন্যই বারবার ইহার পরিমার্জনার প্রয়োজন হইয়াছে; অবশ্য এই পরিমার্জনা কেবলমাত্র ইহার সঙ্গীতাংশের উপর দিয়া যতখানি হইয়াছে, সংলাপাংশের উপর দিয়া তত হয় নাই।

'শাপমোচন'-এর কাহিনীর সূচনাংশ রাজা নাটক হইতে সামান্য স্বতন্ত্র; কিন্তু ইহার মর্মাংশ রাজা নাটকের সঙ্গে অভিন্ন। এখানে কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। সুরসভার গীতনায়ক শৌরসেন প্রেয়সী-বিরহোৎকণ্ঠিতার জন্য সুরসভায় গীতকালে তালভঙ্গ করিলেন। এই অপরাধ অমার্জনীয় বলিয়া ধার্য হইল। ইন্দ্রাণীর শাপে বিকৃত দেহশ্রী লইয়া শৌরসেন মর্ত্যলোকে গান্ধার রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। তীর্থ-প্রত্যাগতা পত্নীও স্বামীর অনুগমন করিয়া মদ্ররাজকুমারী রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। কালক্রমে গান্ধার রাজের প্রতিনিধি রূপে একটি বীণা মদ্ররাজগৃহে প্রেরিত হইল; রাজকুমারী বীণাটিকে বরণ করিয়া বধূরূপে গান্ধার রাজগৃহে আসিলেন। কিন্তু রাজগৃহ অন্ধকার, সেই অন্ধকার গৃহে রাজার সঙ্গে তাঁহার বধূসমাগম হইয়া থাকে। বধূ বারবার রাজাকে দিনের আলোকে দেখিতে চাহেন; কিন্তু রাজা দেখা দেন না। তারপর একদিন উৎসবের মধ্যে অন্যান্য সহচরদিগের মধ্য হইতে রাজা তাঁহাকে চিনিয়া লইতে বলিলেন। বধূ চিনিতে পারিলেন না, একটি কুৎসিত লোক দেখিয়া তাহার নিন্দা করিলেন।

বধূ সুন্দরের পূজারিণী, তিনি কুশ্রীকে সহ্য করিতে পারেন না। অন্ধকারের রাজা ইহাতে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'একদিন সইতে পারবে আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে।' অবশেষে একদিন রাজাকে দেখা দিতে হইল। রাণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন—এ ত সেই উৎসবের দিনের কুৎসিত লোকটি। ঘৃণায় রাণী প্রাসাদ ছাড়িয়া অরণ্যে পলাইয়া গেলেন। সেই অরণ্যের বুকে তাঁহার পূর্বজীবনের পরিচিত বীণাধ্বনির আর্তস্বর শুনিতে পাইয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কী এক হতাশের বিরহ তাঁহার অন্তরতলে জাগিয়া উঠিল। পরিচিত বীণার রাগিণী যেন জন্মান্তর হইতে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতে লাগিল। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সেই রাগিণী লক্ষ্য করিয়া নির্ভয়ে অন্ধকারের মধ্যে বাহির হইয়া গেলেন। কাছে যাইতেই বীণা থামিল। অন্ধকারের ভিতর হইতে রাজা তাহাকে অভয় দিলেন। রাণী ধীরে ধীরে প্রদীপ বাহির করিয়া তাহার মুখের সম্মুখে ধরিলেন—তাহার অনিন্দ্য রূপ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন।

যে বৌদ্ধ কাহিনী হইতে রাজা নাটকের কাহিনী গৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতেই 'শাপমোচনে'র কাহিনীও রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি 'রাজা' নাটকের মধ্যে আধ্যাত্মিক সুরটি প্রবলতর, কিন্তু 'শাপমোচন' অধিকতর মানবিক অনুভূতি দ্বারা সমৃদ্ধ। 'রাজা' নাটকের রাজা পূর্ণাঙ্গ অলোকধর্মী চরিত্র, কিন্তু 'শাপমোচনে'র রাজা অন্ধকার দ্বারা তাঁহার মানবিক পরিচয়টি আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তাঁহার চারিপাশ ঘিরিয়া একটি সাময়িক কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। 'রাজা' নাটক রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ অলোকরাজ্যেই বিচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'শাপমোচন' রচনাকালে তিনি মর্ত্যের ধূলিমাটিতে নামিয়া আসিয়াছিলেন, সেই জন্য ইহা সংক্ষিপ্ত ও ভাবের দিক দিয়া কতকটা দীন হইলেও অধিকতর নাট্য রসসমৃদ্ধ বলিয়া অনুভূত হইবে।

'ডাকঘর'

'গীতাঞ্জলি'র যুগে রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা 'ডাকঘর'। ইহা সাঙ্কেতিক নাটক; ইহা 'রাজা'র দুই বৎসর পর প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে ইহা রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। নাটকখানি 'গীতাঞ্জলি'র মতই এদেশীয় পাঠক-সমাজ অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্য পাঠকসমাজেই অধিকতর প্রীতি-লাভ করিয়াছে, প্রায় প্রত্যেক ইউরোপীয় ভাষাতেই ইহা অনূদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে এবং সর্বত্রই ইহার অভিনয় আশাতীত সমাদর লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আর কোন নাটক পাশ্চাত্ত্য সুধীসমাজে ইহার মত এত অধিক আলোচিত হয় নাই। এই সকল দিক দিয়া নাটকখানি একটু বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য।

ভাবের দিক দিয়া 'ডাকঘর' 'রাজা'র পরিপূরক; কিন্তু কাহিনী পরিকল্পনার দিক দিয়া 'ডাকঘর'-এর বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এই: মাধব দত্ত বৈষয়িক লোক; তিনি নিঃসন্তান; তাঁহার সঞ্চিত অর্থ ভোগ করিবার কেহ নাই, পত্নীর পরামর্শে পত্নীর পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে আনিয়া পুত্রনির্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাহার প্রতি তাঁহার পরম মমতা জন্মিয়া গেল, তিনি নিজের এ যাবৎকাল উদ্দেশ্যহীন সঞ্চয়ের মধ্যে একটা অর্থ খুঁজিয়া পাইলেন,—তাঁহার সঞ্চয় এই বালকটি ভোগ করিবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার জীবনের আনন্দ বাড়িয়া গেল, সংসারের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ জন্মিল। কিন্তু বালক অমল সংসারের কোন বন্ধনই স্বীকার করিতে চাহে না—সে উন্মুক্ত জানালার পার্শ্বে বসিয়া বাহিরের চঞ্চল জগতের রূপ দেখিয়া তাহার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে; জানালার পাশ দিয়া গ্রামান্তরের দইওয়ালা হাঁকিয়া যায়, পথে প্রহরী পায়চারী করিয়া বেড়ায়, গাঁয়ের মোড়ল নিজের গায়ে-পড়া কর্তব্য পালন করিয়া যায়, মালীদের মেয়ে সুধা পায়ের মল ঝম্ ঝম্ করিয়া নিত্য ফুল তুলিতে যায়, ছেলেরা দল বাঁধিয়া খেলিতে বাহির হয়। রুগ্ন বালক অমল রুদ্ধ ঘরের মুক্ত জানালাটুকু দিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করে। তাহার জানালার সামনে রাজার ডাকঘর বসিয়াছে, বিচিত্র রং-এর তক্‌মা-পরা ডাক-হরকরারা চারিদিকে রাজার চিঠি বিলি করিয়া বেড়াইতেছে। অমল শুনিল, তাহা

নামেও রাজার চিঠি 'আসিবে, সে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অমল আরও অসুস্থ হইয়া পড়ে। জানালার কাছটি হইতে আসিয়া শয্যা আশ্রয় করে; অভিজ্ঞ কবিরাজ তাহাকে শরতের আলো-বাতাস হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে পরামর্শ দেয়। সতর্ক মাধব দত্ত আদেশ পালন করিয়া যান। রাজার ডাকঘর হইতে চিঠি পাইবার উৎকণ্ঠায় অমলের অধীর মুহূর্তগুলি কাটিতে থাকে। গাঁয়ের মোড়ল তাহার ধৃষ্টতা দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিয়া যায়; ঠাকুর্দা তাহার শিয়রে বসিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া উৎসাহ দেন। তারপর এক রাত্রে বাড়ীর রুদ্ধ সদর দরজা ভাঙ্গিয়া রাজদূত অমলের ঘরে প্রবেশ করিল, জানাইল, রাজা স্বয়ং আসিতেছেন, রাত্রি দ্বিপ্রহরে তিনি আসিবেন, তার আগে তাঁহার বালক বন্ধুটিকে দেখিবার জন্য তাঁহার সকলের চেয়ে বড় কবিরাজকে পাঠাইয়াছেন। রাজ-কবিরাজ প্রবেশ করিলেন, তিনি সেইমুহূর্তেই ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিলেন, বাহিরের মুক্ত হাওয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, প্রদীপের আলোক নিভিয়া গেল, সুদূর আকাশ হইতে ঘরের ভিতর কেবল তারার আলোক জ্বলিতে লাগিল। অমল ঘুমাইয়া পড়িল, সুধা কয়টি ফুল হাতে করিয়া আসিয়া তাহাকে ডাকিল; কিন্তু তাহার ঘুম আব ভাঙ্গিল না।

কাহিনীটির পরিকল্পনায় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ক্ষীণতম প্রভাব অনুভব করা যায়। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের 'Ode on Immortality কবিতার' শিশুর সঙ্গে অমলেব সাদৃশ্য আছে, তারপর ইহাতে যাহাকে Earth বলা হইয়াছে, তাহাব সঙ্গে মাধব দত্তের চরিত্রেরও একটু যোগ আছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় যেমন আছে,

> Doth all he can
> To make his fosterchild, his inmate, man,
> Forget the glories he hath known,
> And that imperial palace whence he came.

[illegible] দত্তের আচরণে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

[illegible]র মধ্যে যেমন একটি রোমান্টিক পরিবেশের ভিতর দিয়া উদ্দিষ্ট [illegible]র নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তেমনই 'ডাকঘর'-এর মধ্যে দৈনন্দিন [illegible]নের নিতান্ত পরিচিত বাস্তব পরিবেশ অবলম্বন করিয়া এই সঙ্কেত ব্যক্ত

করা হইয়াছে—ইহাই এই নাটকের সর্বপ্রধান আকর্ষণীয় গুণ। যদিও অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অরূপ ও অসীমই এই নাটকেরও লক্ষ্য, তথাপি ইহার সমগ্র পরিবেশটি এমন প্রত্যক্ষ ও বাস্তব যে ইহার সুদূর লক্ষ্যগত ভাব-স্বপ্ন অপেক্ষা ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয়টি পাঠককে অধিকতর মুগ্ধ করে।) বিশেষতঃ ইহার মধ্যে মানব-মনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলি এমনই সাধারণ মানবিক উপায়ে বিকাশ করা হইয়াছে যে, ইহাতে ইহার নাট্যিক মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'রাজা'র সঙ্গে 'ডাকঘর'-এর ইহাই মূল পার্থক্য। একটি রোমাণ্টিক পরিবেশ আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়া 'রাজা'য় রাণী সুদর্শনার আকাঙ্ক্ষা যতখানি অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে, নিতান্ত পরিচিত বাস্তব পরিবেশকে অবলম্বন করিয়া 'ডাকঘর'-এ অমলের আকাঙ্ক্ষা রূপ পাইয়াছে বলিয়া তাহা তত অস্পষ্ট থাকিতে পারে নাই। এই নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে, যদিও ইহার লক্ষ্য ভাব-লোক, তথাপি ইহার মর্ত্যমুখীনতাও অবিসংবাদিতরূপে রক্ষা পাইয়াছে। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র যুগ অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর'-এর মত এমন সুগভীর মর্ত্যমমতা আর কোন রচনায় দেখাইতে পারেন নাই।) উঠানে বসিয়া জাঁতা দিয়া পিসিমার ডাল-ভাঙ্গা, পুরানো নাগ্‌রা জুতা-পরা বাঁশের লাঠি কাঁধে কর্মসন্ধানী বিদেশী পথিক, দূর পাহাড়ের কোলে ঝরণার বাঁকা রেখা, পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শামলী নদীতীরের দইওয়ালা, মাথায় কলসী পরণে লাল শাড়ি নদীর পথে গাঁয়ের গয়লার মেয়ে,—এই সমস্ত চিত্রের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের যে সুগভীর মানবপ্রীতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই সাঙ্কেতিক নাট্যকাহিনীর অলোক-নির্দেশ অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব 'ডাকঘর'-এর সার্থকতা তাহার সঙ্কেত-নির্দেশের গুরুত্ব কিংবা সার্থকতার উপরও নির্ভর করে নাই, ইহার মধ্যে বাস্তব জীবন-দর্শনের যে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই নাটকখানিকে সার্থকতা দান করিয়াছে। ইহার আর একটি প্রমাণ এই যে, এই নাটকের মধ্য দিয়া যে ভাবটি প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্রসাহিত্যে কোন নূতন কথা নহে। পূর্ববর্তী সাঙ্কেতিক নাটক 'রাজা'র কথা বাদ দিলেও তাঁহার পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ, এমন কি ছোটগল্পের মধ্য দিয়াও এই ভাবটি বহু পূর্বেই প্র[illegible] পাইয়াছে, সে'কথা পরে আলোচনা করিতেছি। অতএব ভাবের অ[illegible]লার ইহার মধ্যে কিছুমাত্র নাই—ইহার মধ্যে যাহা আছে, তাহা একমাত্র [illegible]রা প্রকাশের বিশেষত্ব, ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে।

রসের নিবিড়তার দিক দিয়া 'ডাকঘর' নাটকটি অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না ; প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহা একটিমাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত বহিয়া গিয়াছে। কাহিনীর ধারায় কোথাও এতটুকু ছেদ পড়ে নাই ; কাহিনীর নিবিডতা ইহার একটি প্রধান গুণ। ইহা আয়তনে নিতান্তই ক্ষুদ্র, রবীন্দ্রনাথেব এই শ্রেণীব নাটকগুলির মধ্যে ইহা ক্ষুদ্রতম, তিনটি মাত্র ক্ষুদ্র দৃশ্যে ইহা সম্পূর্ণ—আদ্যোপান্ত রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় সহজ গদ্যে রচিত। 'রাজা' নাটকের মধ্যে ঘন ঘন সঙ্গীতের সন্নিবেশ কাহিনীর নিবিডতা বিনষ্ট করিয়াছে, কিন্তু 'ডাকঘর'-এ নাট্যকাব কোন সঙ্গীতের সন্নিবেশ করেন নাই, কাহিনীর নিবিডতা রক্ষা করিতে ইহা পরম সহায়ক হইয়াছে। নাটকের প্রারম্ভেই ইহার মধ্যে যে একটি বিষাদের সুর বাজিয়াছে, তাহা শেষ পর্যন্ত একটি সুগভীব কালো ছায়ার মত সমগ্র নাট্যকাহিনীটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই নাটকের ঘন বিষাদের সুর কোথাও কাহারও কোন অযথা অসংযত আচরণের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পডে নাই ; বাক্য ও কার্যের সুকঠিন সংযম এই নাটকটির একটি বিশিষ্ট গুণ। যে ঠাকুরদার বাচালতা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সাঙ্কেতিক নাটক 'রাজা'র অনেকখানি সৌন্দর্যহানি করিয়াছে, সেই ঠাকুরদাও এখানে সম্পূর্ণ সংযতবাক্! এখানেও ঠাকুরদা সত্যদর্শী পুরুষ, কিন্তু সত্য-প্রচারে তাহার প্রগল্ভতা এখানে প্রকাশ পায় নাই, অতএব তাঁহার চরিত্রটি এখানে অন্যান্য নাটকের ঠাকুবদা চরিত্রের মত নাট্যকাহিনীর অন্তর্গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়া না দিয়া ববং তাহা রক্ষা করিতেই সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু 'ডাকঘর' নাটকের সংযমের কথা আলোচনা করিতে গিয়া একটি চরিত্রের কথা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পাবা যায় না, তাহা কবিরাজের চরিত্র। কবিরাজ একটু অসংযতবাক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার বাক্যের এই অসংযম তাঁহার চরিত্রের বাস্তব পরিচয়ই ব্যক্ত করিয়াছে, নাট্যকাহিনীর সমগ্র পরিবেশটির যে একটি অপূর্ব বাস্তব মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই একান্ত অপরিহার্য অঙ্গরূপেই কবিরাজের চরিত্রটিও পরিকল্পিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার অসংযম এবং তাঁহার ভিতর দিয়া নাট্যকার যে ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কতক পরিমাণে যে নাটকের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশকে আঘাত করে নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না।

এই নাটকের অন্যতম প্রধান গুণ এই যে, ইহার কোন সাঙ্কেতিক চরিত্র বিশিষ্ট কোন চরিত্র হিসাবে এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে স্থান পায় নাই। 'রাজা'

নাটকের প্রধান সাঙ্কেতিক চরিত্র রাজা নাটকের মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়াও একটি বিশিষ্ট চরিত্র হিসাবে নাট্যকাহিনীর সর্বত্র বিচরণ করিয়াছে। তাঁহার রূপ প্রত্যক্ষ করি না সত্য, কিন্তু তাঁহার মুখের কথা শুনিতে পাই—ইহার মধ্যে কল্পনার অসঙ্গতি আছে, কিন্তু 'ডাকঘর' নাটকের সাঙ্কেতিক চরিত্র রাজা নাট্যকাহিনীর কোন অংশেই কোন স্থানই অধিকার করে নাই, নাটকের শেষ মুহূর্তে তাঁহার জন্য সকলের উৎসুক প্রতীক্ষার ভিতর দিয়া কাহিনীর যবনিকাপাত হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে সঙ্কেতেরও কোন অস্পষ্টতা নাই, অথচ কল্পনারও সঙ্গতি রক্ষা পাইয়াছে।

অব্যক্ত অরূপ ও অসীমের প্রতি সঙ্কেতমাত্রই সাঙ্কেতিক নাটকের লক্ষ্য, কোন রূপক চরিত্রের মধ্য দিয়া তাহার কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় তাহাতে ব্যক্ত হইতে পারে না। ইহাদের অনুভূতি ইন্দ্রিয়গোচর নহে, মনোগোচর মাত্র, অতএব তাহাদের পরিচয় চোখের ভিতর দিয়াই পাই, কিংবা কানের ভিতর দিয়াই লাভ করি—ইহাদের মূল্য একই হইয়া দাঁড়ায়। এই দিক দিয়া 'রাজা' নাটক অপেক্ষাও 'ডাকঘর' সুপরিকল্পিত এবং এই ভাবে বিচার করিতে গেলে ইহাই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র সাঙ্কেতিক নাটক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ইহার কোন সাঙ্কেতিক চরিত্র প্রাধান্য লাভ করিতে না পারায় ইহার আর একটি গুণ প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা এই যে, ইহা 'রাজা' নাটকের মত তত্ত্ব-প্রধান না হইয়া রস-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ সমালোচক এড্ওয়ার্ড টম্সনও যথার্থই ইহার রসোপলব্ধি করিয়া ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'it is beautiful, touching, of one texture of simplicity throughout and within its limits an almost perfect piece of art.' রাজার অলোক-সংজ্ঞা কিংবা তাঁহার সঙ্গে মিলনের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয়গোচর ভূমানন্দ আছে, তাহার কথা দ্বারা 'ডাকঘর' ভারাক্রান্ত নহে, বরং ইহার কাহিনীর মধ্যে ইন্দ্রিয়গোচর প্রত্যক্ষলোকের যে মর্মস্পর্শী পরিচয় আছে, তাহাই ইহাকে যথার্থ আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। অতএব ইহা সাঙ্কেতিক রচনা হইলেও রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর অন্যান্য রচনার মত তত্ত্বধর্মী নহে, বরং কাব্যধর্মী।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভাবের দিক দিয়া এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের কোন অভিনবত্ব নাই—ইহার যাহা কিছু অভিনবত্ব, তাহা ইহার ভাব-প্রকাশের মধ্যে। অমলের চরিত্রে সুদূরের জন্য আকুতি ও বন্ধনের মধ্যে যে বেদনার

পরিচয় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ইহার পূর্ববর্তী কাব্যসমূহেও তিনি নানাভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'প্রভাত-সঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া 'খেয়া'র পূর্ববর্তী যুগে 'উৎসর্গ' রচনার কাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নানাভাবেই বিশ্বব্যাপ্তি ও বন্ধন-মুক্তির জয়গান গাহিয়া আসিতেছেন। কাব্যের ভিতর দিয়াও তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের যে নিবিড় যোগ অনুভব করিতেন, 'ডাকঘর'-এর মধ্য দিয়া তাহারও পরিচয় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'ডাকঘর' রবীন্দ্র-কবি-মানসের আত্মকেন্দ্রিক ভাবানুভূতির রূপায়ণ মাত্র, তাঁহার শৈশব জীবনের অবরুদ্ধতার বেদনা বালক অমলের অববোধ-জীবনের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, তাঁহার পরিণত জীবনের আধ্যাত্মিক চেতনারও আভাস তাহারই রাজার চিঠি পাইবার আকুতির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, সেইজন্য বালক অমল একাধারে শৈশব জীবনের অবরুদ্ধতার বেদনাভারে যেমন পীড়িত, তেমনই আবার পরিণত মনের সুদূরের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ; সে শৈশব-সুলভ কৌতূহল বশতঃ প্রত্যক্ষ বস্তুকেও লাভ করিতে চায়, আবার পরিণত মনের দার্শনিক দৃষ্টি লইয়া অপ্রত্যক্ষের জন্যও ব্যাকুল হইয়া উঠে। এইজন্যই অমলের মনের উপর দুইটি শক্তিই সক্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়।

'প্রভাত-সঙ্গীত'-এর মধ্যে ভগ্ন-স্বপ্ন নির্ঝরের কলকণ্ঠে যে মুক্তির আনন্দ-গান ধ্বনিত হইয়াছিল, কিংবা 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা'র বিশ্বব্যাপ্তির মধ্যে কবি যে আনন্দানুভূতির পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাই 'খেয়া'র পূর্ববর্তী যুগে 'উৎসর্গে' আসিয়া 'সুদূর' 'প্রবাসী' ইত্যাদি কবিতায় নূতন রূপ লাভ করিয়াছে মাত্র। পরবর্তী রচনা 'ডাকঘর'-এর মধ্য দিয়াও 'সুদূর' কবিতার এই সুরটিই ধ্বনিত হইয়াছে—

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী ॥
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়,
তরু-মর্মরে, ছায়ার খেলায়,
কী মূরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি'।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার,
সে কথা যে যাই পাশরি ॥

রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' বা 'গীতাঞ্জলি'র যুগের প্রায় সমগ্র ভাব-কল্পনাই যেমন তাঁহার পূর্ববর্তী সমৃদ্ধতর 'সাধনা' বা 'সোনার তরী'র যুগ হইতেই গৃহীত, তেমনই 'ডাকঘর'-এর পরিকল্পনাটিও তাঁহার পূর্ববর্তী 'সাধনা'র যুগেরই 'গল্পগুচ্ছে'র একটি গল্পের মধ্যে নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। গল্পটির নাম 'অতিথি'। রবীন্দ্রনাথের ইহা একটি অতি সুপরিচিত ছোট গল্প। ইহার মধ্যে বালক তারাপদর যে চরিত্রটির পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে 'ডাকঘর'-এর অমলের চরিত্রের মৌলিক সম্পর্ক আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে তখনও আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হয় নাই বলিয়া গল্পটির মধ্যে গভীরতর কোন সঙ্কেতের নির্দেশ তেমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই, তবে তাহার আভাস যে না পাওয়া যায়, তাহাও নহে। বালক তারাপদর জীবনে বন্ধন যখনই একান্ত হইয়া উঠে, তখনই সে সেই বন্ধন হইতে মুক্তির সন্ধান করে, প্রকৃতির ভিতর দিয়া এই মুক্তির আহ্বান তাহার কানে আসিয়া পৌঁছায়, এই আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়া সে 'স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্র-বন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষায় মেঘান্ধকার রাত্রে আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব-পৃথিবীর নিকট চলিয়া যায়।' বলাই বাহুল্য যে, 'সাধনা' বা 'সোনার তরী'র যুগের এই উদাসীন জননী বিশ্ব-পৃথিবীই 'গীতাঞ্জলি'র আধ্যাত্মিক যুগের রাজা।

'ডাকঘর' নাটককে একদিক দিয়া পথ চলার গান বলিয়াও উল্লেখ করা যায়। পথের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ অনন্ত জীবন-ধারার সঙ্কেত প্রকাশ করেন। 'গীতাঞ্জলি'র নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটির মধ্যেও 'ডাকঘরে'র এই ভাবটি ব্যক্ত করা হইয়াছে,

> আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।
> খেলে যায় রৌদ্র ছায়া বর্ষা আনে বসন্ত।
> কারা এই সমুখ দিয়ে, আসে যায় খবর নিয়ে,
> খুশিরই আপন মনে, বাতাস বহে সুগন্ধ ॥
> সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা।
> শুভখণ হঠাৎ এ'লে তখনি পাব দেখা ॥

'রাজা' নাটকের মধ্যে যেমন একটি অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক আকুতির অভিব্যক্তি দেখা যায়, 'ডাকঘর' নাটকের মধ্যে তাহার কতকটা ব্যতিক্রম

আছে। 'ডাকঘর'-এর অমলের মধ্য দিয়া মানব-মনের সুদূরের জন্য আকাঙ্ক্ষার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা 'রাজা'র সুদর্শনা চরিত্রের অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক আকুতির সমধর্মী বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না; কারণ, রাণী সুদর্শনার লক্ষ্য সম্পূর্ণই নিরবলম্ব, বিশ্ব-বস্তুতে অনাশ্রিত; কিন্তু অমলের লক্ষ্য তাহা নহে, সে প্রত্যক্ষলোক অতিক্রম করিয়াই অপ্রত্যক্ষলোকের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, সে পৃথিবীর প্রতি প্রত্যক্ষ অণুপরমাণুতে রাজার ডাকঘরের মোহর আঁকা দেখিয়াছে, প্রত্যক্ষ বস্তুব অন্তরালে যে অপ্রত্যক্ষ মহান্ শক্তির অস্তিত্ব রহিয়াছে, তাহার জন্য অমলের বিশেষ কোন আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় নাই। রাজার মোহর-আঁকা চিঠির জন্যই সে অপেক্ষা কবিয়াছে, রাজার জন্য অপেক্ষা কবে নাই। কিন্তু সুদর্শনা রাজাকেই চাহিয়াছেন, এমন কি, অদৃশ্য রাজা যখন তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'এত বিচিত্র রূপ দেখছ, তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখ্‌তে চাচ্ছ?' তখনও সুদর্শনা সন্তুষ্ট হন নাই। কিন্তু বাজাব এই 'বিচিত্র রূপ' প্রত্যক্ষ কবাব মধ্যেই অমলের কৌতূহল নিবদ্ধ ছিল, 'অরূপ রতন'কে প্রত্যক্ষ করিবাব তাহার কোনই কামনা ছিল না। এই জন্যই সুদর্শনাব যে ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, কিংবা সেই ভ্রান্তি-জনিত যে দুঃখ তাহাকে ববণ করিতে হইয়াছিল, অমল তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অমল সত্যাশ্রিত। অমলের মনে যে আকাঙ্ক্ষাব পবিচয় পাওয়া যায়, তাহা মানব-মনের একটি সহজ প্রবৃত্তি মাত্র। আমরা সংস্কার দ্বারা এই প্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখি, কিন্তু যে বালক—বাহ্যসংস্কার এখনও যাহাব অন্তরের স্বভাবিকতা বিনষ্ট করিতে পারে নাই—তাহার নিকট এই প্রবৃত্তি দুর্নিবার হইয়া উঠে। সেইজন্য কৌতূহলী বালকেব মধ্য দিয়াই নাট্যকাব এই ভাবটি সার্থকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 'গল্পগুচ্ছে'র 'অতিথি' গল্পের তারাপদর ন্যায়, 'ডাকঘর'-এর অমলও মানবাত্মার প্রতীক্। বন্ধনই আত্মার পীড়া। অমলের পীড়া শারীরিক কোন বিকার মাত্র নহে, ইহা মনের অস্বস্তি-অবস্থা, চারিদিকের বন্ধন হইতেই এই অস্বস্তিব জন্ম। এই বন্ধন হইতে মুক্তিই আত্মার চিরন্তন কাম্য; একমাত্র মৃত্যুর মধ্য দিয়াই এই মুক্তি সম্ভব হইয়া থাকে।

কেহ আবার বলিয়াছেন, 'অমলের পীড়া বস্তুতঃ অপার্থিবের জন্য আত্মার আকুলতা। এর পরিণতি হ'ল পার্থিব সীমায়িত সত্তার অবসান, অসীমের মধ্যে তার বিলুপ্তি, অর্থাৎ মৃত্যু।' কিন্তু এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের মতে মৃত্যু অর্থে বিলুপ্তি নহে, তাঁহার মতে মৃত্যু নূতন জীবনের সূচনা করে। মানুষ অনন্ত জীবন-পথ যাত্রী, জীবন-পথের শেষ নাই, অমল রুদ্ধ গৃহের জানালা খুলিয়া পথের দিকে যে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকে, তাহার তাৎপর্যই এই যে, সে জীবন-পথে চলিতে চলিতেই জীবনের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে চায়, বন্ধনের মধ্যে তাহার স্বাদ পাইবে না, তাহা সে বুঝিতে পারে। অনন্ত জীবনের স্পর্শ সে পাইয়াছে। সেইজন্য তাহার এই আকুতি প্রকাশ পায়। মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনের মুক্তি আসিলেও তাহাতে জীবনের বিনাশ হয় না।

এই সাঙ্কেতিক নাট্যকাহিনীর পরিণতিটি অত্যন্ত করুণ এবং মর্মস্পর্শী। 'রাজা'র পরিণতিটি এত প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট নহে বলিয়া ইহার মত তাহা এত গভীর ভাবে অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না। চারিদিকের জীবন-কোলাহলের মধ্যে একটি মানবাত্মা চিরসুষুপ্তিমগ্ন হইয়া পড়িল। স্নেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, একমাত্র অবিনাশী প্রেম তাহার স্মৃতির শিয়রে জাগিয়া রহিল। মর্ত্যে প্রেমই সুধা; সেইজন্য সুধা তাহাকে ভুলিতে পারিল না। একটি রহস্য-ঘন নিথর-নিস্তব্ধ জীবনলোকের উপর ধীরে ধীরে যেন মৃত্যুর নীল যবনিকা পড়িয়া গেল।

'অচলায়তন'

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও এ যাবৎ কাল কোনদিনই ব্রাহ্মধর্মের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসেন নাই। তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়াও এ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের মূল আদর্শের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার গোঁড়ামি কিংবা নিষ্ঠার পরিচয়ও প্রকাশ পায় নাই। 'গীতাঞ্জলি'র যুগে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বিকাশ হয়, তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের ব্রহ্মবাদের আদর্শগত ঐক্য ছিল। এই সময় হইতেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নানাভাবে সক্রিয় সহানুভূতি দেখাইতে থাকেন। এই সময়েই তিনি মাঘোৎসবে কলিকাতায় সর্বপ্রথম আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য-রূপে ব্রাহ্মধর্ম-বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ক্রমান্বয়ে কিছুকাল পর্যন্ত বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্মের মূল আদর্শ ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। এই সময় বক্তৃতা ও প্রবন্ধের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁহার প্রবল সহানুভূতি প্রকাশ পায়। স্বধর্ম ও সমাজের প্রতি তাহার এই প্রবল সহানুভূতির যুগে হিন্দু-সমাজের আচার-জীবনকে প্রচ্ছন্ন ভাবে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি এক রূপক নাট্য রচনা করেন, তাহার নাম 'অচলায়তন'। ইহা কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার বিষয় বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ :

'অচলায়তন' একটি আবাসিক শিক্ষাভবনের নাম, সেখানে প্রাচীন সনাতন ধর্মীয় আচারসমূহ শিক্ষা দেওয়া হয়, চারদিক ঘিরিয়া উচ্চ প্রাচীর তুলিয়া জগতের সঙ্গে ইহার বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা হইয়াছে, হাজার হাজার বছরের মধ্যেও ইহাতে বাহিরের সূর্যালোক প্রবেশ করে নাই, বাহিরের চঞ্চল জগতের সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই। ইহাতে আচার্য আছেন, উপাচার্য আছেন, উপাধ্যায় আছেন এবং বিবিধ আচার-নিষ্ঠ প্রবীণ ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সুকুমারবয়স্ক শিক্ষার্থী বালক পর্যন্ত আছে। তাহারা প্রত্যেকেই উপাধ্যায়ের নির্দেশ মত প্রাত্যহিক বাঁধা মন্ত্র পাঠ ও নির্দিষ্ট আচারসমূহ পালন করিয়া থাকে। মহাপঞ্চক ও পঞ্চক দুই ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ মহাপঞ্চক আচারনিষ্ঠ প্রবীণ ব্যক্তি, কনিষ্ঠ পঞ্চক আচার-বিদ্রোহী নবাগত। মহাপঞ্চক কনিষ্ঠকে আচার-ধর্মে দীক্ষিত করিয়া লইতে চাহেন, কিন্তু সে কিছুতেই নিয়মের বশে আসিতে চাহে না। 'অচলায়তন'-এর আচার্য তাহাকে স্নেহ করেন। এই

আচার্য নিয়মভঙ্গকারী এক বালককে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত হইতে মুক্তি দিয়া 'অচলায়তনে'র অন্যান্য অধিবাসীর অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন; তাহারা পঞ্চক ও আচার্যকে অন্ত্যজ জাতির পল্লীতে নির্বাসিত করিলেন। শোনা গেল, 'অচলায়তন'-এ গুরু আসিবেন; এই গুরুকে আচার্যই চিনিতেন, তিনি নির্বাসিত; অতএব কে তাঁহার অভ্যর্থনার ভার লয়? অবশেষে গুরু আসিলেন, কিন্তু 'অচলায়তন'-এর দ্বারপথ দিয়া প্রবেশ করিলেন না, তিনি তাঁহার সহচর অন্ত্যজ জাতি শোণপাংশুদিগের সহায়তায় 'অচলায়তন'-এর প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। 'অচলায়তনে'র বহুদিনের অবরুদ্ধ অন্ধকার ঘুচিয়া গেল, সকলে দেখিল, এই গুরু আর কেহই নহেন, তিনি সকলের দাদাঠাকুর।

বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত 'দিব্যাবদানমালা' নামক গ্রন্থে 'পঞ্চকাবদান' নামে একটি অবদান বা নীতিমূলক কাহিনী আছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই:

এক ব্রাহ্মণ নিতান্ত বিষণ্ণভাবে একদিন এক পথের ধারে বসিয়াছিলেন। সেইখান দিয়া এক বৃদ্ধা যাইতেছিলেন, ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাছা, তুমি এমনভাবে বসিয়া কি ভাবিতেছ?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমার স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা, প্রসব-কাল আসন্ন হইয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁহার একটি সন্তান হইয়াও বাঁচে নাই, এইটিও বাঁচিবে এমন ভরসা নাই।' বৃদ্ধা বলিলেন, 'আচ্ছা, যখন সময় হইবে, তখন আমাকে সংবাদ দিও।' যখন সময় হইল, তখন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন, বৃদ্ধা আসিয়া প্রসূতির সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, নির্বিঘ্নে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। বৃদ্ধা শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখে ননী ছোঁয়াইলেন। তারপর পরিষ্কার কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া শিশুকে পিতার কোলে তুলিয়া দিলেন। বলিলেন, 'ইহাকে লইয়া নগরের চতুষ্পথে যাও, পথ দিয়া যে ব্রাহ্মণ কিংবা শ্রমণ যাইবে তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিও, "ভদন্ত, এই শিশু আপনাকে প্রণাম করিতেছে।" সারাদিনের পর ইহাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিও।' ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। শিশু মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল। শিশুর নাম হইল মহাপঞ্চক। তারপর এই ব্রাহ্মণের আর একটি পুত্র হইল, এইভাবেই তাহারও প্রাণ রক্ষা পাইল। তাহার নাম হইল পঞ্চক। পিতার মৃত্যুর পর মহাপঞ্চক বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই অর্হৎ হইলেন। পঞ্চক কিছুই করিতে পারিল না, সে হইল একজন মহামূর্খ, কোন বিদ্যাই সে লাভ করিতে পারিল না। মহাপঞ্চক একদিন বিরক্ত হইয়া তাহাকে মঠ হইতে দূর করিয়া দিলেন।

মঠ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পঞ্চক পথের ধারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন ভগবান বুদ্ধ তাহার প্রতি করুণাপরবশ হইয়া একজন ভিক্ষুকে তাহার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। তারপর পঞ্চকও একদিন অর্হৎ পদে উন্নীত হইল। এই বিষয়ে পূর্বজন্মের সুকৃতি তাহাকে সাহায্য করিল।

এই নাটক প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমালোচক-গণ অভিযোগ করেন যে, ইহা দ্বারা হিন্দুধর্মের আচারানুষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, ইহা রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রদায়িক মনোভাব-মূলক রচনা। রবীন্দ্রনাথ আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া এই প্রতিবাদের উত্তর দিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ইহাতে অর্থহীন আচারকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করেন না, এ কথাই এই নাটকের মধ্য দিয়া বলিয়াছেন। এ কথা তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকাব্য 'বিসর্জনে'র মধ্য দিয়াও বলিয়াছিলেন, হিন্দুধর্মের উপর আঘাত তাহাতেও ছিল, কিন্তু তাহা ইহার মত এত প্রত্যক্ষ ও নির্মম হইয়া উঠিতে পারে নাই।

বস্তুতঃ ববীন্দ্রনাথ 'অচলায়তনে'ব ভিতব দিয়া যে সমাজেব রূপ প্রকাশ কবিয়াছেন, তাহা মুখ্যতঃ হিন্দুসমাজ নহে এবং যে ধর্মকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহাও হিন্দুধর্ম নহে, তাহা সম্পূর্ণ বৌদ্ধ সমাজ এবং মহাযান বৌদ্ধধর্ম। যে যুগে বৌদ্ধধর্ম একান্ত আচার-সর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছিল, সেই যুগের বৌদ্ধ সমাজেব কথাই তিনি তাঁহাব নাটকে প্রকাশ কবিয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক হিন্দু-সমাজই যে তাঁহার লক্ষ্য ছিল, তাহা অস্বীকাব কবিবাব উপায় নাই। হিন্দু সমাজকে এত প্রত্যক্ষভাবে তিনি আঘাত কবিতে পারিতেন না বলিয়াই যে সমাজ ভারতেব ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহাকেই তিনি তাঁহার আক্রমণের উপলক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল হিন্দুসমাজ। হিন্দুসমাজেব নানা দোষ-ত্রুটিকে তিনি নানা রচনায় নানাভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, ইহা তাহাদের মধ্যে তীব্রতম। তবে তাহা প্রত্যক্ষ নহে, অপ্রত্যক্ষ।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* নামক গ্রন্থ হইতে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নাটকে উল্লেখিত ধারণী মন্ত্রগুলি এবং বিভিন্ন চরিত্রের নাম তিনি এই গ্রন্থ হইতে লইয়াছিলেন। তবে এ বিষয়ে তিনি কিছু কিছু স্বাধীনতাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'অচলায়তনে' অদীনপুণ্য নামক যে একটি চরিত্র আছে,

তাহা রবীন্দ্রনাথের নূতন যোজনা। তবে এই নামটি বৌদ্ধসাহিত্য হইতে গৃহীত। 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা'য় এই নামে একটি কাহিনী আছে।

মূল বৌদ্ধ কাহিনীর পঞ্চক মূর্খ; কিছুই সে শিখিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ পঞ্চকের মূর্খতাকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়া তাহাকে রসিকরূপে আঁকিয়াছেন। অচলায়তনের আচার অনুষ্ঠানের বিদ্যাকে যে সে গ্রহণ করিতে পারে নাই, সে তাহার অক্ষমতাবশত নহে, আসলে সে এই কৃত্রিম বিদ্যার ভার বহন করিতে চাহে নাই। এই বিদ্যা মানুষকে বিকাশ পাইতে দেয় নাই, আচারের গণ্ডীতে তাহাকে বলয়িত করিয়াছে। পঞ্চক সুযোগ পাইলেই অচলায়তন হইতে বাহির হইয়া শোণপাংশুদের সঙ্গে মিশিত। শোণপাংশু আর দর্ভকেরা থাকে অচলায়তনের বাহিরে। শোণপাংশুরা কর্মচঞ্চল জাতি। একটা কিছু করিতে পারিলেই তাহারা খুসী। তাহাদের অফুরন্ত প্রাণাবেগে কোনও নীতিতেই তাহারা বাঁধা থাকিতে পারে না। শোণপাংশুদের মধ্যে পঞ্চক দেখিয়াছে মুক্তি। এই মুক্তিও অবশ্য যথার্থ মুক্তি নয়, কারণ, ইহাদের কর্মস্পৃহা কোন লক্ষ্যে তাহাদিগকে লইয়া যায় নাই। এ যেন কাজের জন্যই কাজ করা, অচলায়তনের মত ইহারাও লক্ষ্যচ্যুত। তবু শোণপাংশুরা মুক্তির পথ রচনা করিয়াছে, পঞ্চক সেই পথেরই পথিক হইতে চাহে। দর্ভকেরা অন্ত্যজ জাতি। কিন্তু ইহারা রসের সাধনা করিযাছে। তাহারা ভক্তিপথের পথিক। এই সাধনাতেও অন্ধতা আছে। এই অন্ধতা যুক্তিহীন বিশ্বাসের, কর্মহীন শান্তির। তবু ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে আত্মনিবেদনের পরম চরিতার্থতা।

পঞ্চক যতক্ষণ পর্যন্ত ইহাদের সান্নিধ্যে আসে নাই, ততক্ষণ তাহার প্রাণ যে কি চায়, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। সে চাহিয়াছে মুক্তি। নিয়মবদ্ধ মানুষের মুক্তি পিপাসার প্রতীক্ সে। দর্ভক আর শোণপাংশুদের মাঝখানে যখন সে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার অস্ফুট পিপাসাও ধীরে ধীরে আকার গ্রহণ করিল। পঞ্চক শোণপাংশুদের কর্মময় জীবন লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিল, আবার দর্ভকদের সারল্যও তাহাকে মুগ্ধ করিল। যেন সব মিলিয়াই সে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। গুরু আসিয়া তাহাকে যে আয়তনের আচার্য করিয়া দিলেন, সে আয়তন দর্ভক এবং শোণপাংশুদের লইয়া সরস হইয়া উঠিল। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের সমন্বিত পূর্ণতারই আয়তন সে। পঞ্চক পূর্ণ জীবন-সাধনার আচার্য।

অস্পষ্ট হইলেও পঞ্চক চরিত্রে এই ভাবের অভিব্যক্তি আছে। নাটকীয়

চরিত্রে আমরা যে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং ক্রমবিকাশ আশা করি, পঞ্চকের চরিত্রে অবশ্য তাহা নাই। রক্তমাংসের মানুষের অটল বিশ্বাস কিংবা তাহার পরিণাম, ব্যক্তিজীবনের বাস্তব প্রবৃত্তি কিংবা ক্ষুধা—এই চরিত্রে দেখান হয় নাই। এই ধরণের মানবীয় চরিত্র পঞ্চক নয়। সমালোচকগণ এই চরিত্রকে বলিবেন রূপক। কবিপ্রাণের বিশেষ ভাবের বিগ্রহ হইতেছে পঞ্চক। এই রূপকচরিত্রে আকাঙ্ক্ষা ক্রমবিকশিত হইয়া রূপ লইয়াছে বিশ্বাসে। গানের সুরে এই সূক্ষ্ম মানসিক পরিণতি সূচিত হইয়াছে। অচলায়তনের বন্দিদশায় প্রাণ যখন মুক্তির জন্য অধীর, তখন সে গাহিল—

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ তা জানে না.
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না।

সুভদ্র উত্তর দিকের জানালা খুলিয়া দেখিয়াছিল, নীল পাহাড আর প্রসারিত প্রান্তর। শুনিয়া পঞ্চক আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই গানে পঞ্চকের ব্যাকুলতা বড করুণ। কিন্তু এই ব্যাকুলতার কোনো রূপ নাই। তাহাব আকাঙ্ক্ষিতকে সে চেনে না, জানেও না। তারপর সে দেখিল, শোণপাংশুদের কর্ম্মমুখর জীবন। দেখিয়া তাহাদের উদ্দাম সচলতায় মুগ্ধ হইল। পঞ্চক অনুভব করিল, সে চাহে এই গতিবেগ। তখন তহার কণ্ঠে বাজিল এই গান—

হারে রে রে রে রে—
আমায় রাখবে ধরে কেরে।
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্নবাধার বক্ষ চেরে।

দাবানলের প্রচণ্ড নৃত্যলীলায় যেমন গতির উন্মাদনা আছে, বজ্রের বেগেও আছে তেমনি সচল মত্ততা, আবার ঝডেও তো সেই গতির সঙ্গীত! এই গানটিতে বন্ধনহীন গতিধর্মের জন্য আকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। এই গতির সাধনা সে প্রত্যক্ষ করিল শোণপাংশুদের মধ্যে। তাহাদিগকে দেখিয়া তাহার

সেখানে মুক্তিপিপাসু মানবাত্মারই প্রতীক্। এই মুক্তি সীমাবদ্ধ দেহজীবন হইতে মুক্তি। 'ফাল্গুনী' নাটকেও মৃত্যুর সীমাকে অতিক্রম করিয়া পাওয়ার আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে। সমাজে হোক, ধর্মে হোক, বিশ্বাসে হোক, জীবন সাধনাতেই হোক, যেখানে যা কিছু অচল অবরোধ সৃষ্টি করে, কবি তাহা হইতেই মুক্তি চাহিয়াছেন। কাব্য কল্পনার দিক হইতে কবি যেমন সুদূরের যাত্রী—'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী, কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাশরি'—জীবনের দিক হইতেও তেমনই তিনি নিরবচ্ছিন্ন গতিরই পিপাসু। যাহা দীর্ঘকাল বাঁধিয়া রাখে, বিকাশকে তাহাই স্তব্ধ করে। চলাই হইতেছে বিশ্বের নিয়ম। সুদূরের স্বপ্ন-রচনা করিয়া সীমাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার ইচ্ছাই রোমান্টিকতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রোমান্টিক কবিধর্ম বলে বিচিত্র ভাবে কাব্যে নাটকে বন্ধনকে অতিক্রম করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। এই আকাঙ্ক্ষার বশেই তিনি 'অচলায়তন' নাটকেও ধর্মজিজ্ঞাসু। যে ধর্ম বাঁধে, সেই ধর্ম বিকাশে সহায়তা করে না। পঞ্চক সেইজন্য এই ধর্ম হইতে মুক্তি চাহিয়াছে, বিশ্বমানবের সচল ধর্মে সে চরিতার্থতা সন্ধান করিয়াছে। মূল কাহিনীর বৌদ্ধ আদর্শের সঙ্গেও সেইজন্যই ইহার নিগূঢ় ঐক্য।

'দিব্যাবদানমালা'র কাহিনীতে বুদ্ধ পঞ্চককে যথার্থ জ্ঞানের আলো দান করিয়াছিলেন। 'অচলায়তনে'ও পঞ্চককে গুরু যথার্থ জ্ঞানের সম্পদ দিয়াছেন। প্রাচীন কাহিনীর বীজটি আধুনিক কবির চিত্তক্ষেত্রে নতুন অর্থে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়াছে। ইহাতে যেমন আছে কবির রোমান্টিক পিপাসা, তেমনি তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে আধুনিক সমাজ-জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা এবং বিচার এই যুগেরই বৈশিষ্ট্য। আচার-শৃঙ্খলিত সমাজের সার্থকতা লইয়া তিনি প্রশ্ন তুলিলেন। এই উভয়ে মিলিয়া কবি প্রাচীন 'পঞ্চকাবদান'কে নতুন অর্থে অর্থবান করিলেন। ([illegible] দত্ত, 'জগজ্জ্যোতিঃ', ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৭-১০-এ প্রকাশিত 'পঞ্চক' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

১৩০০ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' নামক কাব্য-গ্রন্থে 'দেউল' নামক একটি কবিতায় এই নাটকের ভাবটি সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়। তারপর সমসাময়িক 'গীতাঞ্জলি'র যুগে এই ভাবটির স্পষ্টতর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে' কিংবা 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন'—প্রভৃতি গানের মধ্য

মনে হইল, সে বুঝি এমনি মত্ততাই চায় ; কিন্তু তাহা নহে। 'এই শোণপাংশু-গুলো বাইরে থাকে বটে, কিন্তু দিনরাত্রি এমনি পাক খেয়ে বেড়ায় যে বাহিরটাকে দেখতেই পায় না।' কর্মকেই সে চায়, মত্ততাকে নয়। দর্ভকদের আবার শোণপাংশুদের বিপরীত ধর্ম। ইহাদের বিনম্র প্রশান্তিটুকু লোভনীয়। এই সহজ আত্মনিবেদনে সৌন্দর্য আছে। কোন ক্ষোভ, কোন জিজ্ঞাসা না রাখিয়া ইহারা জীবনকে পরিণত করিয়াছে মধুস্থলীতে—

যে মধুটি লুটিয়ে আছে
দেয় না ধরা কারো কাছে
ওদের সেই মধুতে কেমন মন ভরেছে রে।

পঞ্চক এই মধুর কাঙ্গাল। দর্ভকদের মধ্যে তাহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জীবনের আর একটি দিক লাভ করিল। তাহার কাম্য বস্তু তাহার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য তাহার মনে আকুলতা আসিয়াছিল, তাহা যে এই জীবনকে লইয়াই পর্বে পর্বে যেন তাহার কাছে আভাসিত হইয়াছে।

কিন্তু শোণপাংশুই হোক, আর দর্ভকই হোক, কেহই পূর্ণ জীবনের সন্ধান পায় নাই। কাহাকেও স্বতন্ত্র করিয়া পূর্ণতা লাভ করা যায় না। অচলায়তন, শোণপাংশু আর দর্ভকের তিন সাধনার ধারা যখন মিলিত হইল পঞ্চকে, তখন তাহার হৃদয়ের ত্রিবেণীসঙ্গমেই রচিত হইল মহামানবের মিলন-তীর্থের আদর্শ, অখণ্ড পূর্ণায়ত জীবন। পঞ্চকের এই গানটিতে আছে তাহারই বাণী—

আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে।
আমি আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।

অচলায়তনের বিদ্রোহী এইবার নিজেকে ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া দেওয়ার যিনি বিধাতা, তিনি অচলায়তনের গুরু, শোণপাংশুদের দাদাঠাকুর আর দর্ভকদের গোঁসাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিচিত্রভাবে অরূপের জন্য পিপাসা প্রকাশ পাইয়াছে। 'অচলায়তন' নাটকে সেই পিপাসা মহাজীবনের কল্পনায় দীপ্ত হইয়াছে। পঞ্চক-চরিত্র তাহারই রূপক। এই পঞ্চকও রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিপ্রকৃতির প্রতীক্। 'রক্তকরবী'তে যে প্রাণ যন্ত্রজীবনেও উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, রঞ্জন ছিল তাহারই প্রতীক্। রক্তকরবীর যন্ত্র এখানে স্থান লইয়াছে ধর্মের অবরোধরূপে। 'ডাকঘর' নাটকে কবি তাহাকে আরও বিশ্বাশ্রয়ী অর্থ দান করিয়াছেন। অমল

ও এই ভাবটিই প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু 'অচলায়তনে' এই ভাবটি শ করিবার মধ্যে বিশেষ একটি সামাজিক পরিবেশকে প্রত্যক্ষ ভাবে ম্বন করিয়া তাহার মধ্য দিয়া অন্য একটি বিশেষ সমাজ-জীবনের প্রতি ঙ্গত করা হইয়াছে। 'গীতাঞ্জলি'র গানের মধ্য দিয়া যে-ভাবটি সম্পূর্ণ নিরবলম্ব ইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, নাটকের মধ্য দিয়া সেই ভাবটি একটি বিশিষ্ট সমাজ-পকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে এবং যে-সমাজকে লক্ষ্য করিয়া এই ভাবটি প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে-মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তীব্র ব্যঙ্গাত্মক। ব্যঙ্গাত্মক রচনার মধ্যে চিত্রগত অতিরঞ্জনের দোষ অপরিহার্য হইয়া উঠে, এই নাটকের মধ্যেও তাহাই হইয়াছে। এই ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব সবত্রই নাটকের সৌন্দযে আঘাত করিয়াছে, একটি উদার ভাব-স্বপ্ন একদেশদর্শিতার ত্রুটিতে কদয বস্তুব জঞ্জালে জডাইয়া পডিয়া ইহার অনাবিল মহনীয়তা বিসর্জন দিয়াছে।

রবীন্দ্র-সাধনাব প্রধান সুর বন্ধন হইতে মুক্তি, তাঁহার 'প্রভাত-সঙ্গীত'-এর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমগ্র জীবন ব্যাপিয়াই তিনি এই মুক্তিব জয়গান গাহিয়াছেন। সংস্কাব বা আচার ইহারাও বন্ধন, অতএব ইহাদের ভিতর হইতেও তিনি সর্বদাই মুক্তির পথ সন্ধান করিয়াছেন। 'অচলায়তনে'ও তিনি আচারের শৃঙ্খলে বন্দী জীবনের মধ্যে মুক্তির আলোকপাত কবিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু কতকগুলি রচনাগত ত্রুটির জন্য এই ভাবটি নাটকে সুপরিস্ফুট হইতে পাবে নাই।

নাটকটির প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাব লক্ষ্য একটি 'আইডিয়া' বা ভাব-স্বপ্ন মাত্র; কিন্তু এই ভাবটি প্রকাশ করিতে গিয়া বস্তুগত পরিবেশের উপর এত বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে যে, নাটকের লক্ষ্যগত ভাব বা 'আইডিয়া'র পরিবর্তে ইহার বহিরঙ্গ পরিচয়টিই প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দেবদেবীর নাম, তাহাদেব সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি মন্ত্রোচ্চারণ, কিংবা তৎসম্পর্কিত আচাবানুষ্ঠানের বিস্তৃত তালিকাগত পবিচয় এই নাটকের মূল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছে। সাঙ্কেতিক বা রূপক নাটক ভাব-প্রধান, বস্তু-প্রধান নহে; কিন্তু এই নাটকে রচনার ত্রুটিতে ভাবের উপর বস্তু প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে।

এই নাটকের দাদাঠাকুর চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের দাদাঠাকুর চরিত্র হইতে স্বতন্ত্র। দাদাঠাকুর এই নাটকে সত্যের রূপক। কিন্তু তাহার

পরিচয় এখানে সুপরিস্ফুট নহে। তিনি এখানে অন্ত্যজের সহচর—যাহারা সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের অধিকারী, তাহারা তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে পারে। সহজ এবং স্বচ্ছন্দ জীবন দিয়া তিনি কৃত্রিম সংস্কার-বদ্ধ জীবন জয় করিলেন—অন্ত্যজ শোণপাংশুদিগের সহায়তায় অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার ইহাই তাৎপর্য। অন্ত্যজ জাতি দর্ভকদিকের পল্লীতেও তাঁহার যাতায়াত আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে এই অন্ত্যজ জাতির পল্লীই প্রকৃত সত্যপীঠ; সত্যাশ্রয়ী আচার্য ও পঞ্চক অচলায়তন হইতে এখানেই নির্বাসিত হইলেন, সত্যস্বরূপ দাদাঠাকুরও এখানেই নিত্য যাতায়াত করিয়া থাকেন। এই অন্ত্যজ জাতির আঘাতেই অচলায়তনের মিথ্যার প্রাচীর ধ্বংস হইয়া গেল। অচলায়তনের নিশ্ছিদ্র সংস্কারান্ধতার বৈপরীত্য কল্পে অনাচারী অন্ত্যজ জাতির মধ্যে সত্যপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস এই নাটকে খুব সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। অন্ত্যজ জাতিগুলির পরিকল্পনাও এখানে খুবই অস্পষ্ট। একজন সমালোচক ইহারা যে কিসের প্রতীক তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের মধ্যে সত্যের সন্ধান করিতে গিয়া ইহাদিগকে সত্যের প্রতীকরূপেই পরিকল্পনা করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু এই ভাবটি নাটকের মধ্যে প্রকৃতই অত্যন্ত অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

দাদাঠাকুরকেও সত্যের প্রতীকরূপেই এই নাটকে উপস্থিত করা হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে এখানে সাঙ্কেতিকতার আভাস রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহার মধ্যে 'গীতাঞ্জলি'র ভগবানোচিত সত্যের সেই মহান্ ও উদার পরিচয় নাই। নাটকের পরিবেশের মধ্যে তাঁহার সংস্থান সর্বত্রই খাপছাড়া হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। এমন কি, তাঁহার নিত্য অনুচর শোণপাংশু-দিগের সঙ্গেও তাঁহার যে যোগ, তাহাও নিবিড় বলিয়া অনুভূত হয় না। যদিও এই নাটকে দাদাঠাকুরকেও স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য লইয়া পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তথাপি অন্যান্য নাটকের দাদাঠাকুরের ন্যায় তাঁহার প্রকৃতিটি এখানে অতি-ভাষণ ও আত্মসচেতনতার দোষে দুষিতই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার ভাষণ এবং আচরণ সর্বত্রই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, তাহাতে 'অগ্নিগর্ভ মেঘের ন্যায় কোন গোপন মহিমার- বিদ্যুৎ বিকাশ দেখা যায় না।' সেইজন্যই চরিত্রটির দ্বারা নাট্য-কাবের প্রকৃত উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইতে পারে নাই। আচার্য অদীনপুণ্যের সংশয় ও বালক সুভদ্রের কৌতূহল এই নাটকের মধ্যে উচ্চাঙ্গ কাব্যরসের আভাস-টুকু মাত্র দেয়, কিন্তু পঞ্চকের অকালপক্কতা দাদাঠাকুরের বাচালতার মতই

দিক ভরিয়া দিতেছে, কিন্তু রাজা নিজের শক্তিতে পৃথিবীর বুক হইতে 'মরা ধন' দিনরাত ছিনাইয়া লইতেছে। নন্দিনী রাজার বিপুল শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হয়, কিন্তু সে তাহাকে ভয় করে না। রাজা তাহার বিপুল শক্তি দিয়া নন্দিনীকেও জয় করিতে চায়, কিন্তু পাবে না। শক্তির নিকট নন্দিনী ধরা দেয় না, কিন্তু রঞ্জনের কাছে সে অতি সহজেই ধরা দেয়, সেইজন্য রঞ্জনের প্রতি রাজার ঈর্ষা। যক্ষপুরীর নিবন্ধ অন্ধকারে নন্দিনী রঞ্জনের অপেক্ষায় দিন যাপন করিতে থাকে। যক্ষপুরীর খোদাইকরেরা কাজের অবসরে মদ খাইয়া বাহিরের জগৎ ভুলিয়া যায়। মন ভুলাইয়া রাখিবার জন্য মদ ছাড়াও যক্ষপুরীতে অন্য ব্যবস্থা আছে, তাহা ধর্ম। যাহাদের মন এক-আধটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিয়া ভুলাইয়া রাখিবার জন্য গোঁসাইজী পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান। যক্ষপুরীতে কেহ মানুষ নাই, প্রত্যেকে এক একটা সংখ্যা মাত্র। সংখ্যার পরিচয়ে তাহাদের পরিচয়। তবু নন্দিনীর সাহায্যে যক্ষপুরীতে যে দুই একজন নিজেদের প্রাণের পরিচয় উদ্ধার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিশু পাগ্‌লা একজন।

একদিন নন্দিনী অনুভব করিল, রঞ্জন আসিবে। কিন্তু ইতিপূর্বেই সর্দার রঞ্জনের পরিচয় পাইয়াছে, সে আসিয়া নন্দিনীর সঙ্গে মিলিত হইলে যক্ষপুরীর আইন কানুন আর টিকিবে না, এই মনে করিয়া সর্দার রঞ্জনকে এই পথে আসিতে দিল না, বিশু পাগ্‌লাকেও ধরিয়া লইয়া গেল। নন্দিনী পথের ধারে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিশোর তাহাকে খুঁজিতে গেল। নন্দিনী তাহার অলক হইতে রক্তকরবীর গুচ্ছ তাহার হাতে দিয়া রঞ্জনকে তাহা দিতে বলিল। কিন্তু কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। নন্দিনী নিজেই খুঁজিতে বাহির হইল, বিশু পাগ্‌লাকে খুঁজিল, রঞ্জনকে খুঁজিল, কাহাকেও পাইল না। যাহাকে পথে পাইল, তাহার নিকট তাহাদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। অবশেষে নন্দিনী রাজার জানালায় আসিয়া ঘা দিতে লাগিল। রাজা বিরক্ত হইল, কিন্তু নন্দিনী বিচলিত হইল না। রাজা দ্বার খুলিয়া দিল, নন্দিনী দেখিল, সেই কক্ষে রঞ্জনের মৃতদেহ মাটিতে পড়িয়া আছে, তখনও তাহার হাতে সেই রক্তকরবীর মঞ্জরী। রাজা নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং 'এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান' পাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বিশু পাগ্‌লাকেও কারিগরেরা বন্দীশালা ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া আনিল। বিশু আসিয়া শুনিল, ইহার পূর্বেই নন্দিনী 'শেষ মুক্তি'তে

সকলের আগে বাহির হইয়া গিয়াছে, রক্তকরবীর মঞ্জরীটি তাহার ডান হাত হইতে খসিয়া ধূলায় লুটাইতেছে, বিশু নন্দিনীর রিক্ত হস্তের শেষ দানটি কুড়াইয়া লইল।

এই কাহিনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ইহা 'সত্যমূলক'। এই সত্য বলিতে অবশ্য কাব্যেরই সত্য বলিয়া মনে করা হইয়াছে, বাস্তব জগতের সত্য বলিয়া মনে করা হয় নাই। কারণ, তিনি আবার বলিয়াছেন, 'এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কি না, ঐতিহাসিকের 'পরে তার প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হ'বে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।' (নাট্যপরিচয়, 'রক্তকরবী')। তথাপি এই কথাটি নাট্যকারের বিশেষভাবে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ কাব্যের সত্য অপেক্ষাও ইহার কতকটা বাস্তব মূল্য আছে, শুধুই কাব্যের কোন ভাবমূলক সত্যপ্রতিষ্ঠা এখানে নাট্যকারের উদ্দেশ্য নহে। ইহার মধ্যে যে সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবহারিক (practical) মূল্য অবিসংবাদিত। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রূপক নাট্য হইতে ইহার বাস্তব মূল্য অধিকতর প্রত্যক্ষ। কারণ, রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ এই শ্রেণীর নাটকের মধ্য দিয়া এক একটা 'আইডিয়া' বা ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই সকল 'আইডিয়া' বা ভাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অনেক সময়ই খুব নিবিড় বলিয়া অনুভূত হয় না। 'মুক্তধারা'র কথাই ধরা যাউক, ইহার মধ্যে প্রকৃতির রাজ্যে যন্ত্রের যে অনধিকার ও অকল্যাণকর হস্তক্ষেপের কথা নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা একটি ভাব-স্বপ্ন মাত্র; তাহার তুলনায় 'রক্তকরবী'র বক্তব্য বিষয় অধিকতর স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ এবং ইহার ব্যবহারিক মূল্যও অধিক। এই হিসাবেই নাট্যকার ইহাকে 'সত্যমূলক' বলিয়াছেন। যন্ত্রদানব সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রাণশক্তি কি ভাবে নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইতেছে, তাহাই এই নাটকের বক্তব্য বিষয়। যন্ত্রের বিবিধ উপকারের কথা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার সংস্পর্শে আসিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনের সহজ আনন্দগুলি যে বিনষ্ট হইতেছে, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই বিষয় বিচার করিলে এই রূপক-প্রধান নাটকের একটি প্রত্যক্ষ মূল্যও অনুভূত হয়। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্রনাথের এই নাটক 'সত্যমূলক' এই দাবী ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—'কবি বলিয়াছেন, এ নাটক রূপক নহে এই জন্য যে, ইহার মূলে একটা সত্যকারের ঘটনা—সে ঘটনা এমনই সত্য যে,

তাহা একটা বিশেষ কাল বা বিশেষ দেশের ঘটনাই নয়, তাহা সর্ব যুগের ও সর্ব দেশের, অর্থাৎ তাহা শুধু বাস্তব নয়—নিত্য বাস্তব। তাই ইহাকে মনোজগতের কাহিনী বলা যাইবে না। তিনি এই নাটকে অরূপ-রতনকে রূপের জবানীতে প্রতিভাসিত করেন নাই, এখানে ঐ বাস্তব রূপটাই মুখ্য, সেই বাস্তবকেই তিনি অরূপে নয়—স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে যে সংগ্রাম বা সংঘর্ষ দেখানো হইয়াছে, তাহাতে মিথ্যা বাস্তবের উপরে সত্য বাস্তবের জয়লাভ হইয়াছে, এক পক্ষে আছে হৃদয়হীন প্রেমহীন শক্তিমদমত্ততা এবং আনুষঙ্গিক গৃধ্নুতা—অন্ধ 'হরণ'-স্পৃহা সেই শক্তি শুষ্ক বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে আপনাকে দুর্ধর্ষ করিতে চায়। অপর দিকে আছে জীবন,—যে জীবন সহজ সরল আনন্দময়, যাহা আকাশের নীল ও পৃথিবীর শ্যামলিমায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়া—বল নয়, বুদ্ধি নয়, লোভের গৃধ্নুতা নয়, প্রেমের দম্ভহীন গর্বহীন অথচ সর্বজয়ী শক্তিতে নব-নারীর মিলন-মেলায় অমৃত বিতরণ করে।'

কাহিনীর ঘটনাস্থলটির কথা ইহার পরই উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ইহার নাম দিয়াছেন যক্ষপুরী এবং ইহার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন পাতাল। মানুষ এখানে তাহার প্রাণশক্তি নিঃশেষ করিয়া যে কঠিন সম্পদ আহরণ করিতেছে, তাহা কুবেরের অদৃশ্য যক্ষপুরীতে গিয়া সঞ্চয় লাভ করিতেছে, রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন, 'লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হোলো আর—অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে, কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোন চরম অর্থ নেই।'

এই অর্থহীন সঞ্চয়ের দ্বারা ধন যেখানে অকারণ বহুলত্ব লাভ করিয়া কল্যাণের পথ চির অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই এই যক্ষপুরী। জাগতিক জীবনের সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই বলিয়াই ইহার অবস্থান জাগতিক জীবন-সম্পর্ক হইতে বহুদূরবর্তী এই পাতাল-লোকে। রূপক ও সাঙ্কেতিক নাট্যের পরিবেশ হিসাবে সূর্যালোক-সম্পর্কহীন পাতালের যক্ষপুরীর পরিকল্পনা খুবই সার্থক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ববর্তী রচনা 'গল্পগুচ্ছ'-এর অন্তর্গত 'গুপ্তধন' নামক রূপক গল্পেও এই পাতালের স্বর্ণ-পুরীর এক রূপক বর্ণনা রহিয়াছে। তাহাতে স্তম্ভিত স্বর্ণস্তূপ ভেদ করিয়া মানবাত্মার যে মুক্তির ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহা এই নাটকের যক্ষপুরীর অধিবাসীদিগের বেদনাবোধ হইতেও তীব্র। তথাপি এই যক্ষপুরীর

পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের সদ্য পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই যে সর্বাং কার্যকরী হইয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। এই সময় পাশ্চাত্ত্য ভ্র হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই যান্ত্রিক সভ্যতার ভয়াবহ স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি 'শিক্ষার মিলন' নামক যে প্রবন্ধ রচনা করেন, তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতেই এইভাবে তিনি এই নাটকের যক্ষপুরীর স্বরূপ উপলব্ধি করেন, 'পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলেম, তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছি? না, পাইনি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অবিচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানব-পুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছিনে —ইংরেজীতে বল্‌তে হোলে হয়ত বলতেম, 'titanic wealth', অর্থাৎ যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল।' পাশ্চাত্ত্য যান্ত্রিক সভ্যতা সম্পর্কিত এই মনোভাবই তাঁহার অনতিকাল ব্যবধানে রচিত 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীর পরিকল্পনার মধ্য দিয়া রূপ লাভ করিয়াছে। তাঁহার অভিজ্ঞতা-লব্ধ দানব-পুরীই 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরী। 'মুক্তধারা'র মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে যন্ত্রের বিরোধ এবং 'রক্তকরবী'র মধ্যে যন্ত্রের সঙ্গে জীবনের বিরোধ নির্দেশ করা হইয়াছে। 'মুক্তধারা'র মধ্যে পাশ্চাত্ত্য যান্ত্রিক সভ্যতা সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস অব্যক্ত রহিয়াছে, 'রক্তকরবী'র মধ্য দিয়া তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে, এই দিক দিয়া 'রক্তকরবী' 'মুক্তধারা'রই পরিপূরক বা Complement মাত্র।

তারপর যক্ষপুরীর রাজা। এই রাজা পাশ্চাত্ত্য যন্ত্রসভ্যতারই প্রতীক। যে যান্ত্রিকতার উপর আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ধনতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা, যক্ষপুরীর রাজার চরিত্রের ভিতর দিয়া তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনাদর্শের সঙ্গে ভারতীয় সহজ জীবনাদর্শের যে বিরোধ আছে, তাহাই ইহার রাজার চরিত্রের মূল বিরোধ বা দ্বন্দ্ব বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই রাজা প্রবল শক্তির প্রতীক, কিন্তু শক্তির মধ্যে শান্তি নাই, তাঁহার অন্তস্তলভেদী ক্ষুব্ধ অশান্তির হাহাকার মধ্যে মধ্যে বাহিরেও ভাসিয়া আসে। অপরিমিত শক্তির উদ্ধত বাহু মেলিয়া সহস্র সুন্দর জীবন সে তাহার কবলগ্রস্ত করিয়া লইতেছে; যৌবনকে সে গ্রাস করিয়াছে এবং এই শক্তি দিয়াই সে সৌন্দর্য ও আনন্দকে অধিকার করিতে চায়। কিন্তু শক্তির দ্বারা আর যে কোন জিনিস লাভ করা গেলেও, সৌন্দর্য বা আনন্দ লাভ করা যাইতে পারে না; আনন্দ অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে হয়, বাহু দিয়া নয়। সেইজন্য জালের

্তার জানালার ভিতর দিয়া সে যখন তাহার শুধুমাত্র হাতখানি বাহির করিয়া দেয়, তখন তাহা দেখিয়া নন্দিনী ভয় পাইয়া দূরে সরিয়া যায়। এই যান্ত্রিক সভ্যতার অন্তরের দিকটা যে একেবারেই রিক্ত এবং এই রিক্ততার বেদনাই যে সমগ্র যক্ষপুরীর ভিত্তিমূল অনবরত শিথিল করিয়া দিতেছে, তাহা রাজার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রকৃতির আনন্দ-আহ্বান তাহার রুদ্ধ দ্বারের প্রান্ত হইতে ফিরিয়া যাইতেছে, যক্ষপুরীর রুদ্ধ ভাণ্ডারের স্বর্ণসঞ্চয় অপেক্ষাও মূল্যবান্ সম্পদ প্রকৃতির আনন্দের দান তাহার দৃষ্টিতে উপেক্ষিত হইতেছে। যে সোনা প্রাণের বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে হয় না, কৃপণের মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিবারও প্রয়োজন হয় না, প্রকৃতির সেই অযাচিত অজস্র ঐশ্বর্যের দান উপেক্ষা করিয়া সে নিজের চারিদিকে এক স্বেচ্ছা-কারাগার রচনা করিয়া তাহাতে নির্বাসিত জীবন যাপন করিতেছে, ইহার অন্তর্বেদনার পরিচয়ে রাজার চরিত্রটি করুণ হইয়া উঠিয়াছে। তবে এই নাটকে রাজার চরিত্রের ভয়াবহ পরিচয়টি অধিকতর পরিস্ফুট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাহা হইলে ইহার বক্তব্য বিষয় অধিকতর স্পষ্ট হইত। নন্দিনীর সঙ্গে সংলাপের ভিতর দিয়া তাহার আদর্শগত দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং নিজের অবস্থার সঙ্গে সে যে অনবরত সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে, তাহাই অনুভূত হয় এবং শেষ পর্যন্ত দেখিতেও পাওয়া যায় যে, এই সংগ্রামই তাহাকে মুক্তির পথে টানিয়া আনিয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে নিজে বলিয়াছেন যে, 'আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।'

যক্ষপুরীর রাজা এক দুর্ভেদ্য জালের অন্তরালে বাস করেন। ইহার তাৎপর্যও অতি সহজ। যে জগতের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দ জীবনস্রোত নিত্য প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গে যান্ত্রিকতার যোগ যে সকল দিক হইতেই বিচ্ছিন্ন, তাহাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। প্রাণপূর্ণ আনন্দময় জগতের মধ্যে বাস করিয়াও কৃত্রিমতা দ্বারা এই ধনস্ফীত যান্ত্রিক সভ্যতা নিজের চারিদিকে এক দুর্ভেদ্য রহস্যজাল রচনা করিয়া তাহার মধ্যে প্রাণহীন নিরানন্দ জীবন যাপন করিতেছে; জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণধারার সঙ্গে কোনমতেই ইহার যোগ স্থাপিত হইতে পারিতেছে না; অথচ জালের রন্ধ্রপথ দিয়া বিশ্বব্যাপী জীবনলীলার আনন্দ কলধ্বনি ইহার কানে আসিয়া পৌছিতেছে। মানুষ এই সভ্যতা নিজেই গড়িয়াছে, কিন্তু ইহা আনন্দের পরিবর্তে শক্তি দিয়া

গড়িয়াছে বলিয়া অন্তরের দিক দিয়া ইহার সঙ্গে তাহার ব্যবধান রচিত হইয়াছে, এই অন্তরের ব্যবধানই জালের ব্যবধান।

ইহার পরই নন্দিনীর চরিত্র উল্লেখযোগ্য। নন্দিনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' ব'লে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকে পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সঙ্কীর্ণতার পীডনে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তেমনি। মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়,—মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।" নন্দিনীকে মানবী অর্থাৎ রক্তমাংসের দেহাশ্রিতা নারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য থাকিলেও এই নাটকে তাহাও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। এমন কি, সমালোচক মোহিতলাল ইহার সম্পর্কে এমনও অনুভব করিয়াছেন যে, 'সে তো মানবী নয়—রক্তমাংসের নারী নয়, তাহাকে নারীপ্রকৃতির একটি ধ্যান-কল্পিত ভাব-মূর্তি বলা যায়।' এই নাটকের অন্যতম চরিত্র অধ্যাপকও নন্দিনী সম্পর্কে অনুভব করিয়াছে, 'সুন্দরী, তুমি যে সোনা সে তো ধূলোর নয়, সে যে আলোর।' সুতরাং নন্দিনীকে রবীন্দ্রনাথ মানবী বলিয়া যে দাবী করিয়াছেন, তাহা সমর্থন করা যায় না। তবে একথা সত্য, এই নাটকে কোন কোন স্থানে তাহার মানবী-সত্তারও বিকাশ হইয়াছে। সেইজন্যই তাহার সম্পর্কে এই কথাই বলা যায় যে, সে 'কখনো বা ভাবময় কখনো মূরতি।' নারী সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের ধারণার একটি পরিণত পরিচয় তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সৌন্দর্য ও কল্যাণ নারীর দুইটি গুণ—নন্দিনীর মধ্যে সৌন্দর্যের গুণই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে। সৌন্দর্যের মধ্যেই আনন্দ, সেইজন্যই নন্দিনী আনন্দের প্রতীক। এই আনন্দ জীবনের দ্বারে আশ্রয় মাগিয়া বেড়ায়, সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া এই আনন্দেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, পীড়নের ভিতর দিয়া নন্দিনীর পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া রক্তকরবী তাহার অলঙ্কার; আনন্দ অন্তরের পরিচয়, সৌন্দর্য তাহার বাহিরের পরিচয়; নন্দিনীর মধ্যেও এই দুইটি পরিচয়ই নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহারও একটি নিজস্ব অন্তরের পরিচয় ও স্বতন্ত্র বাহিরের পরিচয় আছে। অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবানুভূতি মাত্রের উপর ভিত্তি করিয়া এই চরিত্রটির পরিকল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া ইহা সাঙ্কেতিক চরিত্রের লক্ষণাক্রান্ত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে দাবী করিয়াছেন, ইহা একটি 'মানবীর ছবি', তাহা

কার করিয়া লইতে বেগ পাইতে হয়। সমালোচক মোহিতলাল নন্দিনী সম্পর্কে যে বলিয়াছেন, 'সে তো মানবী নয়—রক্ত-মাংসের নারী নয়; তাহাকে নারী প্রকৃতির একটি ধ্যান কল্পিত ভাব-মূর্তি বলা যাইতে পারে।' তাহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহাকে সঙ্কেত এবং রূপক মিশ্র চরিত্র বলাই সঙ্গত। গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে তাহার মধ্য দিয়া সঙ্কেতেরও ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা চরিত্রটির একটি ত্রুটি বলিয়াও স্বীকার করিতে হয়, কারণ, অবিমিশ্র একটি ভাব তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই। তাহার চরিত্র কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন বাস্তব-ধর্মী, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তেমনই রূপক এবং সঙ্কেতের দ্যোতক। এই চরিত্রটির বিষয়ে সমালোচক মোহিতলালের ইহাই প্রধান অভিযোগ।

এই নাটকের অন্যতম রূপক চরিত্র রঞ্জন। রঞ্জন নিখিল-যৌবনের প্রতীক, যৌবন জীবনেরই এক রূপ—জীবনের সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠ পরিচয়। অতএব রঞ্জন জীবনের সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি মাত্র। যক্ষপুরীর রাজা এই যৌবনের শত্রু, যৌবনের শক্তি নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইয়া যক্ষপুরীর রাজা নিজে শক্তিমান হইয়া উঠিতেছে, সেইজন্য যক্ষপুরীতে যৌবনের প্রবেশ নিষিদ্ধ। রঞ্জনও সেইজন্য সর্বত্রই নাট্য-দৃশ্যের বাহিরে রহিয়াছে, কখনও ভিতরে আসিতে পারে নাই। আনন্দ ও সৌন্দর্য যৌবনেরই নিত্যসঙ্গী, সেইজন্য নন্দিনী রঞ্জনের জন্য সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়াছে। কিন্তু যক্ষপুরীর পরিবেশের মধ্যে তাহাদের মিলনের উপায় ছিল না। কারণ, এখানে আনন্দময় যৌবনের বিকাশ অসম্ভব। রাজার কক্ষ উন্মুক্ত হইলে নন্দিনী তাহার মধ্যে রঞ্জনের মৃতদেহ দেখিতে পাইল। যক্ষপুরীর রাজা তাহার প্রবল শক্তির দুর্নিবার আকর্ষণে যৌবনকে নিজের কবলগ্রস্ত করিয়া তাহার প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে। মনে হয়, রঞ্জনের আখ্যানের ভিতর দিয়া নাট্যকারের ইহাই বক্তব্য বিষয়, ইহার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে ইন্দ্রিয়স্পর্শাতীত এই সাঙ্কেতিক-চরিত্রটির মৃতদেহের পরিকল্পনা একটু বিসদৃশ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে আবার ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যৌবনের প্রত্যক্ষ মৃত্যুর নির্মমতা অলোক-পথে নির্দেশ না করিয়া এই ভাবে নির্দেশ করায় নাটকের দিক দিয়া ইহা অধিকতর কার্যকরী (effective) হইয়াছে। তবে এখানে এই প্রশ্নও হইতে পারে, যে রঞ্জন নিখিল-যৌবনের প্রতীক, তাহার কি মৃত্যু আছে? যৌবনাশ্রিত দেহের ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু শাশ্বত যৌবনের

মৃত্যু নাই ; যাহার দেহ নাই, তাহার মৃত্যুও নাই। রঞ্জন এই নাটকের সর্বত্রই বিদেহী ভাব-স্বপ্ন মাত্র ; সুতরাং তাহার কিরূপে মৃত্যু হইবে? সাঙ্কেতিক চরিত্রের মৃত্যু নাই, স্নতবাং যাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে রঞ্জন নহে, তাহার দেহ মাত্র, তাহার ভাব-মূর্তি অমব।

কৈশোব যৌবনের অগ্রগামিনী পদধ্বনি, এই নাটকের কিশোর চবিত্রটি এই হিসাবে বঞ্জনেব পূর্বগামিনী ছায়া, সেইজন্যই নন্দিনীর প্রভাব তাহাব জীবনকে স্পর্শ কবিয়াছে, কিন্তু যে দুর্বাব শক্তির চক্রতলে বঞ্জন নিষ্পেষিত হইয়া গেল, তাহা হইতে তাহাবও পবিত্রাণেব কোন উপায বহিল না। এই নাটকের নেপথ্যচাবী চবিত্র বঞ্জনেব অভাব কিশোবেব দ্বাবাই অনেকটা পূর্ণ হইযাছে, কিন্তু একথাও সত্য, কিশোব এখানে তাহাব বাস্তব পবিচয় বক্ষা কবিতে পাবে নাই, মেরুদণ্ডহীন ভাব-পুত্তলি মাত্র হইযা বহিযাছে। তাহাব আচবণ স্বভাব সরল বিমুগ্ধ কিশোবেব আচবণ নহে, পবিণত বুদ্ধি মানবেব আচবণ। এই নাটকেব অন্যতম উল্লেখযোগ্য চবিত্র বিশু পাগলা। সে অন্য দশজন হিসাবী লোকেব মত বাঁধা চালে চলে না, সেইজন্য সে খাপছাড়া বা পাগল। নন্দিনীব প্রভাব তাহাব মধ্যেও প্রবেশ কবিয়াছে সত্য, কিন্তু বাজপক্ষী যেমন অজগবেব নিঃশ্বাসেব আকর্ষণে কেবল তাহাকে ঘুরিয়া ঘুবিযাই উড়িতে উড়িতে পবিণামে তাহার মুখগহ্বরে প্রবেশ কবে, সেও তেমনই যন্ত্রদানবেব দুর্নিবাব আকর্ষণে কেবলই তাহাব চাবিদিকে ঘুবিযা বেড়াইতেছে, ইহাব সংস্পর্শে যে একবাব আসিযাছে, সে যে কোন ভাবেই নিষ্কৃতি পাইতে পাবে না, তাহাব চবিত্রেব মধ্য দিযা তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। এই নাটকেব অন্যান্য চবিত্রেব মধ্যে মোড়ল চবিত্রটি একটু জটিল প্রকৃতিব। নন্দিনীব প্রভাব তাহাব মধ্যেও প্রবেশ কবিযাছে, কিন্তু বাহিবে তাহা সে কোন ভাবেই স্বীকাব কবিতে চাহে না। নন্দিনীব সঙ্গে বিবোধিতা দ্বারাই সে তাহাব অন্তবের সেই প্রভাবেব ফল প্রকাশ কবিয়া থাকে। এই ভাবে অন্যান্য বিভিন্ন চবিত্রেব উপব একদিক দিযা যান্ত্রিকতাব প্রভাব ও অপব দিকে নন্দিনীর প্রভাব যে কি ভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, নাট্যকাব তাহা অতি কৌশলেব সঙ্গে নির্দেশ করিয়াছেন। মোড়ল ও সর্দারেব চরিত্রেব মধ্যে তাহাদের বিষয়-বুদ্ধিব যে পবিচয় পাওয়া যায়, তাহা রবীন্দ্রনাথের লোক-চবিত্রে গভীব জ্ঞানেবই পবিচাযক।

'বক্তকরবী'ব মধ্যে একটি অধ্যাপকেব চবিত্র আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, এই নাটকে যক্ষপুরীব যে পরিচয় আছে, তাহার মধ্যে জ্ঞান-তপস্বী

অধ্যাপকের স্থান কোথায়? অধ্যাপককে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বিদ্বান্ সমাজের প্রতিনিধি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা 'শুষ্ক বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে আপনাকে দুর্ধর্ষ করিতে চায়।' ইহারা প্রত্যক্ষ জীবন হইতে জ্ঞানের বিষয় আহরণ করিয়া তাহা জীবনে আচরণ করিবার পরিবর্তে পুঁথির মধ্য হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া মগজের কোটরে সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই শ্রেণীর মেরুদণ্ডহীন বিদ্বান্ সমাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ঘৃণা এই চরিত্রটির মধ্য দিয়া দুর্জয় হইয়া দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী সাঙ্কেতিক নাটক 'ডাকঘরে'র অমল বলিয়াছে, 'আমি দেখ্‌ব আর শিখ্‌ব, পুঁথি প'ড়ে পণ্ডিত হব না।' রবীন্দ্রনাথের মতে দেখা ও শেখাই হইল প্রকৃত শিক্ষা। 'দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে' প্রকৃত শিক্ষা হয় না। রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপকের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার এই ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

এখন অধ্যাপক চরিত্র কোন সূত্রে এই নাটকে আসিল, তাহা বিচার করিলে দেখা যায়, পাশ্চাত্ত্য ধনতন্ত্র বা যন্ত্রবাদ যে 'অবিদ্যা' দ্বারা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যক্ষপুরীর সেই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্যই এই নাটকে অধ্যাপক-চরিত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু এই অধ্যাপক নিজের আদর্শে অচল নিষ্ঠাবান্ নহে, জীবনে নন্দিনীর প্রভাব অনুভব করে, তাহার নিভৃত মানস-আলাপনের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় বাহিরে প্রকাশ পায়। নাটকে নন্দিনীর সঙ্গে তাহার যে সংলাপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা তাহার নিজের মনের সঙ্গেই নিজের নিভৃত আলাপন মাত্র। তাঁহার মস্তিষ্ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইলেও হৃদয়ের একটি অংশ তাহার ভার হইতে এখনও মুক্ত আছে। তাহা দিয়াই কোন কোন সময় সে তাহার জীবনের মধ্যে সরসতা অনুভব করে। ইহাই নন্দিনীর সঙ্গে তাহার সংলাপের তাৎপর্য। নতুবা অধ্যাপককে যে ভাবে রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার সেই জ্ঞানভার-পীড়িত জীবনের কোন অবসরের ভিতর দিয়াই তিনি সহজ জীবনের স্পর্শ অনুভব করিতে পারেন না।

এই নাটকের গোঁসাইজীর চরিত্রের মধ্য দিয়া আচার-ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ মার্ক্সবাদের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কতদূর সত্য, তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। আচার-ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায়

না। আত্মসচেতনতার অনুভূতিই জীবনে আনন্দের মূল; শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তিকে বিসর্জন দেওয়ার তিনি চিরকালই বিরোধী। এই নাটকে সেই কথাই আছে। ইহা উপরোক্ত মতবাদের বিরোধী।

'রাজা' নাটকের আলোচনা সম্পর্কে পূর্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ সাঙ্কেতিক-রূপক নাটক রচনা করিতে গিয়াও বাস্তব জগতের বেশি ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাইতে পারেন নাই। বাস্তব জগৎ সর্বদাই তাঁহাকে মাটির দিকে টানিয়া নামাইয়াছে। তাঁহার কাব্য রচনার ক্ষেত্রেও তাহাই দেখা গিয়াছে। 'রাজা' এবং 'ডাকঘর' রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথ রূপক এবং সঙ্কেতোপকরণকে প্রাধান্য দিয়া নাটক রচনা করিলেও বাস্তব জীবনের হাত হইতে পরিত্রাণ পান নাই, তবে এ'কথা সত্য, বাস্তব উপকরণগুলি ইহাতে শিল্প-সম্মত উপায়ে প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'রক্তকরবী' রচনার যুগে তাঁহার মধ্যে সেই সংযম ও পরিমিতিবোধ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য ইহার মধ্যে সঙ্কেত রূপক এবং বাস্তব শিল্পসম্মত ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে নাই।

'রক্তকরবী'র ভাষা সহজ গদ্য, তাঁহার অন্যান্য এই শ্রেণীর নাটকের মত গীতিধর্মী নহে। সঙ্গীতের অংশও ইহাতে অল্প, সেইজন্যই ভাষার দিক দিয়া ইহাব নাট্যিক ধর্ম অনেকটা রক্ষা পাইয়াছে। 'রক্তকরবী' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক রচনার যুগের অবসান হয়। যদিও তিনি ইহার পর আরও দুই একখানি এই শ্রেণীর নাটক রচনা করেন, তথাপি তাহাদেব মধ্যে পূর্ববর্তী ভাবধারারই অনুবর্তন করিয়াছেন, নূতন মৌলিক কোন ভাব অবলম্বন করিয়া আর এই শ্রেণীর কোন নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।

'তাসের দেশ'

রূপক নাট্যরচনার যুগ অতিক্রম করিয়াও রবীন্দ্রনাথ আরও যে দুই একখানি এই শ্রেণীর নাটক রচনা করেন, তাহাদের মধ্যে 'তাসের দেশ'ই কতকটা তাঁহার পূর্ববর্তী রূপক নাট্যগুলির সহধর্মী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পূর্বেই বলিয়াছি, রূপক নাট্যরচনার মৌলিক প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইতিপূর্বেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য এই যুগে পুরাতন ভাব-বস্তুকেই নব কলেবরে প্রকাশ করা ব্যতীত তিনি ইহাতেও আর কোন মৌলিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ইহা প্রধানতঃ তাঁহার নৃত্যনাট্যগুলি রচিত হইবার যুগেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার বহিরঙ্গগত পরিচয়ে তাঁহার নৃত্য-নাট্যের লক্ষণই সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। 'তাসের দেশ' ১৩৪০ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার কাহিনী-পরিকল্পনা ইহার বহু পূর্ববর্তী। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগে রচিত ছোটগল্পগুলির মধ্যে একটি গল্প আছে, তাহার নাম 'একটা আষাঢে গল্প'। তিনি ইহার কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া তাঁহার নৃত্যনাট্যরচনার যুগে ইহাকে একটি নৃত্যনাট্যরূপ দান করেন। অতএব রূপক নাট্যরচনার যুগ অতিক্রান্ত হইয়া ইহা নাট্যরূপ লাভ করিলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহার ভাবগত প্রেরণা তাঁহার রূপকনাট্য রচনার যুগ সূচনারও বহু পূর্ববর্তী। এইজন্য ইহা তাঁহার রূপক নাট্যরচনার যুগের শেষ প্রান্তে রচিত হইলেও ইহার মধ্যে পূর্ববর্তী নাটকগুলির ভাবগত লক্ষণ কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ—

এক রাজপুত্র ও এক সদাগর পুত্র 'নবীনা'র সন্ধানে সমুদ্রপথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে। সমুদ্রে ঝড় উঠিল, ঝড়ে জাহাজ ডুবিল; রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র এক অপরিচিত দ্বীপে আসিয়া কূল পাইল। তাহা তাসের দেশ। সেখানকার লোকেরা নিয়মানুবর্তিতার দাস; সকলেই বাঁধা চালে চলে—সমাজে প্রত্যেকের স্থান নির্দিষ্ট এবং যথানির্দিষ্ট স্থানে প্রাত্যহিক আচার পালনের মধ্য দিয়াই তাহাদের নিষ্ক্রিয় জীবন নিরুপদ্রবভাবে অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র আসিয়া তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইল। তাহারা নিরুদ্দেশের যাত্রী, নিয়মানুবর্তিতার বিরুদ্ধেই তাহাদের বিদ্রোহ। তাহাদের সংস্পর্শে আসার ফলে তাসের দেশের তামসিক

জীবনের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিল। তাসের দেশ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল, বুঝি বা এই অচল নিগড় ভাঙ্গিয়া পড়ে, রাজার বাধ্যতামূলক আইন অবমানিত হয়। কিন্তু তাহাকে আর রক্ষা করা গেল না ; 'নবীনা'র স্পর্শ ও নিরুদ্দেশের ডাক তাহাদিগকে 'অলসের বেড়া' ও 'নির্জীবের গণ্ডী' হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেল ; তামসিক জড়তার জাল ছিন্ন করিয়া তাসের দেশের উপর দিয়া জীবনের বন্যা বহিয়া গেল।

এই কাহিনীর রূপক আবরণ অত্যন্ত ক্ষীণ। ইহার বক্তব্য বিষয় সর্বত্র এতই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী রূপক নাট্যগুলির সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত হয় না। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিমনোভাবেরই পরিচয় ইহার মধ্যে অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তখন মূলতঃ প্রত্যক্ষবাদী, রূপকোক্তির অপ্রত্যক্ষ পথ তিনি ইতিপূর্বেই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন ; তবে পূর্বরচিত একটি কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া ইহা সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এই রূপকাংশ একেবারে পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। এই রূপকাভাসটুকু ইহার মধ্যে না থাকিলে ইহাকে স্বচ্ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক অন্যান্য নাটকের সমপর্যায়ভুক্ত করা যাইত। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গদ্য রচনার আদর্শে ইহার নাট্যভাষা বা সংলাপ গঠিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী রূপক নাটক-গুলির ন্যায় ইঙ্গিত ও অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত পরোক্ষভাষণ ইহার মধ্যেও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আমাদের তামসিক জড়তাগ্রস্ত দেশকেই তিনি এখানে তাসের দেশ বলিয়াছেন। তাসের দেশ, নিয়মের দেশ। 'তাসের দেশ' ও 'অচলায়তনে'র মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। 'দিগ্‌বিজয় করিয়া বেড়ানো' যে রাজপুত্রের ধর্ম ও বাণিজ্যের জন্য নিত্য অপরিচিত দেশের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা যে সদাগর-পুত্রের বৃত্তি তাহারাই এই জড়ত্বের দেশে 'নবীনা'র বাণী বহন করিয়া আনিল। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদাদা, ধনঞ্জয় বৈরাগী, কবি—ইহারাই এখানে রাজপুত্র ও সদাগরপুত্রের রূপ লাভ করিয়াছে। নীরন্ধ্র 'অচলায়তনে'র মধ্যে একদিন বাহিরের আলো প্রবেশ করিয়া যেমন ইহার সমগ্র ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দিয়াছিল, তেমনই বৃহত্তর জাগতিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এই তাসের দেশও বৃহত্তর জীবনের দূত রাজপুত্র এবং সদাগরপুত্রের আবির্ভাবে সমস্ত কৃত্রিম নিয়মের বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বিশ্বের অখণ্ড জীবনধারার সঙ্গে যোগস্থাপন

করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এই নিয়ম বাহিরের অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত বলিয়াই সত্যের আহ্বানে ইহা সহজেই পরিত্যক্ত হইল।

এই নাটিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য-বিষয়ে কোনও নূতনত্ব নাই, নিতান্ত পরিমিত রচনা-ক্ষেত্রে ইহার ভাবটি প্রকাশ করিতে হইয়াছে বলিয়া ইহার রচনায়ও কোনও উচ্চ শিল্পগুণ প্রকাশ পায় নাই। ইহার অনেকগুলি গানই তাঁহার অন্য রচনা হইতে সংগৃহীত; যেগুলি নূতন করিয়া ইহার জন্য রচিত, তাহাও রচনার দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য নহে, নৃত্যনাট্যরচনার বাহিরের তাগিদ হইতেই এই নাটকখানি রচিত হইয়াছিল; সেইজন্য ইহার মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার নূতনতর কোন বিস্ময়কর দিকের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায় না। রূপক নাট্যরচনার মৌলিক প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বহুদিন পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়া গেলেও এবং এই রূপকনাট্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নূতন কোন বক্তব্যের সন্ধান ইহাতে পাওয়া না গেলেও, রচনার দিক দিয়া 'তাসের দেশ'ই রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ রূপক নাট্যরচনা। ইহা রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যরচনার যুগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া কতকটা জনসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে।

'রথের রশি'

১৩৩০ সালের 'রথযাত্রা' নামে রবীন্দ্রনাথের একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মূলতঃ ইহারই বিষয়বস্তু ভিত্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কালের যাত্রা' বা 'রথের রশি' নামক নাটিকা রচনা করেন। ইহা আদ্যোপান্ত নূতন করিয়া লিখিত মাত্র—বিষয়-বস্তুর দিক হইতে কোন পার্থক্য নাই। 'কালের যাত্রা' ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭ বৎসর বয়সের জন্মোৎসব উপলক্ষে 'কবির সস্নেহ উপহার' রূপে অর্পিত হয়। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিকট লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ নাটিকাটির বিষয় ও তাহার তাৎপর্য সম্বন্ধে এই প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন,—'রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখ্‌তে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চল্‌ছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত কবেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকাব থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদেব অসম্মান ঘুচ্‌লে তবে সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চল্‌বে' (বিচিত্রা, ১৩৩৯, কার্তিক, পৃঃ ৪৯২)। অতএব দেখা যাইতেছে, নাটকটি তত্ত্বমূলক, রসমূলক নহে। ইহার তত্ত্বকথাটি আরও সহজ ভাষায় 'রথযাত্রা' নামক নাটিকায় রাজমন্ত্রীর ভাষায় এই ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল,—'রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা। কাদের শক্তিতে সংসারটা সত্যিই চল্‌ছে, রথচক্র ঘোরার দ্বারা সেইটেই প্রমাণ হয়ে যাবে।' একদিন পুরোহিতের শক্তিতে সংসার চলিত, সেইজন্য পুরোহিতের স্পর্শমাত্র সে দিন রথ আপনা হইতে চলিয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে, শূদ্রের শক্তিতে সংসার চলে, সেই জন্য শূদ্রের স্পর্শ না পাওয়া পর্যন্ত রথ অচল হইয়া রহিল; রাজশক্তি কিংবা বণিক-শক্তি তাঁহাকে নড়াইতে পারিল না। এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আরও কয়েকখানি রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

'রথের রশি' তত্ত্বমূলক নাটক হইলেও ইহার স্ত্রীচরিত্রগুলি বাস্তবধর্মী। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে প্রত্যেকটিই যে ইহার ব্যতিক্রম তাহা নহে। তবে স্ত্রীচরিত্রগুলি প্রায় জীবন্ত বলিয়া অনুভূত হইবে। বাংলার লৌকিক ধর্ম এবং জন-জীবনের সংস্কার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ইহার মধ্যে বাস্তব জ্ঞানেব পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে।

'রথের রশি'র ভাষা গদ্য নহে, গদ্য কবিতা। সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ যে গদ্য কবিতা রচনার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, ইহা সেই ভাষাতেই রচিত। গদ্যের ভঙ্গিতে ইহা লিখিতও নহে। ইহা এই প্রকার পদ্যের ভঙ্গিতে রচিত।

প্রথমা। এবার কী হলো ভাই!
উঠেছি কোন ভোরে তখন কাক ডাকেনি।
কঙ্কালিতলার দীঘিতে দুটো ডুব দিয়েই—
ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে গেল—
রথের নেই দেখা। চাকার নেই শব্দ।

এই ভাষার একটি ছন্দ আছে, তাহা রচনাটিকে সরস করিয়াছে।

'রক্তকরবী' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্য রচনাব যুগ শেষ হয়। তারপর কয়েক বৎসর তিনি তাঁহার পূর্বরচিত কয়েকখানি নাটকের ত্রুটি সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে নূতন নামে প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহা হইতে স্বভাবতঃই অনুমিত হইয়াছিল যে, রবীন্দ্রনাথের মৌলিক নাট্যপ্রতিভা নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়া গদ্যনাট্য 'বাঁশরী' নাটক রচনার ভিতর দিয়া কবি তাঁহার অন্তর্নিহিত যে সংহত সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহা রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম বিস্ময় হইয়া রহিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

গদ্যনাট্য

রবীন্দ্রনাথের রঙ্গনাট্য এবং রূপক সাঙ্কেতিক নাটক গদ্যেই রচিত, কিন্তু রঙ্গনাট্যগুলি লঘুবিষয়ক ছিল বলিয়া ইহাদের মধ্যে তিনি যে গদ্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার ভঙ্গির মধ্যে গুরুত্বের অভাব ছিল, রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটকগুলি গদ্যে রচিত হইলেও সেই গদ্য প্রকৃত গদ্যের আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র ছিল, কারণ, তাহা গীতি বা কাব্যধর্মী গদ্য ছিল। গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় অবলম্বন করিয়া গদ্যের যে একটি বলিষ্ঠ রূপ প্রকাশ করিবারও শক্তি আছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকখানি মাত্র নাটকে দেখাইয়াছেন। এই নাটকগুলি প্রধানতঃ তাঁহার শেষ জীবনের রচনা, একখানির নাম 'বাঁশরী', আর একখানি 'তপতী'।

অবশ্য 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তে রবীন্দ্রনাথের গদ্যনাটক বলিতে তাঁহার রঙ্গনাট্য, ঋতুনাট্য এবং রূপক সাঙ্কেতিক-নাটক অর্থাৎ তাঁহার গদ্যে রচিত সকল নাটকই উল্লেখ করা হইয়াছে। তথাপি গদ্যভাষার দৃঢ়তার শক্তি তাঁহার সকল নাটকে সমান ভাবে রক্ষা পায় নাই। রঙ্গনাট্যের কৌতুককর বিষয়বস্তু স্বভাবতই গদ্যভাষাকে লঘু করিয়াছে, ঋতুনাট্যের গীতি-বাহুল্য ইহাদের গদ্য ভাষাকে গীতিভাবে ভারাক্রান্ত করিয়াছে এবং রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকের ভাষাও কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মাত্র 'তপতী', 'বাঁশরী' ও 'মুকুট' নাটক তিনখানির মধ্যে কাব্যধর্মী গদ্যভাষার মধ্য দিয়াও একটি দৃঢ়তার গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, ইহাদের বিষয় বস্তুর গুরুত্ব এবং প্রত্যক্ষতা। রূপক এক সাঙ্কেতিক নাটকের মধ্যেও গুরুত্ব ছিল, সে কথা সত্য; কিন্তু সেখানে ভাব অপ্রত্যক্ষ ও গৌণ ছিল, সেইজন্য ভাষার মধ্যেও অপ্রত্যক্ষতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু 'তপতী' এবং 'বাঁশরী'র বক্তব্য বিষয় যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই প্রকাশ-ভঙ্গিও প্রত্যক্ষ। সুতরাং গদ্যভাষার যাহা বিশিষ্ট গুণ, তাহা ইহাদের মধ্য দিয়াই সার্থক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কয়েকটি ছোট গল্পের নাট্যরূপের মধ্য দিয়াও এই শ্রেণীর বলিষ্ঠ গদ্যভাষা প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, তবে তাহা এই গ্রন্থের আলোচনার বহির্ভূত হইয়াছে।

'বাঁশরী'

'বাঁশরী' একখানি সামাজিক নাটক। কিন্তু যে সমাজ হইতে নাট্যকার তাঁহার নাট্যিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সাধারণের সমাজ নহে। এ'দেশের অতি-উচ্চশিক্ষিত ও অভিজাত সমাজের একটি প্রণয়-কাহিনীই এই নাটকের উপজীব্য। 'বাঁশরী' রচনার চারি বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শেষের কবিতা' রচিত হয়। আদর্শের দিক দিয়া স্বতন্ত্র হইলেও ব্যবহৃত উপকরণের দিক দিয়া এই দুইখানি রচনায় যথেষ্ট ঐক্য আছে। 'শেষের কবিতা' যে শ্রেণীর সামাজিক উপন্যাস, 'বাঁশরী'ও সেই শ্রেণীরই সামাজিক নাটক। 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু 'বাঁশরী'তে তিনি একমাত্র প্রগতিশীল সমাজের পথেই অগ্রসর হইয়াছেন। আদর্শগত এই সামান্য পার্থক্য ছাড়া উভয়ের মধ্যে আর বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; অতএব 'শেষের কবিতা'র প্রভাবিত যুগেই 'বাঁশরী' রচিত হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইজন্যই ইহাদের চরিত্রে ও চিত্রে প্রায় সর্বত্রই ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এই নাটকের নায়িকা বাঁশরী 'বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাশ করা মেয়ে। তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুত-শক্তিতে সমুজ্জ্বল, তার আকৃতিটা'তে শান্-দেওয়া ইস্পাতের চাক্‌চিক্য।' সুষমা সেন বাঁশরীর একজন বান্ধবী। 'সুষমাকে দেখ্‌বা মাত্র বিস্ময় লাগে। চেহারা সতেজ সবল সমুন্নত। রং যাকে বলে কনক-গৌর, ফিকে চাঁপার মত, কপাল নাক চিবুক যেন কুঁদে তোলা।' এই সুষমার সঙ্গে শম্ভুগড়ের রাজাবাহাদুর সোমশঙ্করের বিবাহ স্থির হইয়াছে। তাহারই এন্‌গেজমেণ্ট্‌ উপলক্ষে সুষমাদের বাগানে পার্টি জমিয়াছে। তাহাতে বাঁশরী তাহার একজন অতি-আধুনিক সাহিত্যিক বন্ধু ক্ষিতীশ ভৌমককে লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষিতীশ বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিক; সে তাহার লেখায় আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে ব্যঙ্গ করে; অথচ তাহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে কিছুই জানে না। এই সমাজের সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয় করাইবার জন্যই বাঁশরী তাহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। সোমশঙ্করের

সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় বাঁশরীরই। বাঁশরীর সংস্পর্শে আসিয়াই তাহার রূপ ও রুচি আধুনিকতায় মার্জিত হয়। তাহাদের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া সকলেই একদিন মনে করিয়াছিল, অচিরেই ইহারা বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। কিন্তু এমন সময় সোমশঙ্করের পিতা পুত্রের মতিগতির পরিবর্তন দেখিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন। বাঁশরী এবং সোমশঙ্করের মধ্যে বিচ্ছেদ পড়িয়া গেল।

সুষমা পুরন্দর নামক একজন সন্ন্যাসীর ছাত্রী। পুরন্দরের চরিত্র ছিল অদ্ভুত। 'কেউ দেখেছে তা'কে কুম্ভমেলায়, কেউ দেখেছে গারো পাহাড়ে ভালুক শিকারে। কেউ বলে ও য়ুরোপে অনেক কাল ছিল। সুষমাকে কলেজের পড়া পড়িয়েছে আপন ইচ্ছায়।' তারপর রাজা সোমশঙ্করকে বশ করিয়া তাহার সঙ্গে সুষমার বিবাহের সম্বন্ধ সেই স্থির করিয়াছে। পুরন্দরের মধ্যে এক অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি ছিল; তাহারই বলে সে পুরুষ ও নারীকে সহজেই নিজের বশে আনিতে পারিত। সুষমা পুরন্দরকে ভালবাসিত। কিন্তু তাহাকে পাইবার উপায় ছিল না; সেইজন্য তাহারই নির্দেশ পালন করিয়া সে সোমশঙ্করকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। বাঁশরী সোমশঙ্করকে ভালবাসিত। কিন্তু তাহাদের মিলনের পথে দাঁড়াইল পুরন্দর। তাহার বিশ্বাস ছিল, ভালবাসা স্বার্থপরতায় অন্ধ। 'তা'তে একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অতিবৃত করা হয়।' কিন্তু প্রেমে মানুষের মুক্তি সর্বত্র। 'নির্বিশেষ প্রেম, নির্বিকার আনন্দ, নিরাসক্ত আত্মনিবেদন'—এই ছিল পুরন্দরের দীক্ষামন্ত্র। এই বিশ্বাসেই সে তাহার শিষ্য-শিষ্যাদের ভালবাসার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছে। এই নির্বিশেষ প্রেমের ব্রত গ্রহণ করিয়া সুষমা যাহাকে ভালবাসিল, তাহাকে বিবাহ করিতে পারিল না; সোমশঙ্করও যাহাকে ভালবাসিল, তাহাকে পাইল না। পরস্পর অনাসক্ত দুই নরনারী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইল। সোমশঙ্করকে না-পাওয়ার দুঃখ বাঁশরীর জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিল। এমন কি, নিজের উপর অভিমানে সে রিয়ালিস্ট সাহিত্যিক ক্ষিতীশকে বিবাহ করিতে চাহিল। কিন্তু যে-মুহূর্তে সোমশঙ্করের মুখ হইতে শুনিতে পাইল যে, সুষমাকে বিবাহ করিতে যাইয়াও সে বাঁশরীকেই ভালোবাসে, তখনই তাহার সকল দুঃখের অবসান হইল। সোমশঙ্করের নিকট হইতে সুষমা যাহা পায় নাই বা কোনদিন পাইবে না, বাঁশরী তাহা পাইয়াছে এবং চিরদিন পাইতে থাকিবে—ইহাই

তাহার বঞ্চিত জীবনের পরম সান্ত্বনা হইয়া রহিল। ক্ষিতীশকে সে প্রত্যাখ্যান করিয়া ফিরাইয়া দিল।

কতকটা বিংশতি শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে এই নাটক রচিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, আধুনিক ইউরোপীয় নাটকের প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহাতে কোনও ঘটনার স্থান নাই; নাট্যলোকের বহিরাঙ্গিনায় যে-সকল ঘটনা সংঘটিত হইবে, নাটকে তাহারই পর্যালোচনা চলিবে মাত্র। অবশ্য এই আদর্শের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এখানে নূতন করিয়া আর কোন প্রশ্ন তুলিতে চাহি না। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের আদর্শে ঘটনা-বহুল নাটক রচনার যে ধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া আসিতে থাকিলেও, 'বাঁশরী' রচনার পূর্ব পর্যন্ত একেবারে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। এমন কি, তাঁহাব কোন রূপক নাটকও অতি-নাট্যিক কাহিনীতে পূর্ণ। কিন্তু 'বাঁশবী'তে রবীন্দ্রনাথ নাট্যিক ঘটনাগুলি এমন ভাবে সংযত করিয়াছেন যে, ইহা এই বিষয়ে তাঁহার পূর্ববর্তী কোন নাটকেরই সগোত্র বলিয়া দাবী করিতে পারে না। মনে হয়, এই সময় রবীন্দ্রনাথ জর্জীয় যুগের পাশ্চাত্ত্য নাটকসমূহ দ্বাবা কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। 'বাঁশরী' নাটকেব মধ্যে কোন ঘটনারই সংঘটন দেখিতে পাওয়া যায় না; আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে ইহা পাঠোপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, অভিনয়োপযোগী করিয়া রচিত হয় নাই। ইহাব ভাব অর্থসমৃদ্ধ ও ভাষা শাণিত ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ—অতি সতর্ক সঞ্চরণ ব্যতীত অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

ঘটনার দিক দিয়া বৈচিত্র্যহীন নাটক যথার্থ নাটকীয় রূপে রচনা করিবার দায়িত্ব অপরিসীম। কারণ, বাহ্য সংঘাত সৃষ্টি করা যত সহজ, অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা তত সহজ নহে। উপন্যাসের অনিয়মিত পরিসরের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটাইয়া তুলিবার যত অবকাশ পাওয়া যায়, নাটকের সুনির্দিষ্ট পরিসরেব মধ্যে তাহা তত সহজে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ 'বাঁশরী'তে অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বারা নাট্যিক সংঘাত সৃষ্টি করিবার দুরূহ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে যে পরিমাণ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বাঁশরী চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বই ইহার নাট্যিক ক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। নাট্যকার এই দ্বন্দ্বকেই এত তীব্র ও সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইহার পর নাটকে আর কোনরূপ ঘটনাসমাবেশ বাহুল্য বলিয়াই মনে হইত। এইখানেই

লেখকের সত্যকারের কৃতিত্ব। বাহির হইতে বাঁশরীর ভিতরের পরিচয় পাইবার উপায় নাই। মানুষের মনে যখন একটা বিষয়ে দ্বন্দ্ব জাগিয়া উঠে, তখন সে প্রতিনিয়তই তাহার বিরুদ্ধভাবের সম্মুখীন হইয়া তাহার মূল্য যাচাই করিতে যায়। বাঁশরী বস্তুতান্ত্রিকতায় শ্রদ্ধা করে না; তাহার শিক্ষা ও রুচি সর্বতোভাবেই ইহার বিরোধী। অথচ যখন সে সোমশঙ্করকে নিজের কাছ হইতে হারাইল, তখন সে এক 'রিয়ালিস্ট্' সাহিত্যিককে সঙ্গী করিয়া লইল। ইহা তাহার আত্মপ্রবঞ্চনার অভিনয় মাত্র। শেষ পর্যন্ত এই মুখোস অবশ্য খুলিয়া পড়িয়া গেল। 'রিয়ালিস্ট্' সাহিত্যিক বিদায় হইল, আদর্শের সেবাতেই তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত হইল।

যে চরিত্রটির অঙ্গুলি-সঙ্কেতে এই নাটকের সমগ্র কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাহার নাম পুরন্দর। পুরন্দরের চরিত্র নাটকের মধ্যে একটু অপরিস্ফুট রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই নাটকে পুবন্দরকে ইহার বেশী প্রাধান্য দিবার ইচ্ছা লেখকের ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাঁশবীর অন্তর্দ্বন্দ্ব লইয়াই এই নাটকেব সৃষ্টি। পুবন্দবই বাঁশরীর জীবনে এই সকল নাট্যিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু পুবন্দর নিজে ইহার কাহিনীব বিশেষ কোনও অংশ অধিকার করিয়া লইতে পারে না; তাহা হইলে ঘটনার পরিণতি অন্য রকম গিয়া দাঁড়ায়। পুবন্দরের চরিত্র একটু রহস্যাচ্ছন্ন এবং এই রহস্যই ইহাব একমাত্র আকর্ষণ। অতএব ইহাকে অধিকতর পরিস্ফুট করিতে গেলে ইহার এই আকর্ষণ বিনষ্ট হইতে পারিত। বাঁশরী ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রের সংক্ষিপ্ততা এই নাটকের বিশিষ্ট গুণ। এই সংক্ষিপ্ততার মধ্যেও চরিত্রগুলির পরিপূর্ণতার যে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে, তাহা নহে। সতীশ ও শৈলর আর একটি নিতান্ত বাস্তব প্রণয়-কাহিনী নাটকের মূল কাহিনী-টির এক পার্শ্বে অবস্থান করিয়াছে। তাহাও সংক্ষিপ্ত; কিন্তু তথাপি আভাসে ইঙ্গিতে ইহার ভিতরকার যে কমনীয়তাটুকু উদ্ঘাটিত করিয়া দেখান হইয়াছে, তাহা পরম উপভোগ্য হইয়াছে।

অতি-আধুনিক বাংলা বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত এই নাটকের একটি চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা 'রিয়ালিস্ট্' সাহিত্যিক ক্ষিতীশ ভৌমিকের চরিত্র। যে সমাজের কাহিনী লইয়া 'বাঁশরী' নাটক রচিত হইয়াছে, সেই সমাজের অন্তরের সঙ্গে ক্ষিতীশের কোন যোগ নাই। তাহার আকৃতি যেমন কুৎসিৎ, অন্তঃকরণও তেমনি কদর্য।

বাঁশরীর সমাজ তাহাকে লইয়া প্রকাশ্যেই উপহাস করে; বাঁশরী তাহাকে প্রশ্রয় দেয়, তাহার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধায় নহে, তাহার প্রতি ব্যঙ্গ-মিশ্রিত করুণায়। ক্ষিতীশের সাহিত্যকে নোংরা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া রিয়ালিজ্‌ম সম্বন্ধে তাহার নিজের মত প্রকাশ করিয়া বলে,—'সীতা ভাবলেন, দেব-চরিত্র রামচন্দ্র তাঁকে উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে, শেষকালে মানব-প্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজ্‌ম, নোঙ্‌রামিকে নয় (২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)।' সাহিত্যে বাস্তবতা সম্বন্ধে ইহাই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ধারণা। এই বিষয়ে বাঁশরীর মুখ দিয়া তিনি রিয়ালিস্ট্‌ ক্ষিতীশকে আরও উপদেশ দিয়াছেন,—'যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে তখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য, এখন সাবালক হয়েছ, তবু ঐ কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য' (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)। অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিকতার ভিত্তি অজ্ঞতার উপর—জীবন ও জগতের সঙ্গে যাহাদের ব্যক্তিগত ও বাস্তব পরিচয় নাই, তাহারাই বঙ্গসাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিকতার ধ্বজাধারী—ক্ষিতীশের চরিত্রের ভিতর দিয়া লেখক এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। নাট্যকার ক্ষিতীশকে সহানুভূতি দিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তাহাকে লইয়া কেবল ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন, সেইজন্য তাহার চরিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই নাটকের একটি গুণ,—ইহার প্রারম্ভ হইতে শেষ পযন্ত ঘটনাগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে ইহাদের মধ্যে এতটুকুও ফাঁক পড়ে নাই; সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য এই নাটকের ভাষা। নাট্যকার যে সমাজের চিত্র ইহাতে পরিবেষণ করিয়াছেন, ভাষা যে তাহারই সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। শাণিত ক্ষুরের মত এই ভাষা অলক্ষ্যে মর্মে প্রবেশ করে; গীতি-প্রবণতা যে লেখকের বৈশিষ্ট্য, তাঁহার ভাষায় এমন সুমার্জিত ও পরিচ্ছন্ন গীতিভাববর্জিত রূপ পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই; 'শেষের কবিতা'র ভাষাও কবিতার লক্ষণাক্রান্ত; কিন্তু 'বাঁশরী'র ভাষায় গীতি কিংবা কাব্যের স্পর্শ মাত্র নাই। ইহার অভিব্যক্তি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও সহজ; রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের গদ্য রচনার ইহা একটি বিশিষ্ট নিদর্শন-স্বরূপ।

এই শ্রেণীর গুরু-বিষয়ক সামাজিক নাটক রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি রচনা করেন নাই। তাঁহার সামাজিক নাটক মাত্রই লঘুবিষয়ক প্রহসন শ্রেণীর। আধুনিক

উচ্চশিক্ষিত অভিজাত সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু লইয়া তিনি ইহার কিছু-পূর্বে মাত্র দুই একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, যেমন 'গৃহ-প্রবেশ' ও 'শোধবোধ।' কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিই তাঁহার পূর্ব রচিত এক একটি ছোট গল্পের নাট্যরূপ মাত্র। বাঁশরীর সমাজ 'গৃহ-প্রবেশ' ও 'শোধবোধে'র সমাজের অপেক্ষা আভিজাত্যে আরও অগ্রসর এবং ইহার বিষয়বস্তুও 'শোধবোধ' হইতে অধিকতর ভাব-সমৃদ্ধ।

'তপতী'

রবীন্দ্রনাথের গদ্যনাট্য 'তপতী' ১৯২৯ সনে রচিত হয়। ইহা তাঁহার 'রাজা ও রাণী' নাটকের কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও ইহা যে কেন স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন আলোচনার যোগ্য, তাহা 'রাজা ও রাণী'র আলোচনা প্রসঙ্গেই উল্লেখ করিয়াছি। সেইজন্যই ইহাকে এখানে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমেই 'তপতী'র কাহিনীভাগ উল্লেখ করা যাইবে। তাহা এই : জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব সেদিন মীনকেতুর পূজার আয়োজন করিয়াছেন, এমন সময় সহসা ভৈরব মন্দির হইতে ভৈরবের স্তুতিগান শুনিতে পাওয়া গেল। রাজা বিস্মিত হইয়া তাহার পার্শ্বচর দেবদত্তকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; দেবদত্ত বলিলেন, ভৈরবই রাজ্যে জনসাধারণের চিরদিনের আরাধ্য দেবতা, মীনকেতুর পূজায় তাহারা অভ্যস্ত নহে, তাঁহাকে তাহারা কোনও স্বীকৃতি দিতে চাহে না। রাজা বিক্রমদেব বলিলেন, মীনকেতুর পূজা ভিন্ন ভৈরবের পূজা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। দেবদত্ত সে কথা স্বীকার করিতে চাহিলেন না।

রাজা বিক্রমদেব রাজকর্তব্য অবহেলা করিয়া অন্তঃপুরে রাণীর সাহচর্যেই দিন যাপন করিতেছিলেন, তাহা লইয়া প্রজাদিগের মধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। মহিষী সুমিত্রা জনকল্যাণব্রতে দীক্ষিতা, তিনি রাজার একান্ত প্রেমের আশ্রয়ে তৃপ্তি লাভ করিতেন না। রাজা যখন তাঁহাকে তাঁহার সম্মুখে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করিয়া দিয়া তাহার এক বিন্দু প্রেম-বারির জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন, তখন তিনি তাঁহাকে একদিন বলিলেন, 'মহারাজ, যে-প্রেম রাজকর্তব্যেরও উপরে, সে গ্রহণ করুন দেবতা, সে কি আমি নিতে পারি?' এই প্রত্যাখ্যানের বেদনা প্রতিদিন রাজার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিত।

রাজা বিক্রমদেব কাশ্মীর অভিযানে গিয়া কাশ্মীর রাজকুমারী সুমিত্রাকে বন্দিনী করিয়া আনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাকে মহিষীর মর্যাদা দিয়াছেন, নিজের সমগ্র অন্তর দিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু রাণী তাহাতে কিছুতেই ধরা দিতেছেন না। সুমিত্রা নিজের রাজাকে পাইতে চাহেন; কিন্তু বিক্রম তাঁহাকে নিঃস্ব করিয়া তাঁহার পায়ে ঢালিয়া দিয়াও তাঁহার মুখে এই অভিযোগের বাণী শুনিতে পান, 'সিংহাসন থেকে তুমি নেমে এসেছ এই নারীর কাছে। আমাকে কেন তুলে নিয়ে যাও না তোমার সিংহাসনের

পাশে?' রাণী মহিষীর অধিকার চান, তিনি কেবলমাত্র নারীরূপে রাজার প্রেমের তৃষ্ণা মিটাইতে চাহেন না—সে প্রেম যতই গভীর হোক। রাজা রাণীর সম্মুখে রাজভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিয়া তাহা প্রজাকে দান করিতে বলেন, কিন্তু তাহাতেও রাণী বলেন, 'মহিষীকে যদি গ্রহণ কর, সেবিকাকেও পাবে, নইলে শুধু দাসী! সে আমি নই।'

রাণীকে তুষ্ট করিবার জন্য কাশ্মীরের অধিবাসীদিগকে রাজা বিক্রম উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা রাজার রাজকার্যের ঔদাসীন্যের সুযোগ লইয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল, প্রজার উপর অন্যায় উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। রাণীর আত্মীয় বলিয়া রাজা তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কানে তুলেন না। বরং অভিযোগকারীকেই তাহার জন্য দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। কাশ্মীরী রাজকর্মচারীদিগের প্রজা-পীড়নের কথা রাণীর কানে গিয়া পৌঁছিতে লাগিল। তিনি রাজাকে ইহার প্রতিবিধান করিতে বলিলেন, কাশ্মীরীদিগকে জালন্ধর পরিত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজা বুঝিতে পারিলেন, ইহারা ইতিমধ্যেই এত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাদিগের কোন কার্যে বাধা দিতে গেলে, তাহারা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করিবে। রাজা সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, কোন কাশ্মীরীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই যাহাতে রাণীর কর্ণগোচর না হইতে পারে, সেইজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিলেন। অন্তঃপুরের মধ্যে রাণীর জীবন ক্রমেই দুঃসহ হইয়া উঠিল, রাজার সকল সাবধানতা অতিক্রম করিয়াও উৎপীড়িত প্রজার অভিযোগ তাঁহার কানে আসিয়া নিত্য পৌঁছিতে লাগিল।

জালন্ধররাজ বিক্রমদেব যখন অতর্কিতে কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া কাশ্মীর জয় করেন, তখন রাজকুমারী সুমিত্রা জলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু উৎপীড়িত প্রজাকুলের আকুল ক্রন্দনে নিজেকে বিজয়ী রাজার পদে সমর্পণ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। বিক্রমদেব তাহাকে স্বদেশে লইয়া আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি এই বিবাহকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তিনি কৈলাসনাথের মন্দিরে এই বলিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন যে, 'রুদ্রের প্রাসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়। জালন্ধরের রাজগৃহে আমি কোনদিন কিছুর জন্যেই যেন লোভ না করি; তবেই আমাকে অপমান স্পর্শ করতে পারবে না।' রাণী সুমিত্রা সেই কথাই স্মরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।

রাজ্যে অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। একদিন রাণীর সম্মুখে নারীর উপর অত্যাচারের এক অভিযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়া রাণী বিচলিত হইয়া পড়িলেন। রাজাকে ইহার প্রতিকার করিতে বলিলেন, রাজা নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। রাণী কহিলেন, ইহার 'বিচার যদি না হয়, তাহলে এ' রাজত্বে রাণী হ'বার লজ্জা আমি সইব না।' প্রাসাদের বাহির হইতে উৎপীড়িত প্রজাদিগের আর্ত চিৎকার অন্তঃপুরে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি নিজেকে ধিক্‌কার দিতে লাগিলেন। রাজা এবং রাণীর সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। একদিন তিনি পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। শুনিয়া রাজা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তাঁহার ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর রূপ আত্মপ্রকাশ করিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, রাণী কাশ্মীরে ফিরিয়া গিয়া রুদ্র ভৈরবকে আত্মনিবেদন করিবেন। কারণ, তিনি বুঝিলেন, তাঁহার প্রতি অন্ধ আসক্তি বশতঃই রাজা রাজ্যের সকল কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিতেছেন। তিনি রুদ্রভৈরবের নিকট নিবেদিত, তাঁহার মধ্য দিয়াই তাহার জীবনের সমাপ্তি কামনা করিলেন। রাজা কাশ্মীরের-বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য কাশ্মীররাজকে পরাজিত করিয়া সুমিত্রাকে সেখান হইতে বন্দিনী করিয়া লইয়া আসিয়া তাঁহার স্বেচ্ছাচারের জন্য তাঁহাকে দণ্ড দান।

রাজা বিক্রম কাশ্মীর আক্রমণ করিলেন। সুমিত্রাকে সেখান হইতে বাহির করিবার জন্য সৈন্যদিগকে চারিদিকে হত্যা, লুণ্ঠন এবং অগ্নিসংযোগ করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না। তিনি রাজ্যের একান্তে ধ্রুবতীর্থে মার্তণ্ডদেবের মন্দিরে গিয়া আশ্রয় লইয়া তাঁহার সঙ্কল্প পূর্ণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিক্রমদেব অবশেষে চরের মুখে সংবাদ পাইয়া মার্তণ্ড মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু যখন গিয়া সেখানে পৌছিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, জ্বলন্ত চিতায় রাণী সুমিত্রার দেহ ভস্মীভূত হইতেছে।

এই কাহিনীর মধ্যে একটি উপকাহিনী আছে, তাহাও প্রেমমূলক; ইহার নায়ক নরেশ এবং নায়িকা বিপাশা। নরেশ জালন্ধরের অধিবাসী, বিক্রমের কাশ্মীর অভিযানে সে তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিল, সেইখান হইতে যুদ্ধজয়ের পর বিপাশাকে গ্রহণ করিয়া জালন্ধরে লইয়া আসিয়াছে। উভয়ের মধ্যে প্রেমের

স্বীকার হইয়াছে। সুমিত্রার করুণ আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়াও তাহাদের মিলন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকেই যেমন মূল কাহিনীর অনিবার্য অগ্রগতির মধ্য হইতে উপকাহিনীর জন্ম হয় না, ইহার মধ্যেও তাহা হয় নাই। 'তপতী' নাটকের মূল কাহিনীর মধ্যে নরেশ-বিপাশার কাহিনী অনেকখানি অসংলগ্ন হইয়া আছে, 'রাজা ও রাণী'র কুমার সেন এবং ইলার চরিত্রও এমনই মূল কাহিনীর ধারায় নিবিড় যোগ রক্ষা করিতে পারে নাই। 'তপতী' নাটকের মধ্যেও এই ত্রুটি সম্পূর্ণ দূর হইতে পারে নাই। তথাপি নাট্যিক কার্যকারিতা (dramatic effect)র দিক ইহার একটি অপূর্ব সার্থকতা প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা নাটকীয় বৈপরীত্য। চরিত্র এবং ভাব উভয়তই এই বৈপরীত্য প্রকাশ পাইয়াছে। রাজা বিক্রম এবং রাজ-ভ্রাতা নরেশ উভয়েই রমণীর প্রেমমুগ্ধ, কিন্তু বিক্রমের প্রেমে যে উদ্দামতা আছে, নরেশের প্রেমে তাহা নাই। নরেশের অন্তর বিপাশার প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ বলিয়াই তাহার মধ্যে তরঙ্গের উচ্ছ্বাস জাগিতে পারে নাই। প্রেমের এই একটি পরিচয়ের সঙ্গে বিক্রমের প্রেমের উদ্দামতার যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা এই দুইটি চরিত্রেই সুন্দর নাটকীয় গুণ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা ছাড়া মূল নাট্যকাহিনীতে নরেশের আর কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ইহার মধ্য হইতে 'রাজা ও রাণী'র রেবতীর চরিত্রটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহার ফলে চন্দ্রসেনের চরিত্রের উপর হইতে সেক্সপীয়রের প্রভাবের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। এমন কি, 'রাজা ও রাণী'তে চন্দ্রসেন এবং রেবতীর চরিত্রে সেক্সপীয়রের যে প্রভাব নিতান্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে তাহা একেবারেই অনুভব করিতে পারা যায় না। 'তপতী' নাটকে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের বক্তব্য প্রকাশ পাইলেও, এ' কথা সত্য, ইহার উপর পাশ্চাত্ত্য নাটকের কোন প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হইবে না। ইহা এই নাটকখানির আর একটি বিশিষ্ট গুণ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'তপতী' নাটকের 'ভূমিকা'য় উল্লেখ করিয়াছেন, 'অনেক দিন ধরে রাজা ও রাণীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। কিছু দিন পূর্বে শ্রীমান্ গগনেন্দ্র নাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্যোগ করেন, তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত ক'রে এ'কে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা ক'রেছিলুম। দেখলুম এমন তরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব

নয়। তখনই স্থির ক'রেছিলুম, এ নাটক আগা গোড়া নূতন ক'রে না লিখ্‌লে এর সদ্‌গতি হ'তে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব শেষ ক'রেছি।'

লেখার দিক দিয়া যে ইহা আগা গোড়া নূতন করিয়া লিখিত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, ইহার পূর্ববর্তী রূপ 'রাজা ও রাণী'র ছিল কাব্যরূপ, 'তপতী' আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার যে নায়ক চরিত্র রাজা তাহার পরিকল্পনার মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন করা হয় নাই। গদ্য সংলাপের ভিতর দিয়াও তাঁহার একদিক দিয়া রাণীর প্রতি সুগভীর আসক্তি অপর দিক দিয়া তাঁহার হিংস্র রূপ সার্থক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রেমমূলক বিষয় প্রধানতঃ গীতিধর্মী, 'রাজা ও রাণী'র কাব্যভাষায় তাহার যে সার্থক অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছিল, 'তপতী'র বিদগ্ধ গদ্য সংলাপের ভাষায়ও তাহা সার্থক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তবে এ কথা সত্য, রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ যে বুদ্ধিদীপ্ত (witty) সংলাপের ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতেও তাহারই ব্যবহার করিয়াছেন, বাস্তবধর্মী নাটক হওয়া সত্ত্বেও গদ্য ভাষার দিক দিয়া ইহাতে নূতনত্ব কিছু দেখা যায় না। অর্থাৎ ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে গদ্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বহুলাংশে কাব্যধর্মী, রঙ্গনাট্যগুলির মত সহজ গদ্য নহে। এই কাব্যধর্মী গদ্যভাষার মধ্য দিয়াই কাহিনীর রোমান্টিক গুণ রক্ষা পাইয়াছে।

'তপতী'র একটি প্রধান গুণ এই যে, 'রাজা ও রাণী'র মধ্যে যেমন কুমার এবং ইলার উপকাহিনী মূল কাহিনীর প্রাধান্য অনেকখানি বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল, ইহাতে নরেশ ও বিপাশার কাহিনী তাহা করিতে পারে নাই। বিক্রমদেবের ব্যক্তিত্বের সম্মুখে নরেশ এবং সুমিত্রার ব্যক্তিত্বের সম্মুখে বিপাশা ম্লান হইয়া গিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, মূল কাহিনীর ক্রমবিকাশের কোন অনিবার্য ধারা হইতে ইহাদের উদ্ভব হয় নাই বলিয়াই ইহাদের গুরুত্ব আরও লাঘব হইয়াছে।

সুমিত্রার চরিত্রের সম্মুখে বিক্রমদেবের চরিত্র এই নাটকে অনেকখানি নিষ্প্রভ হইলেও ইহা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রচণ্ড শক্তিমদমত্ততা সত্ত্বেও সুমিত্রার সম্মুখে রাজার অসহায়তা, একটুখানি মাত্র নারীর ক্ষুদ্র হৃদয় জয় করিবার তাহার ব্যর্থতার মধ্যে তাঁহার চরিত্র মধ্যে

মধ্যে যে করুণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নানা দিক দিয়া পাঠকের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে। তাঁহার নিষ্ঠুরতার মধ্যে যে রিক্ত অন্তরের মর্মভেদী হাহাকার গোপন হইয়া ছিল, তাহা এই নাটকে আরও করুণ এবং আরও স্পষ্ট হইয়াছে। সুমিত্রার প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যাইবার পর রাজা মন্ত্রীর সম্মুখে আস্ফালন কবিতেছেন, 'নিষ্ঠুর হবার প্রচণ্ড শক্তি আমার আছে।' কিন্তু এই শক্তি দিয়া তিনি জীবনে যে কিছুই অর্জন করিতে পারেন নাই, তাহা ভাবিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। নরেশের নিকট তাঁহার জীবনের সেই অভাবের কথা অকপটে প্রকাশ কবিয়া বলিতেছেন, 'নাবী যে সুধা এ'নেছে আমার দীনতম প্রজাবও ঘরে, আমি রাজ্যেশ্বর তার কণাও পাইনি,—আমার দিন রাত্রি তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে, সুধা সমুদ্রের তীরে বসে।' বিক্রমদেবের সমগ্র হিংস্র আচরণের মর্মমূলে তাঁহার হৃদয়ের যে এই একটি সুগভীর ক্ষতস্থান ছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাকে ক্রোধের পাত্র অপেক্ষা কৃপার পাত্র বলিয়াই বিবেচিত হইবে। এই ভাবটি এই নাটকে সুপবিস্ফুট হইয়াছে।

রাণীর প্রতি বিক্রমদেবেব প্রেম সত্য ছিল, কেবল মাত্র লালসা কিংবা মোহ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন নাটকেই লালসার চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। তবে 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে তাহা আছে সত্য, তথাপি সেখানেও লালসাকে অতিক্রম করিয়া জীবন কল্যাণে প্রতিষ্ঠা লাভ কবিবার কথাও স্থান পাইয়াছে। রাণীকে 'বন্দিনী' কবিয়া ধরিয়া আনিয়া শাস্তি দিবার সঙ্কল্প প্রকাশ কবিবাব মধ্যেও বাজাব তাঁহার প্রতি সুগভীর প্রেমানুভূতি প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল, ইহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বিক্রমদেবের 'ভয়ঙ্কর' রূপটি বিশ্লেষণ কবিয়া দেখিলে তাঁহার ভিতব হইতে তাঁহার প্রেমিক রূপটি বাহির হইয়া আসিবে।

এমন কি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া গিয়া তিনি রাণীকে 'স্বৈরিণী' বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানেও আশাভঙ্গ জনিত আঘাত তাঁহার যত তীব্রই হোক না কেন, রাণীর প্রতি তাঁহাব প্রচ্ছন্ন প্রেমবোধ লুপ্ত হয় নাই। তিনি তাহার পশুশক্তি বলে সুমিত্রাকে অধিকার করিতে পারিতেন, কিন্তু প্রেম যেখানে সত্য, সেখানে পশুশক্তি বলে অধিকার করিবার কোন প্রশ্নই আসিতে পারে নাই। রাজা বিক্রমদেবের চরিত্রের মধ্যে এই মহত্ত্বটুকুও প্রকাশ পাইয়াছে। রাণীকে পরিপূর্ণ ভাবে লাভ করিতে না পারিবার মধ্যে

তাহার বঞ্চনা যত তীব্রই হউক না কেন, তাহা দ্বারা তিনি রাণীর মর্যাদা৷ কোন দিন লাঘব করিতে যান নাই। তিনি যে বলিয়াছেন, 'পদানত ধূলি-শায়ী কাশ্মীরের চোখের উপর দিয়ে নিয়ে আসব তাঁকে বন্দিনী ক'রে, যেমন করে দাসীকে নিয়ে আসে, ইহা তাঁহার মুখের অভিমানের কথা, প্রাণের কথা নহে। তাঁহার যাহা দিবার শক্তি ছিল, তাহার সবটুকু দিয়াও তিনি রাণীকে পাইলেন না, শক্রর বিরুদ্ধে বিজয়ী হইয়াও পরাজিত শক্ররাজ্য হইতে সন্ধিসূত্রে আনীত রাজকুমারীর অন্তর তিনি জয় কবিতে পারিলেন না, তাঁহার এই পরাজয় তাহার বীরহৃদয়কে স্পর্শ করিল, তাহাবই প্রতিক্রিয়ারূপে রাণীর বিরুদ্ধে তিনি যাহাই উচ্চারণ করুন না কেন, তাহা তাহাব অন্তরের কথা হইতে পারে নাই। বিক্রমদেবের দেশজয় করিবার শক্তি আয়ত্ত ছিল, কিন্তু নারীব হৃদয জয় করিবার মন্ত্র জানা ছিল না। শক্তিদ্বাবা দেশ জয় করা যায়, কিন্তু মন্ত্র দ্বারা হৃদয় জয় করিতে হয়। নরেশ যে মন্ত্র জানিত, বাজা সেই মন্ত্র জানিতেন না, ইহারই বেদনা তাঁহাব সমগ্র অন্তরাত্মাকে বেদাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল; ইহারই বেদনার্ত হাহাকার তাহাব বহির্মুখী মৌখিক আস্ফালন এবং কাশ্মীরের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এই নাটক বিয়োগান্তক তাহাকে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার বিয়োগের ব্যথা কাহাকে সর্বাপেক্ষা আঘাত করিয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, রাজা বিক্রমদেবই এই আঘাতের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছেন। শূন্য হৃদয়ে তিনি যখন সুমিত্রার জ্বলন্ত চিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাহার মত রিক্ত এই কাহিনীর মধ্যে আর কেহই ছিল না। বিপুল পৃথিবীর মধ্যে যে একটি মাত্র অবলম্বন লইয়া তিনি জীবিত ছিলেন, রাজা হইয়া যাঁহার জন্য সিংহাসনের দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যাঁহার ধ্যানে প্রজাপালক হইয়া প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাকে চিরদিনের জন্য নিঃশেষে নিজের হাতের বাহিব হইয়া যাইতে দেখিয়াও তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই, তাঁহার তখনকার মনের অবস্থা নাট্যকার বর্ণনা করেন নাই সত্য, তথাপি এ' কথা বুঝিতে পারা যায়, সম্মুখস্থ চিতার আগুন তাহারই অন্তর দগ্ধ করিতেছিল। তাহার সকল শৌর্য বীর্য এখানে এক নারীর নিকট চবম পরাজয় স্বীকার করিল। সুমিত্রা মৃত্যুর ভিতর দিয়া চরম শান্তি লাভ করিলেন; কিন্তু বিক্রম দেব তাঁহার লাঞ্ছিত পৌরুষ ও আত্মাভিমান লইয়া বাঁচিয়া থাকিয়াও কঠিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তাঁহার এই

শোচনীয় পরাজয়ের মধ্যেই কাহিনীর বিয়োগাত্মক পরিণতি চরম করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

তপতীর চরিত্র রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কয়েকটি নাটকের নারী চরিত্রের প্রভাব অনুভব করা গেলেও, এ' কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের পরিণত শিল্পি-মানসের ইহা পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি। ইহাতে 'মালিনী' নাটকের মালিনী চরিত্রের প্রভাব আছে সত্য, কিন্তু মালিনীর করুণাবোধ তাহার স্বভাবজ ধর্ম ছিল, তাহার অন্য কোন বহির্মুখী কারণ সন্ধান করিয়া পাইবার উপায় নাই। কিন্তু সুমিত্রাব করুণাবোধের মূলে তাঁহার স্বাভাবিক নারীপ্রকৃতি ব্যতীতও অন্য বহির্মুখী কারণ ছিল। ভোগেব সকল অভিলাসকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি জালন্ধর রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ কবিয়াছিলেন। বিপাশা তাঁহার সম্পর্কে নবেশের নিকট বলিয়াছে, 'মহাদুঃখ ভোলবার মতোই মহাশক্তি তাঁর, তিনি যে সতী লক্ষ্মী। মৃত্যুর জন্যে যে আগুন জ্বলেছিল, তাকে সাক্ষী করে তাঁর বিবাহ। তিনদিন কৈলাসনাথের মন্দিরে ধ্যানে বসে উপবাস করে নিজেকে শুদ্ধ ক'রে নিয়েছেন। অসহ্য অপমানকে নিঃশেষে নিজের মধ্যে দগ্ধ কবে নিয়ে তবে এলেন তোমাদের ঘবে।' নরেশও অনুভব করিয়াছে যে, তিনি 'ধ্যানের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন একটি অপরূপ জ্যোতির্মূর্তি।' এই অপরূপ রূপ এবং চিৎশক্তি লইয়াই সুমিত্রাব সঙ্গে বিক্রমদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছে। তপস্বিনী রূপেই তিনি কাহিনীব মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র একটি ক্রমবিকাশেব সূত্র ধরিয়া যে এই নাটকে শেষ পর্যন্ত এই শক্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে। তাঁহার দুঃসহ দুঃখ-তপস্যোত্তীর্ণ রূপটিই নাটকের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহাই করুণায় বিগলিত হইয়া অত্যাচারিত প্রজাকুলের কল্যাণ-কামনায় নিয়োজিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, রাণী সুমিত্রার প্রতি বিক্রমদেবের ভালবাসা সত্য ছিল, সেখানে কোন লালসা কিংবা মোহের স্পর্শ ছিল না। সুমিত্রাও বলিয়াছেন, 'প্রচণ্ড ওঁর শক্তি, যে শক্তিতে বিলাসের আবিলতা নেই।' এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বিক্রমদেবের প্রতি সুমিত্রার প্রেমও কি সত্য ছিল? বিপাশার এই সন্দেহ হইয়াছিল। তাই একদিন সে সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মাপ করো, মহারাণী! আমার সন্দেহ হয়, তুমি তাঁকে অবজ্ঞা করো।' ইহার উত্তরে সুমিত্রা বিক্রমের প্রেমের এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া শেষ পর্যন্ত

বিপাশার সন্দেহই যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি রাত্মা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, 'ওই শক্তির দুর্জয়তাকে অহরহ ঠেকাতে গিয়েই আমার মন এমন পাষাণ হ'য়ে উঠল।' মন পাষাণ হইবার অর্থই বিক্রমদেবের প্রেমকে অস্বীকার করা। সুতরাং এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, সুমিত্রা বিক্রমদেবের অকুল প্রেম-সাগরের তীরে দাঁড়াইয়াও নিজে পিপাসায় মরিয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই বিপাশার কথায় জানিতে পারা গিয়াছে যে সকল ভোগ-তৃষ্ণাকে জয় করিয়াই তিনি জালন্ধররাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার কৈলাসনাথের মন্দিরে তিন দিন উপবাসী থাকিয়া তপস্যা করিবার ইহাই উদ্দেশ্য ছিল।

তপতীর চরিত্র তপস্বিনীব চরিত্র, পার্থিব ভোগ-বিলাসেব সঙ্গে তাহাব কোন যোগ নাই। সুতরাং নাটকীয় চরিত্ররূপে ইহার কি সার্থকতা, তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। একদিক দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, তপতীর চরিত্রের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই, পার্থিব কোন বিষয় কিংবা মানবিক কোন অনুভূতির দিক দিয়া ত কোন দ্বন্দ্ব নাই-ই, এমন কি, আদর্শের বিষয়েও কোন দ্বন্দ্ব নাই। রাজা বিক্রমদেবের সঙ্গে আদর্শের কোন বিরোধ লইয়াও তাহার কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নাই। কৈলাসনাথের মন্দিবে তিন দিনের নিরাহার তপস্যার মধ্য দিয়াই তিনি তাঁহার জীবনের সকল আদর্শ সুদৃঢ় ভাবে স্থির করিয়া লইয়া রাজা বিক্রমদেবেব অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানেও প্রজার কল্যাণ-চিন্তা করিয়া তিনি বিক্রমদেবের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, জালন্ধবে আসিয়া প্রজাব সেই কল্যাণ-চিন্তার ধারা অনুসরণ করিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলেন। সে কার্যে যখন তিনি বাধা পাইলেন, তখন তিনি তাঁহার পূর্ব সঙ্কল্পই সাধন করিবার জন্য সহজ ভাবে অগ্রসর হইয়া গেলেন। সেখানেও কোন বিষয়েই কোন দ্বন্দ্ব দেখা দিল না। সুতরাং পূর্ব নির্দিষ্ট সুদৃঢ় একটি সঙ্কল্প লইয়া তিনি নাট্যকাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নাটকীয় ঘটনার স্রোত তাঁহার সেই সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে তাহাকে আদর্শ চরিত্র বলিয়াই মনে হইবে। রক্তমাংসের দেহের সকল অনুভূতি তিনি কৈলাস-নাথের মন্দিরে তিন দিনের তপস্যার মধ্য দিয়াই বিসর্জন দিয়া আসিয়াছিলেন। সমগ্র নাট্যকাহিনী ব্যাপিয়া তাহা আর পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে নাই। নাটকীয় চরিত্র হিসাবে ইহা যে এই চরিত্রটির একটি ত্রুটি, তাহা অস্বীকার

করিতে পারা যায় না। 'মালিনী' নাটকের মালিনী-চরিত্রের মধ্যেও যে মানবিক অনুভূতিব বিকাশ দেখা গিয়াছিল, সুমিত্রার চরিত্রে তাহা লেশ মাত্রও অনুভব করিতে পাবা যায় না। সেইজন্য ইহা আদর্শায়িত নারী চরিত্র, এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিবার কিছু নাই।

বিক্রমদেবের চরিত্রেব মধ্যে ববীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী একটি নাটকের একটি চরিত্রের সামান্য প্রভাব অনুভব কবা যায়। তাহা 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের প্রতাপাদিত্য চরিত্র। তবে প্রতাপাদিত্যেব নিষ্ঠুবতার কোনও উদ্দেশ্য এবং অর্থ ছিল না, সেইজন্য তাহাব চরিত্র যন্ত্রচালিত বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু বিক্রমদেবেব নিষ্ঠুবতাব মূলে একটি নিগূঢ় অর্থ আছে। সেই দিক দিয়া বিক্রমদেব অধিকতব সার্থক সৃষ্টি।

'মুকুট'

রবীন্দ্রনাথের একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা সাধারণতঃ রবীন্দ্র নাট্য সমালোচক-দিগের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াছে, ইহার নাম 'মুকুট'। ইহা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রচিত এবং বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে 'বালক' পত্রে প্রকাশিত 'মুকুট নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস হইতে নাট্যকৃত।' ত্রিপুরা রাজপরিবারের একটি কল্পিত কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত ইহা একটি ক্ষুদ্র স্ত্রীভূমিকা বর্জিত নাটিকা। ইহার কাহিনীভাগ সংক্ষেপে এই প্রকার :

ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের তিন পুত্র—যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য, মধ্যম রাজকুমার ইন্দ্রকুমার এবং কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর। ইহাদের তিন জনেরই অস্ত্রশিক্ষক রাজ্যের সেনাপতি ঈশা খাঁ। ইহাদের মধ্যে যুবরাজ ইন্দ্রকুমার অত্যন্ত উদার প্রকৃতি, মধ্যম ইন্দ্রকুমার অত্যন্ত তেজস্বী এবং কনিষ্ঠ রাজধর অত্যন্ত কৌশলী। রাজধর নিজের সম্মান-বোধ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। প্রধান সেনাপতি ঈশা খাঁ তাহার অস্ত্রশিক্ষক, তথাপি তাঁহার নিকট তিনি বিনীত-স্বভাব না হইয়া রাজকুমারোচিত মর্যাদা পাইবার জন্য উগ্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেনাপতি ঈশা খাঁ সর্বদা তাঁহার প্রতি সেই মর্যাদা প্রকাশ করেন না বলিয়া তিনি পিতার নিকট গিয়া এই বিষয়ে অভিযোগ করিলেন। মহারাজও ঈশা খাঁকে কুমারদিগের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করিয়া ব্যবহার করিতে বলিলেন। ঈশা খাঁ রাজধর সম্পর্কেও মহারাজের নিকট অভিযোগ করিলেন, 'রাজবংশের এই কনিষ্ঠ পুত্রটি বড়ো হলে মুন্সীর মতো কলম চালাতে পারবে, কিন্তু তলোয়ার এ'র হাতে শোভা পাবে না।' মহারাজ তিন পুত্রেরই ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা লইবেন, স্থির করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে-পুত্র জয় লাভ করিবে, তাঁহাকে তিনি তাঁহার হীরা বাঁধানো তলোয়ারটি উপহার দিবেন।

পরীক্ষার পূর্বরাত্রে রাজধর গোপনে অস্ত্রশালায় প্রবেশ করিয়া নিজের নামাঙ্কিত তূণের সঙ্গে মধ্যম কুমারের নামাঙ্কিত তূণের বদল করিয়া রাখিয়া আসিল। পরীক্ষার সময় সকলে দেখিল, মধ্যমকুমার লক্ষ্য ভেদ করিয়াছে, কিন্তু তীর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, তাহাতে রাজধরের নামাঙ্কিত। সুতরাং কনিষ্ঠ কুমার রাজধর কৌশলে জয়লাভ করিয়া পিতার পুরস্কার লাভ করিল।

এদিকে সংবাদ পাওয়া গেল, আরাকানের রাজা সসৈন্যে চট্টগ্রামের সীমান্ত অঞ্চলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। ত্রিপুরারাজ তিন পুত্রকেই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। ঈশা খাঁ তিন রাজপুত্রের উপরই অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

রাজধর ঈশা খাঁর নিকট হইতে পাঁচ হাজার সৈন্য চাহিয়া লইয়া সৈন্যদিগকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া রহিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর যখন ত্রিপুরা এবং আরাকান উভয় পক্ষের সৈন্যরাই নিজেদের শিবিরে বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় রাত্রির অন্ধকারে রাজধর অতর্কিতে নদী পার হইয়া শত্রু শিবির আক্রমণ করিয়া আরাকান রাজকে বন্দী করিলেন। তাঁহার সঙ্গে নিজেই সন্ধি স্থাপন করিয়া সন্ধির সর্ত স্বরূপ তাহার রাজ মুকুটটি চাহিয়া লইলেন। মধ্যম কুমার বলিলেন, সেনাপতির অনুমতি ব্যতীত সন্ধি স্থাপন করিয়া রাজধর যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার জন্য সে শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু যুবরাজ শাস্তি দিবার বিরোধী।

আরাকান রাজের যে মুকুটটি রাজধর অধিকার করিয়া আনিয়াছেন, রাজধর বলিলেন, সেই মুকুট তিনিই পরিবার অধিকারী, আর কেহ নহে। মধ্যম কুমার বলিলেন, যুবরাজ এই মুকুট পরিবে। কিন্তু যুবরাজ নিজেই রাজধরের মাথায় সেই মুকুট পরাইয়া দিলেন। ইন্দ্রকুমার ইহাতে ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন। তিনি সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ঈশা খাঁ আসিয়া মুকুটটি রাজধরের মাথা হইতে খুলিয়া যুবরাজের মাথায় পরাইতে গেলেন, যুবরাজ তাহা পরিতে চাহিলেন না। ঈশা খাঁ অবশেষে মুকুটটি লইয়া গোমতীর জলে নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন, 'রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন, উনি শাস্তির যোগ্য।' ক্রুদ্ধ হইয়া রাজধর চলিয়া গেলেন।

রাজধর আরাকান-রাজের শিবিরে তাঁহার একজন অনুচরকে পাঠাইলেন, নিজের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া ত্রিপুরা সৈন্যকে আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিলেন। আরাকান-রাজের অতর্কিত আক্রমণে ত্রিপুরা সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল। আহত যুবরাজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে এক বৃক্ষতলে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইন্দ্রকুমার ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পায় পড়িলেন। রাজধর মুকুট লইয়া আসিয়া মুমূর্ষু যুবরাজের পায়ের কাছে রাখিলেন। যুবরাজ ইন্দ্রকুমারকে তাহা পরাইয়া দিতে বলিলেন, ইন্দ্রকুমার তাহা পরিতে

চাহিলেন না, তিনি রাজধরের মাথায় তাহা পরাইয়া দিলেন। যুবরাজের সেখানেই মৃত্যু হইল।

এই নাটকের কাহিনী অনেকটা রূপকথা-ধর্মী। রূপকথার একটি অভিপ্রায় (motif) এই যে, তাহাতে রাজার কনিষ্ঠ পুত্র ছলে বলে কৌশলে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিয়া জীবনে অন্যান্য ভাইদের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। এখানেও তাহাই হইয়াছে। রাজধর শেষ পর্যন্ত যে মুকুট লাভ করিলেন, তাহা তাঁহার বীরত্ব কিংবা চরিত্রের অন্য কোন মহিমার জন্য নহে, কেবল মাত্র কৌশলেই তিনি তাহা সম্ভব করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে এমন কোন গুণ প্রকাশ পায় নাই, যে জন্য শেষ পর্যন্ত যুবরাজের মৃত্যুর মধ্যেও তাঁহার মুকুট উপহার লাভ করা কাহিনীব বিয়োগান্তক করুণ রসের মধ্যে মিলনাত্মক পরিণতির কোন শুভ ইঙ্গিত সূচনা করিতে পারে। নাটকের মধ্যে যে উদার চরিত্র সেই যুবরাজের অন্যায় ভাবে মৃত্যু হইয়াছে এবং নাটকের মধ্যে যে খল (villain) চবিত্র, সে অন্যায ভাবে পুবস্কৃত হইয়াছে। সুতরাং কাহিনীর দিক দিয়া এই নাটক ত্রুটিমূলক, বালকদিগের জন্য রচিত হইলেও বালকদিগের সম্মুখে ইহা কোন উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতে পাবে নাই।

যুবরাজের চরিত্রটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাঙ্কেতিক যুগে সর্বপ্রথম রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের যুবরাজ উদয়াদিত্যের চরিত্রেব পূর্বাভাস সূচিত হইয়াছে। বালকদিগের জন্য অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত বলিয়া ইহাতে স্ত্রীভূমিকা বর্জিত হইয়াছিল, সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ ইহাব পরিকল্পনায় স্বাধীন প্রতিভাব বিকাশ দেখাইতে পাবেন নাই। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে যুবরাজ উদয়াদিত্য কনিষ্ঠা ভগিনী বিভাব প্রতি যে স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাতে যুবরাজ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের প্রতি তেমনি স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তবে তাহা কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই।

কাহিনীর সংক্ষিপ্ততার জন্য ইহাতে কোন চরিত্রই সম্যক্ স্ফূর্তি লাভ করিতে না পারিলেও ঈশা খাঁর চরিত্রটিও সুপরিকল্পিত। ঐতিহাসিক ঈশা খাঁর সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই, মনে হয়, এই প্রকার ঐতিহাসিক চরিত্রের নাম রোমান্টিক রচনা সম্পর্কে পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। এখানেও ইহার পরিবর্তে অন্য কোন নাম গ্রহণ করিলেই ভাল হইত।

অষ্টম অধ্যায়

নৃত্য-নাট্য

বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের আনুপূর্বিক নৃত্যানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া একটি অখণ্ড ভাব প্রকাশ করাই রবীন্দ্রনাথেব নৃত্য-নাট্যগুলির উদ্দেশ্য ছিল। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে তখন নৃত্যকলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ বয়সে তাঁহাব পূর্ববচিত কয়েকখানি নাট্য-কাব্য ও পদ্যকাহিনী নৃত্য-নাট্যের রূপ দিয়া পুনঃপ্রকাশিত করেন। ইহাদের কাহিনী নির্বাচন ও চবিত্রগুলিব পরিকল্পনায় তদানীন্তন শান্তিনিকেতনেব কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদিগেব বিশিষ্ট নৃত্যগুণেব উপর যে লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাও প্রথমে শান্তিনিকেতনে সর্বপ্রথম অভিনীত হইয়া রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই শান্তিনিকেতনেব ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক ভারতেব বিভিন্ন অঞ্চলেব সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও অভিনীত হইয়াছিল। সঙ্গীত ও, সংলাপ ইহাদেব মুখ্য না হইয়া নৃত্যই ইহাদেব মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার ফলে অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণও অতি সহজেই ইহাদেব রস গ্রহণ কবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

নৃত্য-নাট্য এবং সাধারণ নাটকের পার্থক্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেব পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী লিখিযাছেন, 'নৃত্যনাট্যে কলাকৌশল কথার ভাষা নিয়ে কারবার কবে না, তার ভাষা হ'ল সুর ও তাল, ভাব খেলে তার দেহরেখায়। এই রেখার খেলামাত্রেই ছবির বিষয় এসে পড়ে, তাই তাব জন্য পটভূমির দরকার হয় রঙ ও আলো। এই রঙ্ ও আলো ছাড়া নৃত্যকলার পরিপ্রেক্ষিতে ফুটিয়ে তোলা শক্ত, বিশেষতঃ যখন সে নাটকীয় রাজ্যে গিয়ে পৌছয়। নাচেতে দেহের রেখা খুব নিখুঁত হওয়া চাই, কোথাও তার কোনো অবান্তর ভঙ্গী তালের সঙ্গে ভঙ্গীর সঙ্গতি রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। রেখা ও তালের মিলন ছাড়া নৃত্যকলা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কবিতা ও গদ্যে যে তফাৎ, নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ নাটকের সেই রকম পার্থক্য' (প্রবাসী, ১৩৪৩ চৈত্র, ৭৯২)। উপরোক্ত কথাগুলি একটু বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

নৃত্যনাট্যে সুর ও তাল এবং ভাষা ও দেহভঙ্গির ভিতর দিয়া ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে—এই উভয়ের যথার্থ মিলনের ভিতর দিয়াই নৃত্যনাট্যের

সার্থকতা। ইহাই উদ্ধৃত অংশের মূল তাৎপর্য। গদ্যের সঙ্গে পদ্যের যে পার্থক্য, 'নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ নাটকের সেই রকম পার্থক্য', একথা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এখন কথা হইতেছে, সুর তাল ও দেহভঙ্গি আশ্রয় করিয়া যে রস ও ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে প্রকৃত নাট্যিক উপাদান কতটুকু থাকিতে পারে? নাটকের প্রধান লক্ষ্য যে বিপরীতধর্মী আদর্শের সংঘাতের ভিতর দিয়া সুকঠিন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা, তাহা কি সুর, তাল ও নৃত্যের ভিতর দিয়া যথার্থ প্রকাশ পাইতে পারে? নাট্যিক ক্রিয়ার (dramatic action) অংশটি কি এখানে ক্ষুণ্ণ হয় না? যদি তাহাই হয়, তবে ইহাদিগকে নৃত্য-'নাট্য' বলা কতদূর সঙ্গত হয়?

এইকথা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, নৃত্যনাট্যের মধ্যে সুরই প্রাধান্য লাভ করে, এই সুরকে অনুসরণ করিয়াই নৃত্য-ক্রিয়া। নৃত্য-ক্রিয়া ও নাট্য-ক্রিয়া এক নহে, একটি বিশেষ পথ ধরিয়া অগ্রসর হয়, অপরটি স্বাধীন। অতএব নৃত্য-ক্রিয়া দ্বারা নাট্যক্রিয়া (dramatic action)-কে রূপ দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং নৃত্যনাট্যগুলিকে নৃত্যগীতিকা বলাই সঙ্গত হয়।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি সম্পর্কে আর একটি প্রধান কথা এই যে, তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাব্যের বিষয়কে নাট্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কাব্যের মধ্যে একটি ভাব থাকে, তাহা কাব্যের ভাষায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব না হইলেও, দেহের ভঙ্গি বা নৃত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য এই সকল ক্ষেত্রে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা অপরিহার্য হইয়া উঠে। নৃত্যের ভিতর দিয়া রস ও আনন্দের ভাবটি যত সহজে প্রকাশ পায়, কোন তত্ত্বকথা তত সহজে প্রকাশ পাইতে পারে না। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির অভিনয়কালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নৃত্যের পটভূমিকায় অনেক ক্ষেত্রেই ভাষা আশ্রয় করা হইয়াছে। নৃত্যের সঙ্গে কতকটা সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য সে ভাষা পদ্যের ভাষা হইতে পারে, কিন্তু তথাপি কেবলমাত্র তাল ও নৃত্যের ভিতর দিয়া উদ্দিষ্ট ভাবটি প্রকাশ পায় না বলিয়াই যে এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাষার সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। যদিও একথা বলা হইয়াছে যে, নৃত্যনাট্য দৃশ্য এবং শ্রাব্য, কিন্তু পাঠ্য নয়, তথাপি ইহার কোন কোন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য পাঠ্য অংশও অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

নৃত্যনাট্যগুলির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র যদি তত্ত্বহীন আনন্দরস

পরিবেশন করিতেন, তাহা হইলে ইহাদের রচনা অধিকতর সার্থকতা লাভ করিতে পারিত। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, নৃত্যের ভিতর দিয়া আনন্দ যত সহজে প্রকাশ পায়, তত্ত্ব তত সহজে প্রকাশ পায় না। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'শেষ বর্ষণ' এবং 'শ্রাবণ-ধারা' নামক গীতিনাট্য দুইটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে গভীর কোন তত্ত্ব নাই, যাহা আছে, তাহা অনাবিল রস। অতএব 'শেষ বর্ষণে'র নৃত্যনাট্য যত সহজে অন্তর অধিকার করে, 'চিত্রাঙ্গদা'র মত তত্ত্বমূলক নাটক, তত সহজে তাহা পারে না। রবীন্দ্রনাথ যে বয়সে নৃত্যনাট্যগুলি রচনা করেন, সেই বয়সে মৌলিক নাট্য রচনার প্রতিভা তাঁহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। যদি তাহা না হইত, তবে তাঁহার মত রসশিল্পী অতি সহজেই এই কথাটি নিজেই ধরিতে পারিতেন এবং সেই অনুযায়ী সার্থক মৌলিক নৃত্যনাট্য রচনা করিতে পারিতেন, প্রয়োজনের অনুরোধে কাব্যের বিষয়কে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করিবার ফলে যে ত্রুটি এখানে দেখা দিয়াছে, তাহা ইহাদের মধ্যে থাকিত না।

নৃত্যনাট্যগুলির ভাষা রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের গদ্য কবিতার ভাষা। মধ্যে মধ্যে পূর্বরচিত সঙ্গীত এবং কোন কোন স্থানে কালোপযোগী নূতন সঙ্গীতও ইহাদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু নূতন রচিত সঙ্গীতের মধ্যেও তাঁহার পূর্বরচিত সঙ্গীতের ভাব ও সুরেরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে নৃত্যনাট্যগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভার অস্তযুগে (decadent period) রচিত, সেইজন্য মৌলিক সাহিত্যিক আবেদন ইহাদের ভিতর প্রায় কিছুই নাই,—শান্তিনিকেতন-কলাভবনের বিশিষ্ট নাট্য-কৌশল ইহাদের ভিতর দিয়া রূপ লাভ করিয়াছে বলিয়াই ইহাদের মূল্য। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহারা 'দৃশ্য এবং শ্রাব্য' বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, 'পাঠ্য' বলিয়া কেহই স্বীকার করেন না, এমন কি, রবীন্দ্রনাথ নিজেও নহেন।

'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'

চিত্রাঙ্গদার বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে একখানি নাট্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বে যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। অতঃপর এই নাট্যকাব্যখানিকেই তিনি নৃত্যনাট্যরূপে পুনরায় প্রকাশ করেন, তখন ইহার নূতন নামকরণ হয়, 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'। ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য। ইহার অধিকাংশই গানের উদ্দেশ্যে রচিত এবং সামান্য কিছু অংশ মাত্র 'কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে' রচিত। নৃত্যের পটভূমিকায় সঙ্গীত ও আবৃত্তির সহায়তা গ্রহণ করিয়া কাহিনীটিকে রূপ দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার 'কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে' রচিত ছোট ছোট কবিতাগুলির তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'তারা মাঝে মাঝে সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে মূল ঘটনার, গান ও নাচ বন্ধ করে দর্শকের চিত্তকে বিশ্রাম দেওয়ার সঙ্গে নাটকের ঘটনাসূত্রের যোগ রাখাই হল তাদের কাজ, এই কবিতাগুলির ছন্দ দেহের নৃত্যলীলাকে বাঁচিয়ে রাখে। পরবর্তী নৃত্য যে আবার সেই ভঙ্গীর মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠ্‌বে এ যেন তারই ভূমিকা' (প্রবাসী, ১৩৪৩, চৈত্র, ৭৯২)। এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আনুপূর্বিক নৃত্য ও তাহার পটভূমিকাস্থিত সঙ্গীত দ্বারা যে কাহিনীর প্রবাহ অব্যাহত থাকিতে পারে না, নৃত্যনাট্যের এই ত্রুটি সম্পর্কে নাট্যকার নিজেও সজাগ ছিলেন। গান ও নাচ বন্ধ করিয়া যেখানে কথার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, সেখানেই 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে'র দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা চিত্রাঙ্গদার বিষয়বস্তুর ত্রুটি, নৃত্যনাট্য মাত্রেরই ত্রুটি নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, চিত্রাঙ্গদার মধ্যে একটি তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, নৃত্যের যাহা প্রধান উপজীব্য অর্থাৎ রস তাহা এখানে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। যদি তাহা পারিত, তবে আবৃত্তির উদ্দেশ্যে রচিত ছোট কবিতার সাহায্য ইহাতে গ্রহণ না করিলেও চলিত; কারণ, তত্ত্বকথা নৃত্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, সেখানে প্রত্যক্ষ ভাষারই সাহায্য লইতে হয়।

'চণ্ডালিকা'

'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' রচনাব দুই বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চণ্ডালিকা' নাটিকাটির একটি নৃত্যনাট্যরূপ প্রকাশিত করেন। ঐ বৎসরই কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ইহা সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। ইহার পরবর্তী বৎসর যখন পুনরায় ইহার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ইহাকে আগাগোড়া নূতন করিয়া পারমার্জনা করেন। তাহাতে নূতন নূতন সঙ্গীত ও কথা সংযোজিত হয় এবং পুরাতন বহু অংশ পরিত্যক্ত হয়। 'চণ্ডালিকা' নাটিকা হইতে 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র কাহিনীটি একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। পরিমার্জিত সংস্কবণ নৃত্যনাট্যের কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদল ফুলওয়ালী ফুল বিক্রয় করিতে চলিয়াছে, চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি তাহাদের নিকট ফুল চাহিতেই তাহারা ঘৃণাভরে চলিয়া গেল। দইওয়ালা দই বিক্রয় কবিতে আসিল, প্রকৃতি দই কিনিতে চাহিল, সকলে প্রকৃতিকে ছুঁইতে নিষেধ করিল। এক চুড়িওয়ালাও তাহার প্রতি এই আচরণ করিল। দুঃখে ও গ্লানিতে চণ্ডালিকার মন ভরিয়া উঠিল, সে ভগবানকে ধিক্কাব দিল। প্রকৃতির মা আসিয়া তাহাকে গৃহকর্মে অমনোযোগিতার জন্য অনুযোগ দিল, সে মাকেও তিরস্কার করিয়া বিদায় দিল। বুদ্ধশিষ্য আনন্দ আসিয়া চণ্ডালিকাব নিকট জল চাহিলেন, চণ্ডালিকা তাঁহাকে জল দিতে সঙ্কোচ বোধ করিল, কিন্তু আনন্দ নিঃসঙ্কোচে তাহার হাত হইতে জল পান করিলেন। জল পান করিয়া আনন্দ চলিয়া গেলেন, তাঁহার রূপ ও করুণায় প্রকৃতির মন ভবিয়া গেল, তাঁহাকে সে ভুলিতে পারিল না। প্রকৃতির মা ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র জানিত। প্রকৃতি মাকে গিয়া ধরিয়া পড়িল,—মন্ত্র পড়িয়া ভিক্ষুকে এখানে লইয়া আইস, আমি তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিব। প্রকৃতির মা তাহাতে সম্মত হইল। সে মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিল। প্রকৃতি মায়া-দর্পণের মধ্যে দেখিল, মন্ত্রের আকর্ষণী গুণে আনন্দের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, শেষ পর্যন্ত পরাভূত আনন্দ প্রকৃতির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; প্রকৃতি তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিল। আনন্দ প্রকৃতিকে আশীর্বাদ করিলেন।

নৃত্যনাট্যের পক্ষে 'চণ্ডালিকা'র বিষয়বস্তু 'চিত্রাঙ্গদা' হইতে অধিকতর উপযোগী। 'চিত্রাঙ্গদা'র কাহিনী কাব্যের কাহিনী, কিন্তু 'চণ্ডালিকা'র কাহিনী

যথার্থই নাটকের কাহিনী, ইহার মধ্যে অন্তর ও বহির্মুখী দ্বন্দ্ব আছে। এই দ্বন্দ্ব যে উচ্চতর নাটকেরও অবলম্বন হইতে পারে, নৃত্যনাট্যের অপরিসর ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ তাহা অতি কৌশলে দেখাইয়াছেন।

চণ্ডালিকার জীবনের মধ্যে মানব-জীবনেরই একটি সহজ অনুভূতির সুন্দর বিকাশ হইয়াছে। জীবনের সহজ পথে চলিতে চলিতে স্বাভাবিক ভাবেই তাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল, সেই দ্বন্দ্ব তাহার দেহের দুই কূল ছাপাইয়া তাহার নিভৃত অন্তরকেও গিয়া স্পর্শ করিল। বুদ্ধশিষ্য আনন্দের করুণায় প্রকৃতির অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে, রূপে চক্ষু ভরিয়াছে। এই ভাবে মন ও দেহের আকর্ষণের ভিতর দিয়া প্রকৃতি নিজেকে লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। এখানে নৈর্ব্যক্তিক কোন তত্ত্বকথা নাই; যাহা আছে, তাহা একান্তভাবে ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়াই আছে, সেইজন্য দেহের ভঙ্গিতে তাহার অভিব্যক্তিও সহজ। আনন্দের সংস্পর্শে আসিয়া প্রকৃতির মধ্যে প্রেম দেখা দিয়াছে, সেই প্রেম নৈর্ব্যক্তিক বা প্ল্যাটোনিক প্রেম নহে; কারণ, তাহার সম্মুখে রহিয়াছে আনন্দের রূপ, এই প্রেম রূপজ প্রেম; অতএব ইহার মধ্যে রক্ত-মাংসের কামনা-বাসনা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে; সুতরাং তাহারই আকুলতা নৃত্যের ভিতর দিয়া সহজে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই নৃত্যনাট্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র আনন্দ। নাট্যকার সংসারত্যাগী ভিক্ষু আনন্দের মনেও অনুরূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু সেই দ্বন্দ্বকে তাহার প্রকাশ্য নৃত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ না করিয়া তাহার ছায়া-অভিনয়ের ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সংযমবোধের পরিচয়টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটি সুগভীর সত্যকে রবীন্দ্রনাথ এখানে কেবলমাত্র আভাস ও ইঙ্গিতের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতির নিকট জল চাহিবার মধ্যে ভিক্ষু আনন্দের কি কেবল অহৈতুক সর্বমানবে সাম্যবোধই প্রকাশ পাইয়াছিল, না তাহার অন্তরের কোন অজানিত কক্ষ হইতে চিরন্তন কোন মানবিক তৃষ্ণা হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিল? যদি তাহা না হইবে, তবে আনন্দের মধ্যে এই সংগ্রাম কিসের?

শ্রীমতী প্রতিমা দেবী লিখিয়াছেন, 'দেহের অনুপম ভঙ্গিমার মধ্যে দিয়ে মনোজগতের ইতিকথাকে নয়নগোচর ক'রে তোলাই ছিল চণ্ডালিকার আদর্শ।' 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য' এই আদর্শ রক্ষায় সার্থক রচনা। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনা বলা যাইতে পারে।

'শ্যামা'

'মহাবস্তুবদান' অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'কথা ও কাহিনী'তে 'পরিশোধ' নামক একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিছুকাল পর তিনি ইহাকে গীতিনাট্যের রূপদান করিয়া শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদিগের সহায়তায় কলিকাতায় আসিয়া মঞ্চস্থ করেন। এই নাট্যগীতি অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য রচনা করেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ নৃত্যনাট্য রচনা।

'পরিশোধ' বা 'শ্যামা'র কাহিনী 'মহাবস্তুবদান' হইতে রবীন্দ্রনাথ সামান্য পরিবর্তিত কবিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পিত কাহিনীটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে,—বজ্রসেন নামক এক বণিক বহু সন্ধানে ইন্দ্রমণির একটি হার সংগ্রহ করিল। সে ভাবিল, এই হার সে বিক্রয় না কবিয়া যাহাকে বিনামূল্যে দিতে পাবে, তাহাকেই দিবে। কিন্তু সে জানিতে পাবিল, ইহার উপর রাজার চরের দৃষ্টি পডিয়াছে। বজ্রসেন হারটি লইয়া বাজ্য ছাডিয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু বিদেশেব কোটাল তাহাকে চোব অপবাদ দিয়া ধবিল। বাজনটী শ্যামা কোটালের সঙ্গে বজ্রসেনকে দেখিতে পাইল, দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইল। বজ্রসেনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল, শ্যামা তাহার সহচরীকে প্রহরীর নিকট পাঠাইয়া দুই দিনের জন্য তাহার প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখিল। শ্যামা তাহার নৃত্যসভায় সমবেত লোকদিগেব উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ কি নাই যে এই বিদেশীকে মিথ্যা অপবাদ হইতে রক্ষা করিতে পার? বালক উত্তীয় শ্যামার প্রেমে পাগল; কিন্তু শ্যামা কোন দিন তাহার দিকে মুখ তুলিয়াও তাকায় নাই। সে শ্যামার কথায় নিজের মাথায় অপবাদ লইয়া বণিককে মুক্ত করিল। বজ্রসেন মুক্তিলাভ করিল, পরিবর্তে উত্তীয়র প্রাণদণ্ড হইল, বজ্রসেনের সঙ্গে শ্যামার মিলন হইল। দুইজনে একত্র দেশত্যাগ করিয়া গেল। বজ্রসেন শ্যামার নিকট বারবার জানিতে চাহিল, কি করিয়া সে তাহাব মুক্তি সাধন করিয়াছে। অবশেষে শ্যামার মুখ হইতেই উত্তীয়ের আত্মদানের কথা জানিতে পারিল। বজ্রসেন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্যামাকে আঘাত করিয়া চলিয়া গেল। শ্যামা পুনরায় বজ্রসেনকে সন্ধান করিয়া বাহির করিল। পুনরায় বজ্রসেন তাহাকে ধিক্কার দিয়া বিদায় করিয়া দিল।

লঘু সঙ্গীত ও নৃত্যের ভিতর দিয়া রূপদানের উদ্দেশ্যে এই কাহিনী রচিত হইলেও স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহা একটু অতিরিক্ত বস্তুভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সচেতন ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'গানে আমি রচনা ক'রেছি শ্যামা, রচনা করেছি চণ্ডালিকা। তার বিষয়টা বিশুদ্ধ স্বপ্নবস্তু নয়। তীব্র তার সুখদুঃখ ভালো-মন্দ। তার বাস্তবতা অকৃত্রিম এবং নিবিড়।' (প্রবাসী ১৩৪৫, চৈত্র, পৃঃ ৬৮২)। কিন্তু এই বাস্তবতা সম্পর্কে 'চণ্ডালিকা'র সঙ্গে 'শ্যামা'র কতকগুলি স্থূল পার্থক্য আছে। প্রথমত চণ্ডালিকার সুখ-দুঃখ ও ভালো-মন্দের তীব্রতা একান্তভাবে নাট্যিক চরিত্রগুলির মনোজগৎ আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে, বাহিরের বাস্তব জগতে তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই; কিন্তু শ্যামা সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। ইহার সুখ-দুঃখ ও ভালোমন্দের তীব্রতা বাহিরের জগৎকেও প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করিয়াছে। সেইজন্য ইহা অধিকতর বস্তু-ভারাক্রান্ত। নৃত্য ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া এই ভার সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়া এই কাহিনীটিকে একটি স্বচ্ছ গতিদান করিতে পারে নাই। শ্যামা নৃত্য-নাট্যের ইহা একটি কাহিনীগত ত্রুটি বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর এই বস্তুভার সম্পর্কে নিজেই বলিয়াছেন, 'কিন্তু এগুলোকে পুলিশ কেসের রিপোর্টরূপে বানানো হয় নি—গানে তার বাধা দিয়েছে—চারিদিকে যে দূরত্ব বিস্তার করেছে তাকে পার হয়ে পৌছতে পারেনি যা কিছু অবান্তর, যা অসংলগ্ন, যা অনাহূত, আকস্মিক। অথচ জগতের সব কিছুর সঙ্গেই আছে অসংলগ্ন, অর্থহীন আবর্জনা; তাদের সাক্ষ্য নিয়ে তবেই প্রমাণ করতে হবে সাহিত্যের সত্যতা, এমন বে-আইনী বিধি মানতে মন বাধ্‌ছে। অন্তত গানে একথা ভাবতেই পারিনে (ঐ)।' কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'শ্যামা'র গানের ভিতর দিয়া বস্তুর এই আবর্জনা সম্পূর্ণ দূর হইয়া যাইতে পারে নাই।

উপসংহার

রোমান্টিক-ধর্মী গীতিনাট্য-রচনার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের যে নাট্যকার জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই রোমান্টিক-ধর্মী নাট্যরচনার ভিতর দিয়াই তাহার অবসান হইয়া গেল, কিন্তু সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে রচিত তাঁহার জীবনের দুই প্রান্তবর্তী নাট্যরচনায় কেবলমাত্র একটি বহির্মুখী সামান্য পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আঙ্গিকগত, তাঁহার প্রথম জীবনের নাটকগুলি ছিল গীতিনাট্য, কিন্তু শেষ জীবনের নাটকগুলি হইল নৃত্যনাট্য। বিষয়বস্তু ব্যবহারের দিক হইতে এই উভয় শ্রেণীর নাটকে যে খুব বেশি পার্থক্য আছে, তাহা নহে। তাঁহার প্রথম জীবনের গীতিনাট্যগুলি যেমন গীতিনাট্য হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত ঘটনাভারাক্রান্ত, তেমনি তাঁহার শেষজীবনের নৃত্যনাট্যগুলিও ঘটনার দিক দিয়া অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। গীতিনাট্য কিংবা নৃত্যনাট্য ঘটনার দিক দিয়া লঘুভার হইলে ইহাদেব অন্তর্নিহিত ভাব কিংবা রসের অভিব্যক্তি যেমন সার্থক হইতে পাবে, রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি তাহা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথেও নাট্যরচনার সংস্কারেব মধ্যে অতিনাটকীয়তা (melo-drama)-র একটি ত্রুটি প্রায় সর্বত্রই প্রকাশ পাইয়াছে। শেষ জীবন পর্যন্ত সেই সংস্কার তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই; তাঁহার সর্বশেষ নাট্য-রচনা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য অতিনাটকীয় ঘটনায় পরিপুর্ণ, কিন্তু ঘটনাগুলি তাহাতে অভিনয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশ না করিয়া সঙ্গীত ও নৃত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রথম জীবনের গীতিনাট্যগুলির মধ্যেও যে অতিনাটকীয় ঘটনা রাশীকৃত হইয়া বহিয়াছে, তাহাও নাটিক্য ক্রিয়ার ভিতর দিয়া প্রকাশ না পাইয়া কেবলমাত্র গীতি-সংলাপের ভিতর দিয়াই প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে নাটকের অন্তর্মুখী কোনও নূতন প্রেরণা নাই। একটি বিশিষ্ট আঙ্গিককে রূপায়িত করিবার জন্য তিনি নৃত্যনাট্যই সেদিন অবলম্বন করিয়াছিলেন মাত্র।

একথা মনে হইতে পারে যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ যেমন বাংলা নাটক রচনা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, রবীন্দ্র-নাথ কোনও ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বলিয়া তিনি স্বাধীন-ভাবে নাটক রচনা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম

জীবনের নাটকগুলি সম্পর্কে ঐ কথা বলিতে পারা গেলেও, শেষ জীবনের নাটকগুলি সম্পর্কে একথা বলিতে পারা যায় না। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হইবার পর হইতেই রবীন্দ্রনাথ ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ কর্তৃক প্রভাবিত না হইলেও একটি বিশেষ মঞ্চব্যবস্থা ও অভিনেতৃগোষ্ঠী লক্ষ্য করিয়াই নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্বাধীনভাবে নাটক রচনার প্রেরণা তখন হইতেই তাঁহার মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রথম যুগে দীনবন্ধু মিত্র এবং শেষ যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত ব্যবসায়ীই হউক কিংবা সৌখীনই হউক, রঙ্গমঞ্চের সম্পর্ক নিরপেক্ষ হইয়া কোনও উল্লেখযোগ্য নাট্যকারই বাংলাদেশে নাটক রচনা করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্র যেমন একান্ত মঞ্চনির্ভর নাটক রচনা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনই তাঁহার মধ্য বয়স হইতেই তাঁহার শান্তিনিকেতনেব সুনির্দিষ্ট শিল্পিগোষ্ঠীকে একান্তভাবে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী গঠিত মঞ্চনির্ভর নাটক রচনা করিয়াছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার একান্ত অভাব ছিল। তবে ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য এই, গিরিশচন্দ্র যে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চকে একান্তভাবে নির্ভব করিয়াছিলেন, তাহাব ভিতর দিয়া তিনি সে যুগের গণ-চিত্তেব সঙ্গে সংযোগ বক্ষা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবল ব্যক্তিত্ব দ্বারা রঙ্গমঞ্চকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিলেন এবং কেবলমাত্র সেই আদর্শটি সম্মুখে রাখিয়া নাটকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনের নাটকে এই ত্রুটি প্রকাশ না পাইলেও, তাঁহার শেষ জীবনের নাটকগুলি এই ত্রুটি হইতে মুক্ত নহে।

শান্তিনিকেতনের কলা-ভবনে নৃত্যশিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পরই রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনা বিশেষ একটি ধারা অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে। নৃত্যই তখন হইতে তাঁহার লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল, নাট্য তাহা হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-সাধনায় জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত যেমন একটি স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত ধারা অনুসরণ করিয়াছেন, বহির্মুখী কোন আদর্শ তাঁহার দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে আবিল করিয়া তুলিতে পারে নাই, নাটক রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাহা সফল করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তিনি ব্যবসায়ী কিংবা সৌখীন সকল শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁহার নাট্যরচনার সূত্রপাত করিলেও, শেষ পর্যন্ত যেমন একটি অভিনেতৃগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার নাটক রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তেমনই ইহা যে একটি বিশিষ্ট

উত্তরাধিকার সৃষ্টি করিতে পারে নাই, কিংবা বৃহত্তর দর্শকগোষ্ঠীর সঙ্গে কোন যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই, ইহার তাহাই কারণ।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের নাটকগুলির আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের মধ্যে এক দিক দিয়া যেমন সমসাময়িক কালের বহির্মুখী বিষয়ের অবতারণা আছে, তেমনই ইহাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মনোভাবও অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম জীবনের নাটকগুলির বিষয় ছিল প্রেম, মধ্যজীবনেব নাটকগুলির বিষয় প্রধানতঃ মানব-প্রীতি, কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনের নাটকগুলির বিষয় সমাজ ও তাহার বিবিধ সমস্যা। ১৯২৬ সন হইতেই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নাট্যকার জীবনের শেষ অধ্যায়ের সূচনা দেখা যায়। সেই বৎসরই তাঁহার 'নটীর পূজা' ও 'রক্তকরবী' প্রকাশিত হয় এবং ইহার পর হইতেই তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার যে কয়খানি নাটক রচিত হয়, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে সমাজের বহির্মুখী বিষয়কে ভিত্তি করা হইয়াছে। এই যুগে যে তাঁহার আজন্ম সাধনালব্ধ অনুভূতি মানব-প্রীতি কিংবা প্রকৃতি-প্রেম সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেদিন তাঁহাব নিকট সমাজের বহির্মুখী এবং সাময়িক সমস্যাগুলিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ একখানি মাত্র পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'বাঁশরী'। ইহা রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী সামাজিক নাটক এবং এমন কি, বিষয়বস্তুর দিক দিয়া সামাজিক উপন্যাসগুলি হইতেও পৃথক্। বহির্মুখী বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাকে সামাজিক মনে হইলেও ইহার প্রাণধর্ম রোমান্টিক। সমসাময়িক কালে বাংলা সাহিত্যে 'রিয়ালিজমে'র নামে যে ব্যভিচার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ইহার ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে কথা তাঁহার 'সাহিত্য' বা 'সাহিত্যের কথা' প্রবন্ধগ্রন্থের ভিতর দিয়া বলিয়াছেন, এই নাটকের মধ্যে সেই প্রবন্ধের ভাষা অনুসরণ করিয়াই লিখিয়াছেন, 'যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে তখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য, এখন সাবালক হয়েছে, তবু এই কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য।' দেখা যাইতেছে, ইহা সাহিত্য-তত্ত্বমূলক প্রবন্ধের বিষয়, জীবন-রস-ভিত্তিক নাটকের বিষয় নহে। 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রসভ্যতা, বুরোক্রাটিক শাসন-পদ্ধতি, ধনতন্ত্রবাদ, মার্কস্‌বাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত

আলোচনা স্থান দিয়াছেন। সেইজন্য কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলিয়াছেন যে, প্রবন্ধের বিষয়কেই রবীন্দ্রনাথ এখানে নাটক রচনার ভিত্তি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয় লইয়া যে প্রবন্ধ না লিখিয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধের মধ্যে যে কথা বলিয়াছেন, কিংবা ইহারও পূর্ববর্তী রচনা 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধগ্রন্থেও যে কথা আছে, 'রক্তকরবী' নাটকেও সেই কথাই আছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে রচিত 'চণ্ডালিকা' ও তারপর 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে'র মধ্যেও মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলন বা ছুঁৎমার্গ পরিহার আন্দোলনের কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

ধনতন্ত্রবাদ বস্তুতন্ত্রবাদ, ছুঁৎমার্গ পরিহার ইত্যাদি বহির্মুখী সামাজিক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক বিষয়ই প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের নাটকগুলির উপজীব্য হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের মধ্যে বলিষ্ঠ জীবন-রসের অভিব্যক্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের যে মানব-প্রীতি তাঁহার মধ্যবয়সের নাটকগুলির মধ্যে একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাও উক্ত সমস্যাগুলির অন্তরালে পড়িয়া গিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যদিও এ কথা সত্য যে, মুখ্যত মানব-প্রীতিই রবীন্দ্রনাথকে উক্ত সমস্যামূলক নাটকগুলি রচনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল, তথাপি ইহাদের মধ্যে বহির্মুখী সমস্যার কথাগুলি নিতান্ত প্রকট হইয়া পড়িয়া ইহাদের মৌলিক প্রেরণাকে অনেকখানি প্রচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল।

শেষ জীবনের নাটকগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়বস্তুর দিক হইতেও কোন নূতনত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার মধ্যবয়সের নাটকগুলির মধ্যে কাহিনীগত যে দৃঢ়বদ্ধতা ছিল, শেষ জীবনের নাটকগুলির মধ্যে তাহা ছিল না। তাঁহার শেষ জীবনের নাটকগুলির মধ্যে বিশেষতঃ নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে ঘটনার সমারোহ ছিল, কিন্তু তাহা নাটকীয় প্রয়োজনে সুগ্রথিত হইতে পারে নাই। তবে 'বাঁশরী' নাটকখানির মধ্যে বহির্মুখী নাট্যিক ক্রিয়া (dramatic action)-র পরিবর্তে মনস্তত্ত্বকেই যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা রবীন্দ্র-নাটকের একটি বিস্ময়। কারণ, এ কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রায় সকল শ্রেণীর নাটকেই বহির্মুখী সংগ্রামকে প্রাধান্য দিয়েছেন; এমন কি, তাঁহার সাঙ্কেতিক কিংবা রূপক নাটকও ইহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নহে। একমাত্র 'ডাকঘর' অবশ্য ইহার একটি সুদুর্লভ ব্যতিক্রম। কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনের 'বাঁশরী' নামক নাটকটি ইহার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সৃষ্টি

স্ফুরিয়াছে। সেই যুগে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে একান্ত অন্তর্মুখী হইয়া পড়িয়াছিল, সমসাময়িক কালে রচিত তাঁহার 'শেষের কবিতা' উপন্যাসও তাহার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সাধনার ধারা অনুসরণ করিয়া সে যুগে তাঁহার যে সকল রচনা প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা প্রধানতঃ তাঁহার অন্তর্মুখী ধ্যানলোকেরই সৃষ্টি ছিল। নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি কেবলমাত্র 'বাঁশরী'র মধ্য দিয়াই সেই অন্তর্মুখী ধ্যান-চেতনার অভিব্যক্তি দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই ইহা তাঁহার শেষ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। কিন্তু তাহা তাঁহার একান্ত ধ্যান-চেতনার ফল বলিয়া বাস্তব জীবন হইতে ইহার সম্পর্ক অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য নাটকের শক্তি ইহাতেও যথাযথ প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

'বাঁশরী' ব্যতীত তাঁহার শেষজীবনের আর কোনও নাটকে তিনি মৌলিক বিষয়-বস্তুর সন্ধান দিতে পারেন নাই। তাঁহার 'রক্তকরবী' নাটক পূর্ববর্তী যুগের 'প্রায়শ্চিত্ত' 'মুক্তধারা' অনুসরণ করিয়া রচিত, ১৯২৮ সনে রচিত 'শেষরক্ষা' পূর্ববর্তী রচনা 'গোড়ায় গলদে'র 'অভিনয়-যোগ্য সংস্করণ', ১৯২৯ সনে রচিত 'পরিত্রাণ' পূর্ববর্তী নাটক 'প্রায়শ্চিত্তে'র নূতন পরিবর্তিত সংস্করণ', 'তপতী' পূর্ববর্তী 'রাজা ও রাণী' নাটকের নূতন নাট্যীকরণ এবং ১৯৩৩ সনে রচিত 'তাসের দেশ' তাঁহার পূর্ববর্তী একটি ছোট গল্পের নাট্যীকরণ। 'বাঁশরী' ব্যতীত আব একখানি মৌলিক নাটক যে রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'চণ্ডালিকা'। তাহাও সমসাময়িক সমস্যা-ভিত্তিক রচনা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সংখ্যার দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের নাটক চল্লিশ খানির বেশি হইলে, তাঁহার বিশিষ্ট মনোভাবের অভিব্যক্তি যাহাতে দেখা যায়, তাহাদের সংখ্যা খুব বেশি নহে। তাঁহার শেষ জীবনের নাটকগুলি পূর্ববর্তী নাটকগুলির পুনরাবৃত্তি মাত্র। তাঁহার নিজস্ব মঞ্চব্যবস্থায় অভিনয়ের ভিতর দিয়া যখন যে ত্রুটি তাঁহার চোখে ধরা পড়িয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই দূর করিয়া তিনি তাহাদের নূতন রূপ দিয়াছেন মাত্র। সুতরাং দেখা যায় যে, একান্ত মঞ্চমুখীনতার জন্য বাংলা নাটক ইহার মধ্য যুগে—স্বাধীন-ভাব বিকাশ লাভ করিাত পারে নাই, রবীন্দ্রনাথের নাটকও এই জন্যই একদিক দিয়া যেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় নাই, অন্য দিক দিয়া তেমনই সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই।

পরিশিষ্ট

(ক)

রবীন্দ্র-নাট্য রচনা

(কালানুক্রমিক)

ক্রমিক সংখ্যা	নাটকেব নাম	রচনা-কাল
১	'বাল্মীকি-প্রতিভা'	১৮৮১
২	'রুদ্রচণ্ড'	১৮৮১
৩	'কালমৃগয়া'	১৮৮২
৪	'প্রকৃতির প্রতিশোধ'	১৮৮৪
৫	'নলিনী'	১৮৮৪
৬	'মায়াব খেলা'	১৮৮৮
৭	'রাজা ও রাণী'	১৮৮৯
৮	'বিসর্জন'	১৮৯০
৯	'গোড়ায় গলদ	১৮৯২
১০	'বৈকুণ্ঠের খাতা'	১৮৯৭
১১	'কাহিনী' (নাট্য কবিতা সমষ্টি)	১৯০০
১২	'হাস্যকৌতুক'	১৯০৭
১৩	'ব্যঙ্গকৌতুক'	১৯০৭
১৪	'শাবদোৎসব'	১৯০৮
১৫	'মুকুট'	১৯০৮
১৬	'প্রায়শ্চিত্ত'	১৯০৯
১৭	'রাজা'	১৯১০
১৮	'ডাকঘর'	১৯১২
১৯	'মালিনী'	১৯১২
২০	'বিদায় অভিশাপ'	১৯১২
২১	'অচলায়তন'	১৯১২
২২	'ফাল্গুনী'	১৯১৬
২৩	'গুরু'	১৯১৮
২৪	'অরূপরতন'	১৯২০

ক্রমিক সংখ্যা	নাটকের নাম	রচনা-কাল
২৫	'ঋণশোধ'	১৯২১
২৬	'মুক্তধারা'	১৯২২
২৭	'বসন্ত'	১৯২৩
২৮	'গৃহপ্রবেশ'	১৯২৫
২৯	'চিরকুমাব সভা'	১৯২৬
৩০	'শোধবোধ'	১৯২৬
৩১	'নটীর পূজা'	১৯২৬
৩২	'বক্তকরবী'	১৯২৬
৩৩	'ঋতুরঙ্গ'	১৯২৭
৩৪	'শেষ বক্ষা'	১৯২৮
৩৫	'পরিত্রাণ'	১৯২৯
৩৬	'তপতী'	১৯২৯
৩৭	'নবীন'	১৯৩১
৩৮	'কালেব যাত্রা'	১৯৩২
৩৯	'চণ্ডালিকা'	১৯৩৩
৪০	'তাসেব দেশ'	১৯৩৩
৪১	'বাঁশবী'	১৯৩৩
৪২	'শ্রাবণ-গাথা'	১৯৩৪
৪৩	'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য'	১৯৩৬
৪৪	'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য'	১৯৩৮
৪৫	'শ্যামা'	১৯৩৯
৪৬	'মুক্তির উপায়'	১৯৪৮

(খ)

রবীন্দ্রনাথের অভিনয়

সন	নাটকের নাম	রঙ্গমঞ্চ	ভূমিকা
১৮৭৭	'অলীক বাবু'	জোড়াসাঁকো	নামভূমিকা
১৮৮০	'মানময়ী'	”	মদন
১৮৮৬	”	ষ্টার থিয়েটার	—
”	'কাল মৃগয়া'	ঠাকুরবাড়ীর ছাদ	অন্ধমুনি
—	'খ্যাতির বিড়ম্বনা'	কাশিয়া বাগান বাগান বাড়ী	—
১৮৮৬ (?)	'অলীক বাবু'	জোড়াসাঁকো	নামভূমিকা
১৮৮৯	'রাজা ও রাণী'	বিজ্‌নি রাজার পুরাণো বাড়ী	বিক্রমদেব
১৮৮১	'বাল্মীকি-প্রতিভা'	”	বাল্মীকি
১৮৯০	'বিসর্জন'	”	রঘুপতি
—	'মায়ার খেলা'	”	বসন্ত
১৮৯৬	'বৈকুণ্ঠের খাতা'	সঙ্গীত সমাজের আসর	কেদার
১৯০০	'বিসর্জন'	—	রঘুপতি
১৯১০	'প্রায়শ্চিত্ত'	শান্তিনিকেতন	ধনঞ্জয় বৈরাগী
১৯১৫	'ফাল্গুনী'	জোড়াসাঁকো	অন্ধ বাউল
১৯১৬	”	কলিকাতা	”
১৯১৭	'ডাকঘর'	বিচিত্রার বৈঠক	ঠাকুরদাদা
১৯২২ (?)	'বসন্ত'	কলিকাতা	রবীন্দ্রনাথের নৃত্য
১৯২৩	'বিসর্জন' (মূকাভিনয়)	এম্পায়ার থিয়েটার	জয়সিংহ'
১৯২৪	'অরূপ রতন'	শান্তিনিকেতন	আবৃত্তিকারক
১৯২৯	'তপতী'	জোড়াসাঁকো	বিক্রমদেব

সন	নাটকের নাম	রঙ্গমঞ্চ	ভূমিকা
১৯৩১	'শাপমোচন' (মূকাভিনয়)	শান্তিনিকেতন	আবৃত্তিকারক
১৯৩৫	'শারদোৎসব'	"	সন্ন্যাসী
	'অরূপ রতন'	এম্পায়াব থিয়েটার	রাজার ভূমিকায় বাক্যাভিনয়

*

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১। 'মধুমালা' (১৯৩৬)
২। 'শব্দ ও উচ্চারণ' (১৯৩৬)
৩। 'মনের আগুন' (১৯৩৬)
৪। 'আজব বেদে' (১৯৩৬)
৫। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' (প্রথম সং ১৯৩৯, ৪র্থ সং ১৯৬৪)
৬। *An Introduction to the Study of Medival Bengali Epics* (1943)
৭। 'কাব্য-সঞ্চয়' (প্রথম সং ১৯৪৩, তৃতীয় সং ১৯৪৬)
৮। 'শিক্ষার পথে' (১৯৪৬)
৯। *Early Bengali Saiva Poetry* (1950)
১০। 'বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল' (প্রথম সং ১৯৫৪, ২য় সং ১৯৬২)
১১। 'বাংলার লোক-সাহিত্য', প্রথম খণ্ড (১ম সং ১৯৫৪, ৩য় সং ১৯৬২)
১২। 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড (১ম সং ১৯৫৫, ২য় সং ১৯৬০)
১৩। 'রামকৃষ্ণ দাসের শিবায়ন' (১৯৫৬)
১৪। 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (১ম সং ১৯৫৮, ৩য় সং ১৯৫৯)
১৫। 'গোপীচন্দ্রের গান' (১ম সং ১৯৫৯, ২য় সং ১৯৬৫)
১৬। 'নীল-দর্পণ' (১ম সং ১৯৫৯, ২য় সং ১৯৬২)
১৭। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' (১৯৫৯)
১৮। 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত কথা' (১ম সং ১৯৫৯, ৪র্থ সং ১৯৬০)
১৯। 'কাদম্বরী' (১ম সং ১৯৬০, ২য় সং ১৯৬৪)
২০। 'গীতিকবি শ্রীমধুসূদন' (১৯৬০)
২১। 'বাংলার লোক-শ্রুতি' (১৯৬০)
২২। 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬১)
২৩। 'বনতুলসী' (১৯৬১)
২৪। 'স্বর্ণলতা' (১৯৬২)
২৫। 'প্রফুল্ল' (১ম সং ১৯৬২, ২য় সং ১৯৬৩)
২৬। 'বাংলার লোক-সঙ্গীত' প্রথম খণ্ড (১৯৬২)

২৭। 'সেকালের কথা ও কাহিনী' (১ম সং ১৯৬২, ২য় সং ১৯৬৩)
২৮। 'বাংলার লোক-সাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬৩)
২৯। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (১৯৬৩)
৩০। 'যতীন্দ্রপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৬৩)
৩১। 'বাংলার লোক-সঙ্গীত', দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬৩)
৩২। 'বাংলার লোক-সঙ্গীত', তৃতীয় খণ্ড (১৯৬৪)
৩৩। 'বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন', (১৯৬৪)
৩৪। 'মহাকবি শ্রীমধুসূদন', (১৯৬৪)
৩৫। 'জনা', (১ম সং ১৯৬৪, ২য় সং ১৯৬৬)
৩৬। 'বাংলা কথাসাহিত্যেব ইতিহাস', প্রথম খণ্ড (১৯৬৪)
৩৭। 'সোভিয়েতে বঙ্গসংস্কৃতি', (১৯৬৪)
৩৮। 'বাংলাব লোক-সঙ্গীত', চতুর্থ খণ্ড (১৯৬৫)
৩৯। 'বাংলাব লোক-সাহিত্য', তৃতীয় খণ্ড (১৯৬৫)
৪০। 'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত বত্নাকব', প্রথম খণ্ড (১৯৬৬)
৪১। 'বাংলার লোক-সাহিত্য', চতুর্থ খণ্ড (১৯৬৬)
৪২। 'বাংলার লোক-সঙ্গীত', পঞ্চম খণ্ড (১৯৬৬)
৪৩। 'রবীন্দ্র-নাট্যধাবা' (১৯৬৬)

*

গ

শব্দসূচী

[প্রান্তে লিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা-সংখ্যার সূচক]

ন

প

ভ

ম

শুদ্ধি

পৃষ্ঠা	চরণ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪	৭	রবীন্দ্রনাথের	জ্যোতিরিন্দ্রনাথের
৪২	৯	Chandrasekhar	Kavisekhar